যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতি

ডেভিড কাশম্যান কয়েল

অনুবাদক—
গৌতম গুপ্ত

পরিচয় পাবলিশার্স

দ্বিতীয় সংস্করণ :

প্রকাশক :

পরিচয় পাবলিশার্স
২১, হায়ৎ খাঁ লেন
কলিকাতা—৯
ফোন : ৩৫-২৪১৪

মুদ্রাকর :

সত্যেন সেনগুপ্ত
নিরুপমা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২১, হায়ৎ খাঁ লেন
কলিকাতা—৯

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক

সূচনা

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ যেভাবে আচার-আচরণ করে তাকেই বলে রাজনীতি। গণতান্ত্রিক সমাজে সরকারী কাজকর্ম ও কার্যক্রম নিয়ে বিরোধী মতামতগুলি সাধারণত অন্তর্যুদ্ধ এড়িয়েই কার্যকরী করা হয়। রাজনীতির মধ্যে দিয়ে মানুষ ভাল-মন্দ বিচারের মান নির্ণয় করে, এবং এমন সরকারী কর্মকর্তা যাচাই করে নিতে পারে যাতে করে সেই মান অনুযায়ী উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে গিয়ে সমাজের কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশের কাছেই তাদের সিদ্ধান্ত অসহনীয় হয়ে না উঠে।

আমেরিকান রাজনীতি ও তার ভাল-মন্দের মধ্যে মার্কিন জাতির মিশ্র-চরিত্র ও তার অতীত ইতিহাস পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে; এবং সেই ইতিহাস-প্রবাহে কেবল সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নয়, আমেরিকার রাজনৈতিক আচার অনুষ্ঠানের ধারাও নিরূপিত হয়েছে।

আমেরিকার সরকারী গঠনতন্ত্র অংশত সপ্তদশ শতাব্দীর বৃটিশ উপনিবেশতন্ত্রের উত্তরাধিকারপ্রসূত, এবং অংশত আমেরিকার বিশেষ অবস্থার প্রয়োজনে নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বৃটিশ জাতির বংশধররা আজ আমেরিকার জনসাধারণের মাত্র অর্দ্ধাংশের মত আর অবশিষ্ট প্রায় সবাই হচ্ছে য়ুরোপীয়, নিগ্রো বা আমেরিকার আদিম অধিবাসী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির রক্তধারা সঞ্জাত। এখানে কিছুসংখ্যক অধিবাসী পূর্বাঞ্চল থেকেও এসেছে। যে রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আমেরিকানরা তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে, তার সৃষ্টির মূলে বিচার-প্রসূত পরিকল্পনার চেয়েও মানুষের স্বাবলীল অনুভূতির অবদান রয়েছে বেশী। বিশেষভাবে বৃটিশ আচার-অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এতে আমেরিকার অন্যান্য সমস্ত জাতিগুলিরও অবদান রয়েছে।

আমেরিকার বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ক্রিয়াপ্রক্রিয়াগুলি কি'ভাবে কাজ করে তা দেখানোই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

১৬০৭ খৃঃ থেকে ১৭৭৬ খৃঃ পর্যন্ত বৃটিশ উপনিবেশতন্ত্রের যুগে যে ইংরেজ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল, তা'ই পরবর্তী যুগে আমেরিকার বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বেশীর-ভাগ অংশেরই উৎস হিসাবে কাজ করেছে।

উপনিবেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলো তখন আইন-প্রণয়ন করেছে, স্থানীয় শাসন বিধান করেছে, কর ধার্য করেছে এবং সর্বসাধারণের খরচের জন্য অর্থ মজুদ রেখেছে। সময় সময় সাম্রাজ্যশক্তির মনোনীত গবর্ণরের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তারা সেই সঞ্চিত অর্থ-শক্তিকে ব্যবহারও করেছে।

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাগুলো ইংল্যাণ্ডের ধরণেই গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী উপনিবেশগুলির কাউন্টিস্, মেনর এবং বরো ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ বিভাগ ছিল। মৌলিক কোন পরিবর্তন ছাড়াই এগুলো আজও অটুট রয়ে গেছে। বিপ্লবের পূর্বে থেকেই আমেরিকায় কাউন্টি-কোর্ট এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিধায়কগণ শেরিফ ও করোনার্স ইত্যাদি ছিল। প্রত্যেকটি উপনিবেশের মধ্যেই তখন এ ছাড়াও অন্তবর্তী বিচারালয় ছিল। তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমাগুলি বিচার করত। এ ছাড়াও অধঃস্তন বিচাবালয়গুলিব রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনের জন্য সুপ্রীম কোর্ট ছিল। এর পরেও সর্বশেষ আপীলের ব্যবস্থা ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রীভি কাউন্সিলে।

উপনিবেশিক জনসাধারণ সভাসমিতি ও সরকারের কাছে আবেদন করার অধিকার জুরির সাহায্যে বিচার ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ইত্যাদি ইংরেজজাতিব চিরাচরিত অধিকারগুলিকে তাদের স্বতঃসিদ্ধ অধিকার মনে করত। ব্যবস্থাপক সভাগুলিই রাজস্ব ধায করত। উপনিবেশ যুগে আমেরিকার জনসাধারণ ইংল্যাণ্ডকে বাজস্ব একরকম দেয়নি বললেও চলে। ইংল্যাণ্ড থেকেও তারা কোন সামরিক সাহায্য পায়নি কিন্তু বৃটিশ সরকার তাদের উপর বার বারই ফ্রান্স ও কানাডার ফরাসী অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঠেলে দিয়েছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি ছিল না। এই অবস্থায় বৃটিশ পার্লামেণ্ট আমেরিকানদের উপর রাজস্ব ধায করতে চাইলে আমেরিকার জনসাধারণ একে তাদের বংশানুক্রমিক অধিকারে হস্তক্ষেপ মনে করে।

দূরত্ব ও আটলান্টিক পারাপারের যানবাহনের মন্থরগতিব দৌলতে আমেরিকার ঔপনিবেশিক সরকারগুলো বিধিবদ্ধ স্বাধীনতা থেকেও অনেক বেশী স্বাধীনভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালন করতে পারত। বিশেষতঃ স্থানীয় সরকার ও ক্রমবর্ধমান সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমেরিকানরা ইংল্যাণ্ডের রাজার হস্তক্ষেপের কোন চিহ্নই দেখতে পেত না। এক শত সত্তর বৎসরব্যাপী দীর্ঘ বৃটিশ শাসনাধীনে আমেরিকানরা বহুলপরিমাণে স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনির্ভরশীলতা ভোগ করে এসেছে। কিন্তু তাদের শাসনপদ্ধতির শীর্ষে ছিল ইংল্যাণ্ডের রাজা আর তাদের প্রতিনিধিহীন পার্লামেণ্ট। এইজন্য ইংরেজ রাজত্বের অবসানের পূর্বে সেখানে সুসংবদ্ধ কোন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে পারেনি। তখনকার দিনের রাজনৈতিক বাদানুবাদ প্রধানতঃ গবর্ণর ও ব্যবস্থাপক সভা বা স্থানীয় উচ্চ রাজপদাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

ঔপনিবেশিক যুগে ফরাসী ও রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধে সংঘাত হত, এবং সংঘবদ্ধভাবে এই সমস্ত যুদ্ধ-সংঘাতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য ঔপনিবেশিক ইউনিয়ন গড়ে তোলার নানা প্রস্তাবও হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত প্রস্তাব কখনও কার্যকরী হয়নি ; তবে এ থেকে ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপের আদর্শের সঙ্গে আমেরিকানরা পরিচিত হতে থাকে। ১৭৭০ দশকের প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বিরোধ যত তীব্র হয়ে উঠতে থাকে, আমেরিকানরা ততই অধিকতর পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ কর্মের

বিষয়টি গুরুতর ভাবে বিবেচনা করতে থাকে এবং ১৭৭৫ খৃঃ একটি মহাদেশীয় সম্মেলন বা কন্টিনেন্টেল কংগ্রেস আহূত হয়।

এই কংগ্রেসের তখন কোন বিধিগত ভিত্তি ছিল না। নিছক বে-সরকারীভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যই এই সম্মেলন আহূত হয়েছিল। আমেরিকান জনসাধারণের অধিকার ঘোষণা ও অভিযোগ ব্যক্ত করে সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরবর্তী বৎসরে আর একটি সম্মেলনের আহ্বান জানানো হয়। ১৭৭৫ সালে সংগ্রেস অনেকটা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে, কারণ ইতিমধ্যে ম্যাসাচুসেটস্-এ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এই সময়ে কংগ্রেস উপনিবেশ শাসনের অধিকার ঘোষণা করে ও একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করে। জর্জ ওয়াশিংটন এই সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মনোনীত হন।

১৭৭৬ সালের দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসে আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার ঘোষণা গৃহীত হয়। এই ঘোষণায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয় যে, আমেরিকান রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব সরকার গঠনের যে দাবী করছে তার ভিত্তি হল ইংরেজ জাতির চিরাচরিত অধিকার ও স্বাধীন মানুষের অলঙ্ঘনীয় অধিকার। এই ঘোষণার শাসনতন্ত্রের মত বিধিগত কোন ক্ষমতা না থাকলেও নৈতিক আদর্শ হিসাবে তার মর্যাদা অনেকখানি। এর ভিত্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিচার করা যায়।

১৭৭৭ সালে মহাদেশীয় কংগ্রেস একটি শিথিল সংযুক্ত রাষ্ট্র (কন্‌ফেডারেশন) গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটিকে বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়। ১৭৮১ সালের মধ্যে সমস্ত রাজ্যগুলিই প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। প্রস্তাবটি 'আর্টিকলস্ অব কনফেডারেশন' নামে পরিচিত এবং সেটিই মার্কিণ প্রজাতন্ত্রের প্রথম শাসনতন্ত্র হয়ে উঠে।

এই শিথিল সংযুক্তি অনুযায়ী গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ধরণের, বাস্তবসম্মত হওয়ার মত শক্তি তার মোটেই ছিল না। কিন্তু তখনকার দিনে রাজ্যগুলি এর চেয়ে বেশী গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। সংযুক্ত সরকারকে তারা যেটুকু ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী ছিল, সেটা দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসকে। এই কংগ্রেস হ'ল সকল রাজ্যের সম্মিলিত ব্যবস্থাপক সভা এবং এতে সকল রাজ্যের একটি করে ভোট ছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কার্যনির্বাহক শাখা ও বিচারবিভাগ কিছুই তখন ছিল না।

এই সংযুক্তির অধীনে সমগ্র জাতি ও রাজ্যগুলির অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতি এতই চরম রূপ ধারণ করে যে মহাদেশে প্রবর্তিত অর্থ একেবারে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সেই থেকে "মহাদেশীয় অর্থের মূল্যও নেই"— কথাটি আমেরিকান ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করে আছে। রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠে। বহু আমেরিকান ব্যবসায়ী তখন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব ধার্য করা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শোচনীয়

দুর্দশা নিবারণ করার জন্য অধিকতর শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের আওয়াজ তুললেন। এ বিষয়ে ১৭৮৫ ও ১৭৮৬ সালে বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা দু'বার সম্মিলিত হন, এবং তারই ফলে ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়াতে একটি সম্মেলন আহূত হয় ও সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচিত হয়। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ধারা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধারাকে কেন্দ্র করেই আমেরিকার শাসনতন্ত্র গড়ে উঠেছে, এবং সেই শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। যাঁরা এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন ও যাঁরা সম্মেলনে সমবেত হয়েছিলেন, শাসনতন্ত্রের এই সমস্ত ধারার মধ্যে দিয়ে তাঁদেরই 'মূল উদ্দেশ্য' প্রতিভাত হয়েছিল।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের প্রায় সব প্রতিনিধি ছিলেন আইনজ্ঞ, জমিদার বা ব্যবসায়ী যাঁরা কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন অথবা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছেন। মজুর, ক্ষুদ্র কৃষকশ্রেণী বা সামান্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপনের বিষয়ে পথিকৃৎদের কোন প্রতিনিধি এতে ছিল না। ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের প্রতিনিধিরা ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সহায়ক এবং শক্তিশালী ও স্থায়ী সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি-সরকার গঠন করতে চাইলেও আপামর জনসাধারণ মিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে, এটা তাঁরা চান নি। এমন কি কংগ্রেসকেও সবসাধারণের নির্বাচনের সামগ্রী হ'তে দিতেও তাঁদের ইচ্ছা ছিল না। ছোট বড় রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও শঙ্কা নিরসনের জন্য ফিলাডেলফিয়ার সমবেত প্রতিনিধিরা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে মতবৈষম্যের খানিকটা র'ফা করে নিয়েছিলেন।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সরকারের কাছে পরিপূর্ণভাবে দেয় নয়, এমন ক্ষমতাগুলির উপর রাজ্যের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাইলে শাসনতন্ত্র স্বভাবতঃই যুক্তরাষ্ট্রীয় হয়ে পড়ে। রাজ্যশাসন ও কেন্দ্রীয়শাসনের প্রস্তাবের পেছনেও রয়েছে ভয়—পাছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার শক্তিশালী হয়ে রাজ্য সরকারগুলির উপর উৎপীড়ন চালায়। এই একই আশঙ্কার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদের মর্মকথা হচ্ছে, সরকারের আইন, শাসন ও বিচারক্ষমতা, তিনটি এক যায়গায় কেন্দ্রীভূত থাকলে, এমনকি দু'টি থাকলেও, তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে।

১৭৮৮ সাল থেকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই শাসনতন্ত্র চলে আসছে এবং এর বিরুদ্ধে এতদিন পর্যন্ত কোন সার্থক প্রতিবাদ উঠেনি। এ থেকেই বোঝা যায়, জনসাধারণের মনোভাব ও প্রয়োজনের দিক থেকে এই শাসনতন্ত্র আমেরিকার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হয়েছে। এই শাসনতন্ত্র যাঁরা রচনা করেছেন, আমেরিকান জনসাধারণের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁদের প্রগাঢ় উপলব্ধি ও বিভিন্ন স্থান ও কালের বিভিন্ন ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তাঁদের সেই শ্রম-সৃষ্ট শাসনতন্ত্র কেবল ১৭৮৮ সালের আশু সমস্যা সমাধানের মধ্যে নিবদ্ধ

থাকেনি, সেই রচয়িতাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত ভাবীকালের সমস্যা সমাধানের পক্ষেও অনুকূল প্রমাণিত হয়েছে।

এই শাসনতন্ত্র রচনার শত বৎসর পরে বৃটেনের বিশিষ্ট শাসনতন্ত্রবিদ জেমস্ ব্রাইস লিখেছেন : "পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত উৎকর্ষতা, জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে সুসামঞ্জস্যতা, সবল, সংক্ষিপ্ত ও অকপট ভাষা, আদর্শের ক্ষেত্রে সুদৃঢ়তা ও খুঁটি-নাটি ব্যাপারে নমনীয়তার বিচক্ষণ সমাবেশের দিক থেকে আমেরিকার শাসনতন্ত্র অন্য সর্বপ্রকার লিখিত শাসনতন্ত্র থেকেই শ্রেষ্ঠ।" *

এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার একটি অপ্রাকৃত সার্বভৌম রাষ্ট্র। কর্পোরেশন যেমন অপ্রাকৃত ব্যক্তি, বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক যেমন অপ্রাকৃত চিন্তাশীল যন্ত্র, এ'ও তেমনি। যুক্তরাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব স্বাভাবিকভাবে জন্মলাভ করেনি, এ'কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর অস্থিপঞ্জরের উপর আজ যে সজীব রক্তমাংসের আবরণ দেখতে পাচ্ছি, এই শাসনতন্ত্রকে যাঁরা কার্যকরী করেছেন—আমেরিকার সেই সব রাজনীতি-সাধকরাই তা আরোপ করেছেন। সময় সময় আমেরিকানদের রাষ্ট্র-নীতিকতাও এই কাজে সহায়তা করেছে।

কিন্তু রাজ্যগুলি ছিল গোড়া থেকেই সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন। যুদ্ধে জয়লাভ করে তারা নিজের নিজের এলাকায় ইংরেজ জনসাধারণের সমস্ত সার্বভৌম অধিকার-গুলি পরিচালনা করবার ক্ষমতা লাভ করে এবং সেই থেকে একমাত্র আন্তর্জাতিক আইন ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে চলে।

বিপ্লব সুরু হলে রাজ্যগুলি নিজে থেকেই স্ব স্ব এলাকায় ব্যবস্থাপকসভা স্থাপন করে, এবং ১৭৭৬ খৃঃ থেকে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তারা নিজেরাই নিজেদের শাসন-তন্ত্র রচনা করে ও অত্যন্ত সুগঠিতভাবে সরকারী কার্য পরিচালনা করতে থাকে। পরবর্তীকালে যে সমস্ত আদর্শের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তার অনেকগুলোই এই সমস্ত রাজ্যের একাধিক ক্ষেত্রে পূর্বেই প্রযুক্ত হয়েছিল। রাজ্য-গুলির প্রথম শাসনতন্ত্র সংক্ষিপ্ত হলেও সেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাবেই রচিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজ্যগুলিতে পৃথক পৃথক আইন প্রণয়ন, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ ছিল; কিন্তু, 'আর্টিকল্‌স অব কনফেডারেশন' অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সে রকম ব্যবস্থা ছিল না।

আর্টিকল্‌স অব কনফেডারেশন অনুযায়ী গৃহীত আদর্শ ছিল—প্রত্যেকটি রাজ্যই স্বাধীন ও তার অধিকারের ক্ষেত্রে সার্বভৌম, এবং রাজ্যগুলির অর্পিত ক্ষমতা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অপর কোন ক্ষমতা নেই। পরবর্তী লিখিত শাসনতন্ত্রও এই আদর্শের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল। কনফেডারেশনের ধারাগুলির সঙ্গে এর পার্থক্য শুধু—এ'তে সংযুক্তি "আরও সম্পূর্ণ" হয়েছিল, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর রাজ্যগুলি অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করেছিল।

---

* James Bryce, The American Commonwalth (New York, The Macmillan Company.)

১৭৮৭ খৃঃ ফিলাডেলফিয়াতে সমবেত প্রতিনিধিদের কেবল আর্টিকলস্ অব কনফেডারেশনের ধারাগুলি সংশোধনের প্রস্তাব করার অধিকার ছিল, এর ধারা অনুযায়ী কোন সংশোধনী প্রস্তাব কার্যকরী করতে হ'লে সমস্ত রাজ্যগুলিরই অনুমোদন প্রয়োজন হোত। কিন্তু প্রতিনিধিরা সম্মেলনে ব'সে দেখতে পেল, একেবারে নতুন ক'রে সরকার গঠন করলে চলবে না। তারা কেবল আর্টিকলস্ অব কনফেডারেশন নাকচ করে দেওয়ায় সিদ্ধান্ত করল না, মূল শাসনতন্ত্র সংশোধনের বিধানগুলিকেও বাতিল করে দিল। এবং তার পরিবর্তে সংযুক্তির নতুন বিধানসহ তারা একটি নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করল। প্রথমত নয়টি রাজ্য নিয়েই একটি নতুন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হ'ল। অপরাপর রাজ্যগুলি ইচ্ছা করলে যথাসময়ে যা'তে সংযুক্তিতে যোগদান করতে পারে তার পথ খোলা রইল।

প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর অধিকতর দায়িত্ব অর্পণের সংকল্প গ্রহণ করেছিল, তাই সম্মেলনের সামনে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল—কি ক'রে সেই দায়িত্ব পালনে সক্ষম সংযুক্ত সরকার গঠন করা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে সংযুক্তির পথের পুরাতন অসুবিধাগুলিরও অবসান করা যায়। আজ পশ্চিম য়ুরোপের রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত করার যে প্রচেষ্টা চলেছে, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ আমেরিকানরা তার প্রতি সহানুভূতশীল। কারণ, অনেকটা অনুরূপ সমস্যায় আমেরিকার রাষ্ট্ররচয়িতাদের কি'ভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, ছোটবেলা পাঠশালাতেই তা তারা শিক্ষালাভ করেছে।

সম্মেলন আরম্ভ হ'লে প্রথমে বৃহত্তর রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে তাদের স্বার্থানুযায়ী একটি বিস্তৃত প্রস্তাব পেশ করা হয়। এই প্রস্তাবটি "ভার্জিনিয়া পরিকল্পনা" হিসাবে পরিচতি লাভ করে। এই প্রস্তাবের বিকল্পে ছোট রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে আর একটি প্রস্তাব আনা হয়। এই শেষোক্ত পরিকল্পনাটি "নিউ জার্সি পরিকল্পনা" নামে খ্যাত। সম্মেলনে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করেই বক্তৃতা ও বিতর্ক চলে।

পরিকল্পনা দুইটির মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে ঐক্যমত ছিল,—যেমন ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের কথা উভয় পরিকল্পনাতেই ছিল। কিন্তু মতানৈক্য তীব্র হয়ে উঠল আইনসভার গঠন ও ছোট বড় রাজ্যগুলির ক্ষমতা ও আইনসভার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে। এই মতানৈক্যে সম্মেলন ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছিল। আজকে রাষ্ট্রসংঘের সনদের ক্ষেত্রেও আমরা এই রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। ছোট-বড় রাজ্য নিয়ে রাষ্ট্রজোটে বিতর্কমূলক সমস্যার সমাধান করতে গেলে এ'রকম অসুবিধা দেখা দেবেই।

সুপরিচিত ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের ধারা অনুযায়ী উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন-পরিষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে ভার্জিনিয়া পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় দু'টি পরিষদের প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবে ছিল—নিম্ন পরিষদ গঠিত হ'বে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে, এবং তারাই বিভিন্ন রাজ্যপরিষদের মনোনীত প্রতিনিধি

থেকে উচ্চ-পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এই পরিষদ দু'টিতে রাজ্যগুলি কিভাবে প্রতিনিধিত্ব করবে—জনসংখ্যা অথবা রাজস্বের অনুপাতে, না জনসংখ্যা ও রাজস্বের কোন মিলিত ভিত্তিতে'—এই ছিল সম্মেলনের সর্বপ্রধান বিতর্কমূলক বিষয়। এই পরিকল্পনা গৃহীত হ'লে বড় বড় রাজ্যগুলি তাদের আয়তনের পুরোপুরি সুবিধা গ্রহণ করতে পারত, মহাদেশীয় কংগ্রেসে তাদের সে সুবিধা ছিল না। সেখানে ছোট বড় প্রত্যেক রাজ্যেরই এক একটি ক'রে ভোট ছিল।

নিউ জার্সি পরিকল্পনা তদানীন্তন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থেকে বেশী পরিবর্তন চায় নি। এতে কেবল একটি পরিষদের কথা বলা হয়, এবং তাতে তদানীন্তন শাসনতন্ত্রের মত প্রত্যেক রাজ্যেরই এক একটি ভোট থাকবে বলে প্রস্তাব করা হয়।

বহু সপ্তাহ ধরে প্রতিনিধিরা এই দুরূহ সমস্যা নিয়ে বহু বিতর্ক করেছেন: একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছোট বড় রাজ্যগুলির মধ্যে কি ক'রে ক্ষমতার ন্যায্য বণ্টন করা যায়? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজে পাওয়া দুরূহ, তাই সম্মেলনে সেদিন কার্যকরী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সৃষ্টির সম্ভাবনা সম্বন্ধেও সন্দেহ দেখা দিয়েছিল।

অবশেষে কনেটিকাটের উইলিয়াম্ স্যামুয়েল জনসন্ এই সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করেন। তাঁর সেই সমাধানটি "কনেটিকাট রফা" নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এ'তে একটি প্রতিনিধিসভা ও একটি সেনেট সভার পরিকল্পনা করা হয়। প্রতিনিধি সভার সভ্য নির্বাচিত হ'বে রাজ্যগুলির জনসংখ্যার ভিত্তিতে, কিন্তু সেনেট সভায় সমস্ত রাজ্যগুলিরই সমান প্রতিনিধি থাকলেও একমাত্র প্রতিনিধি সভারই রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত প্রস্তাব আনয়ন করার অধিকার থাকবে। 'কনেটিকাট রফা' গৃহীত হয়। এই অনুযায়ী কোন প্রস্তাব আইন হিসাবে গৃহীত হতে হ'লে প্রতিনিধি ও সেনেট সভা উভয়েরই অনুমোদন লাভ করতে হবে, কাজেই প্রতিনিধিসভায় ছোট রাজ্যগুলির স্বার্থ-হানিকর কোন প্রস্তাব গৃহীত হলে সেনেট-সভায় তারা সমবেতভাবে সেটা প্রতিরোধ করতে পারে। অনুরূপভাবে বড় রাজ্যগুলিও তাদের সংখ্যাধিক্য প্রতিনিধিদের জোরে প্রতিনিধি সভায় তাদের অমনোপূত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ১৭৮৭ খৃঃ ছোট বড় রাজ্যগুলির মধ্যে স্বার্থসংঘাতের সম্ভাবনা রাষ্ট্র-প্রবর্তকদের বড় চিন্তিত করে তুলেছিল, কিন্তু তাঁদের প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা এত চমৎকারভাবে কাজ করেছে যে, আমেরিকার সুদীর্ঘ ইতিহাসে ছোট বড় রাজ্যগুলির মধ্যে (তাঁরা যেমন ভেবেছিলেন) তেমন একটা সংঘাত হ'তে দেখা যায়নি। ভৌগোলিক ভিত্তিতে স্বার্থ-সংঘাত অধিকতর পরিমাণে আংশিক স্বার্থ বা শিল্প, কৃষি ও খনিজ অঞ্চল ইত্যাদি বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নিউ মেকসিকো ও আরিজোনা রাজ্যের সঙ্গে কালিফোর্ণিয়ার মত-বিরোধের কথা উল্লেখ করা যায়। জনসংখ্যার দিক থেকে উভয় রাজ্যই কালি-ফোর্ণিয়া থেকে ছোট। হুভার-বাঁধের জল নিয়ে বহুদিন থেকে এদের সঙ্গে কালি-

ফোণিয়াব বিবোধ চলে আসছে। কিন্তু এই বিরোধ নিরসনের জন্য আয়তনেব ভিত্তিতে ছোট-বড বাজ্যগুলি কংগ্রেসে জোট বাঁধেনি।

এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তবাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি-সভাব সদস্যদের জনসাধারণেব ভোটে নিবাচিত হওয়াব ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ভোট দেওয়াব ক্ষমতা তখনও সবাব ছিল না। সম্পত্তি ও ধর্মীয় কতকগুলি সর্তাধীনে এই ভোটদানেব ক্ষমতা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

উড্রো উইলসন তাঁর "আমেবিকান জাতিব ইতিহাস" নামক পুস্তকে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, আমেবিকাব তদানীন্তন ৪,০০০,০০০ অধিবাসীব মধ্যে মাত্র ১,২০,০০০ লোকেব ভোট দেওয়াব অধিকাব ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধবণেব শাসনতন্ত্রকেও সাংঘাতিক পবিমাণে গণতান্ত্রিক মনে কবা হত। পববর্তী শত বৎসব ধবে জনসাধাবণ ক্রমাগত অধিকতব সংখ্যায় এই ভোটেব অধিকাবী হতে থাকে। বাষ্ট্রেব সীমানাও পশ্চিম দিকে দ্রুত সম্প্রসাবিত হতে থাকে, এবং যতই নতুন বাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, সীমান্ত অঞ্চলেব জনসাধাবণেব প্রভাবে দেশ ততই সমতাব দিকে এগিয়ে যায়। ১৮৬০ সালেব মধ্যে প্রায় সব বাজ্যেই সবনিম্ন একুশ বৎসব পযন্ত সমস্ত শ্বেতাঙ্গ পুরুষবাই ভোটাধিকাব লাভ কবে। গৃহযুদ্ধেব পব নিগ্রো জনসাধাবণকে ভোটাধিকাব দেওয়াব জন্য শাসনতন্ত্রেব কিছুটা সংশোধন কবতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দক্ষিণেব কতকগুলি বাজ্যে নিগ্রোদেব ভোটাধিকাব লাভেব ক্ষেত্রে অনেকগুলো বাধা-নিষেধ থেকে যায়। ১৯২০ সালে আব একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনেব মধ্যে দিয়ে মহিলাবা ভোটাধিকাব লাভ কবে।

শাসনতন্ত্র বচয়িতাদেব অভিপ্রায় ছিল, সেনেট-সভা যেন প্রতিনিধি-সভা অপেক্ষা জনসাধাবণেব অধিকতব দূববর্তী হয়। সেজন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল প্রত্যেক বাজ্য থেকে দু'জন সেনেট-সভাব প্রতিনিধি যেন বাজ্য ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিদেব দ্বাবা নির্বাচিত হন। এব ফলে সেনেট-সভা প্রতিনিধি-সভা থেকে সাধাবণভাবে অধিকতব বক্ষণশীল হয়ে উঠে। সেনেট-সভাব সভ্যরা সাধারণতঃ ধনী ব বড বড ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কেব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল থেকে আসত। কিন্তু বক্ষণশীল বিবোধী বাজনৈতিক স্বার্থেব সংঘাতে গণতন্ত্রকে আবও পবিপূর্ণ কবার চাপে পবিশেষে ১৯১৩ সালে এক শাসনতান্ত্রিক সংশোধনেব মধ্যে দিয়ে বাজ্যেব জনসাধাবণ সবাসবি সেনেট সভাব প্রতিনিধি নির্বাচনেব অধিকাব লাভ কবে। ইতিপূর্বে সেনেট সভাব প্রতিনিধিবা অনেকটা বাজ্যসবকাবগুলোর বাজদূত বা প্রতিনিধির মতই ওয়াশিংটনে প্রেবিত হতেন। কিন্তু ১৯১৩ সাল থেকে এঁরা অনেকটা কংগ্রেসের অধিকতব ক্ষমতাবান সভ্যেব মত হয়ে ওঠেন।

সম্প্রতি সেনেট-সভাকে প্রায়ই প্রতিনিধি-সভা থেকে কম বক্ষণশীল হতে দেখা যায়। অনেক পর্যবেক্ষকেব ধাবণা, শক্তিশালী প্রভাবেব বশবর্তী হয়ে অনেক সময় প্রতিনিধি সভায় যে সমস্ত অন্যায্য প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাদের নাকচ করার জন্য

প্রতিনিধি-সভা সেনেট সভাবই মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। নির্বাচকরা অধৈর্য হয়ে পড়লে, বা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হলে, সেনেট সভা জনসাধারণের মতামত পরিবর্তনের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিনিধি সভার সভ্য অপেক্ষা সেনেটের সভ্যদের অনেকখানি বেশী স্বাধীনতা থাকে। কারণ, প্রতিনিধি সভার সভ্যদের প্রতি দু'বৎসর অন্তর জনসাধারণের সম্মুখে আসতে হয়, কিন্তু তাঁরা একবার নির্বাচিত হ'লে ছয় বৎসর সেনেট সভার সভ্য থাকতে পারেন। প্রতিনিধি-সভা প্রায়ই মিতব্যয়ী হতে গিয়ে সরকারী কার্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় খরচ থেকেও অল্প ব্যয় বরাদ্দ করে থাকে। কিন্তু কংগ্রেসের সভ্যরা সরকারী কার্য-পরিচালনার যথাযথ ব্যয় বরাদ্দের জন্য সেনেটের সভ্যদের উপর নির্ভর করে।

শাসনতন্ত্রে প্রথমে ছিল,—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট 'ইলেক্টোরেল কলেজ' কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। প্রত্যেক রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়েই এই ইলেক্টোরেল কলেজ' গঠিত হয়। যে রাজ্য যেমন ভাল মনে করে ব্যবস্থাপক সভা, জনসাধারণ বা এমন কি, গভর্ণরও 'ইলেক্টোরাল কলেজের' যোগ্য প্রতিনিধি বেছে দিতেন। জনসাধারণকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করার অধিকার দেওয়ার অভিপ্রায় শাসনতন্ত্র রচয়িতাদের ছিল না, এমন কি রাজ্যের ইচ্ছা ব্যতিরেকে 'ইলেক্টোরেল কলেজের' সভ্য নির্বাচন করার ক্ষমতাও জনসাধারণের ছিল না।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের চাপে পড়ে কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক সংশোধন ছাড়াই এই বিষয়ে শাসনতন্ত্রের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রত্যেক পার্টিই 'ইলেক্টোরেল কলেজের' জন্য তার মনোনীত প্রার্থী দাঁড় করায়, এবং তাঁরা সবাই প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদে স্ব স্ব পার্টি মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ থাকেন। এই সমস্ত নির্বাচকদের স্বাধীন কোন মতামত থাকে না এবং প্রায়শঃই এই সমস্ত পার্টি-মনোনীত ব্যক্তিদের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার বিশেষ কোন যোগ্যতা থাকে না। তাই 'ইলেক্টর' নির্বাচিত হয়ে তাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন।

১৯৪৮ সালে এই প্রচলিত পদ্ধতি ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ডেমোক্র্যাট দলের সমর্থনে নির্বাচিত দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি দলের মনোনীত প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। ট্রুম্যান সেই নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু এতে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও জনচিত্তে সম্ভাব্য নৈরাশ্যের সম্ভাবনার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছিল।

শাসনতন্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও 'ইলেকটোরেল কলেজের আর একটি প্রচলিত প্রথা আছে। যে রাজ্যে যে দল জয়লাভ করে, সেই রাজ্যে সেই দল 'ইলেক-টোরলে কলেজের' সমস্ত ভোটই পেয়ে থাকে। পরাজিত দল শতকরা ৪৯টি ভোট পেলেও 'ইলেকটোরেল কলেজের' সভ্যদের সমর্থন পায় না। এর উদ্দেশ্যে জাতীয় নির্বাচক ভোট ও জনসাধারণের ভোটের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি করা। বিজয়ী প্রেসিডেণ্ট হয়ত জনসাধারণের শতকরা ৫৬ জনের সমর্থন লাভ করেছেন,

কিন্তু নির্বাচকদের ক্ষেত্রে তিনি পেলেন শতকরা ৮০ বা ৯০টি ভোট। এতে প্রেসি-ডেণ্টের নির্বাচন অনেকটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মত দেখায়। প্রেসিডেণ্টেব ক্ষমতা এতে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোরদার হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

কিন্তু এতে একজন প্রেসিডেণ্ট পদ-প্রার্থী কতকগুলি রাজ্যের অধিবাসীদের একচেটিয়া সমর্থন লাভ করে জনসমর্থনের দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারেন, কিন্তু অপর প্রার্থী সংখ্যাল্প জনসমর্থন পেয়েও নির্বাচক প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য সমর্থন লাভ কবে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হতে পাবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৮৮ খৃঃ গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড অধিকতর জনসমর্থন পেয়েছিলেন, কিন্তু সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বেঞ্জামিন হ্যারিসন। এই প্রথার ফলে “একদলীয়” রাজ্যগুলিব আনু-পাতিক গুরুত্ব হ্রাস হলেও এই সম্ভাবনাকে সাধারণতঃ এই পদ্ধতিব একটি দুর্বলতা মনে করা হয়ে থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পাবে, যে সমস্ত রাজ্যে দ্বি-দলীয় কোন রাজনৈতিক প্রশ্নে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, সেই সমস্ত রাজ্যেব কি সভাপতি নির্বাচন সুস্থ দ্বি-দলীয় পদ্ধতির গৌববাধিকাবী রাজ্যগুলির মত অংশ থাকা বাঞ্ছনীয়?

আমেরিকার জনসাধারণ এই প্রশ্নে কতকগুলি অধিকতর যুক্তিসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করার পক্ষপাতি যাতে করে সংখ্যাধিক্য জনতার মতামতের মূল্য দেওয়া যায়, এবং প্রেসিডেণ্ট নির্বাচকরা তাঁদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার বিচার-বিবেচনা করে নিজেদেব খুসিমত ভোট দিতে [illegible] ন। কিন্তু জনসাধারণেব মনে এই ব্যাপারে ব্যাপক নৈরাশ্য দেখা দেবা [illegible] প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি গৃহীত হবার পথে বিশেষ ঢিলে ম থেকে যায়।

সরকারী কোন বিভাগ যাতে বেয়াড়া হয়ে উঠতে ন পাবে সেজন্য শাসনতন্ত্রে সযত্নে “বিধিনিষেধ ও ভারসাম্যের” ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রেসিডেণ্ট ভেটো প্রয়োগ করে কংগ্রেসের কোন আইন নাকচ করে দিতে পারেন। সেই নাকচ-করা প্রস্তাব পুনরায় কংগ্রেসে ফেরত যায় এবং উভয় সভাতেই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট ব্যতীত সেই প্রস্তাব আর আইন হিসাবে গৃহীত হতে পারে না।

কংগ্রেসও অর্থ মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে প্রেসিডেণ্টের নানা কাজ, এমন কি সর্বপ্রধান সেনাপতি হিসাবে শাসনতন্ত্রে তাঁর উপর যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাদেরও অকেজো করে দিতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক সম্পাদিত সামরিক চুক্তি সেনেট সভা ইচ্ছা করলে বাতিল করে দিতে পারে। প্রেসিডেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারপতি ও গুরুত্বপূর্ণ নির্ব্বাহী বিভাগের আধিকারিক প্রমুখদের নিয়োগ করেন। তবে সমস্ত নিযুক্তি সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। কংগ্রেসের কোন কাজ শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলে বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হয়নি কিন্তু ঘটনার পারম্পার্যের যুক্তিবত্তা সুপ্রীম কোর্টকে স্বতঃই সেই অধিকার দিয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এবং অন্য সব সরকারী ও বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের অভিযুক্ত করে বরখাস্ত করে দেওয়া যায়। প্রতিনিধি সভাই এইরকম অভিযোগ আনতে পারে, এবং সেনেট-সভায় মাত্র একটি ভোটের ব্যবধানে প্রেসিডেণ্ট জনসন অভিযুক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এ পর্যন্ত মাত্র চারবার সেনেট সভা অভিযোগের অনুকূলে ভোট দিয়েছে এবং তার সবগুলিই যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিচারের ক্ষেত্রে।

বিধিনিষেধ ও ভারসাম্যের আদর্শের সঙ্গে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণের বিরোধিতা আছে, এবং উভয়ের অবস্থিতি কার্যক্ষেত্রে একটি বোঝাপড়া করে চলার আদর্শ ঘোষণা করে। আমেরিকানদের এই রকম সমঝোতার মনোভাব ভাল লাগে। সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও এদের মধ্যেকার অন্তত দুটো যাতে এক হাতে গিয়ে না পড়ে, তা দেখার প্রয়োজন আছে। ভাবি ডিক্‌টেটর বা কোন প্রকার গোপন পুলিশী ব্যবস্থার সম্ভাবনা থেকে এইভাবে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। বর্ত্তমান যুগে আমরা যাকে সর্বাত্মক একনায়কত্ব বলি সেরকম সম্ভাবনা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যই ক্ষমতার আংশিক স্বতন্ত্রীকরণ এবং বিধিনিষেধ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থা সার্থক ভাবেই কার্য্যকরী হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উৎপীড়ক আইনের কবল থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিয়ে শাসনতন্ত্র রচয়িতারা "অধিকারের" কোন "সনদ" রচনা করেন নি। অতীতে বৃটিশ রাজা ও পার্লামেণ্টের আমলে যে সমস্ত অন্যায় হয়েছিল, সেই সমস্ত অন্যায় আচরণ নিষিদ্ধ করে শাসনতন্ত্রের এখানে সেখানে কিছু কিছু উল্লেখ আছে মাত্র। শাসনতন্ত্রের এক নম্বর ধারা ব্যক্তিবিশেষ ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের সরকারী ক্ষমতা রহিত করে দিয়েছে। কোন কাজ করার সময় আইনগত কোন বাধা না থাকলে পরবর্ত্তিকালে আইন করে সেই কার্য্যের জন্য অভিযুক্ত করার প্রথা এতে বিধিবর্হির্ভূত করা রয়েছে।

পুলিশ যাতে খেয়াল খুশিমত মানুষকে বন্দী করে রাখতে না পারে তার জন্য হেবিয়াস কর্পাস-এর অধিকার দেওয়া হয়েছে। অধুনা অনেক সর্ব্বাত্মক একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রেই আমরা এইরকম পুলিশ জুলুম দেখতে পেয়েছি। শাসনতন্ত্রের তৃতীয় ধারা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাধীন কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতে হলে জুরির মারফতে সেটা করতে হয়। পূর্বে রাজ-রাজারা প্রায়ই যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনতেন কমিউনিষ্টদের ভাষায় আজ যাকে বলে "বিশুদ্ধিকরণ", সে সব ক্ষমতার যাতে এখানে অপব্যবহার না হয় সে দিকে শাসনতন্ত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু রাজ্যগুলির অনুমোদনের জন্য শাসনতন্ত্রটি পেশ করা হলে বিরোধী পক্ষ

তা'তে "অধিকারেরর" "সনদ" সম্পূর্ণ না থাকায় সমালোচনা করে। নতুন কংগ্রেস বসেই জনসাধারণের অধিকারের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে থাকবে—এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই কিছুসংখ্যক রাজ্য শাসনতন্ত্র অনুমোদন করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের প্রথম দশটি অধিকারের সনদ সংক্রান্ত সংশোধন বর্তমানে রাষ্ট্র-সঙ্ঘ পরিষদে বিঘোষিত মানব অধিকারগুলি থেকে বিভিন্ন বিষয়ে স্বতন্ত্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ জনসাধারণ যে ধরণের সরকারী অন্যায় অবিচারের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, বা দীর্ঘদিন ধরে তীব্র সংগ্রামেব মধ্যে দিয়ে তদানীন্তন জনসাধারণেব পূর্বপুরুষবা যে সমস্ত অবিচাবেব অবসান করেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্রে আমেরিকানদেব বিভিন্ন অধিকাব রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু আজকের হিটলার ও সোভিয়েট গোষ্ঠি প্রাচীন বর্বর যুগের ধাবায় প্রাচীন অবিচারেব পুনঃ প্রবর্তন করেছে ও সেই ধারাতেই অন্যায অবিচারেব নূতন নূতন পন্থা খুজে বার কবেছে ; উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে একই বয়ে গেছে।

এই সমস্ত হচ্ছে আমেরিকার শাসনতন্ত্রেব বিভিন্ন মুল বিষয। এবাই আমেরিকার সবল গঠনতন্ত্রেব ভিত্তি এদেব উপব ভিত্তি করেই আমেবিকার জনসাধারণের রাজনৈতিক শক্তিগুলি স্বাধীন নাগরিকদের আকাঙ্খামত দেশ গড়ে তোলে। এদের কতকগুলো—কংগ্রেসেব নিবাচন ওক্ষমতা, কোনপ্রকাব মৌলিক পবিবর্তন ছাড়াই আজও পর্যন্ত অব্যাহত বযে গেছে। "সুপ্রীম কোর্ট" ও 'ইলেকটোরেল কলেজের' ক্ষমতা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের আবার পরিবর্তনও হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্র এখনও তাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিদ্ধ কবে যাচ্ছে। আমেরিকার জনসাধাবনেব পক্ষ থেকে এক জাতি হিসাবে কাজ করার জন্য শক্তিশালী সরকার সৃষ্টি কবার এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সবকাবকে জনসাধাবণের কাছে জবাবদিহি রাখার উদ্দেশ্যে থেকেই এই শাসনতন্ত্রেব সুচনা হয়েছিল।

॥ দলীয় রাজনীতি ॥

আমেবিকানরা দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক পদ্ধতিই পছন্দ করে। গত দু'শ বৎসরের ইতিহাসে দেখা গেছে, যখনই আমেরিকায় একটি পার্টি হয়েছে, তখনই আমেরিকানবা হয়তো তাকে দ্বিধাবিভক্ত কবেছে, নয়তো নতুন করে আর একটি পার্টি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যখনই তিনটি পার্টি হয়েছে আমেরিকানরা নির্বাচনে একটিকে খতম করে দিয়েছে।

উপনিবেশিক যুগে হুইগস ও টোরি দলের রাজনৈতিক ধ্যানধারনার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। তাদের এই পার্থক্য এত তীব্র ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে ১৭৭৫ খৃঃ তাই নিয়েই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বর্তমানে আমেরিকার পার্টি দুইটি প্রায়ই একরকম, তাদের ধ্যানধারনার মধ্যে পার্থক্য এতই অল্প যে অনেক সময় তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়

নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতি দু'বৎসরান্তে তারা পরস্পরে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে সম্মত হয়, এবং উভয় দলকেই এমনভাবে সংরক্ষিত করে রাখা হয়—যাতে পরাজিত দলেরও এর ফলে গুরুতর কোন ক্ষতি না হতে পারে।

রাজনৈতিক দলগুলির বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও আমেরিকার রাজনৈতিক নেতাদের সচেতন পরিকল্পনা অপেক্ষা আমেরিকার ইতিহাস ও ঘটনা পরম্পরার অবদান রয়েছে বেশী। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে—এ'তে পার্টির কোন উল্লেখ নেই।

বিপ্লবের পূর্বে আধুনিক ধরনের কোন পার্টি আমেরিকায় ছিল না। কিন্তু যারা রাজপক্ষ নিয়েছিল ও বৃটিশ গভর্ণরকে সমর্থন করত তাদের বলা হ'ত টোরি, এবং যারা ঔপনিবেশিক সভার পক্ষে ছিল এবং স্বায়ত্ত শাসনের আদর্শ সমর্থন করত, তাদের বলা হত হুইগস্। যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে টোরি ও হুইগসের আদর্শের দ্বন্দ্ব অবসান হয়। হুইগস্ বা "স্বদেশীরা" কেবল যে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে তা নয়, তাদের বিরোধীদেরও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দেয়। টোরিদের আমেরিকা থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়, তারা কানাডা বা বাহামাস দ্বীপে পালিয়ে যায়।

আমেরিকায় আজকে রক্ষণশীলদের সময় সময় টোরি ব'ল হলেও বিপ্লবের পরে কোন পার্টিকেই এখানে ইংল্যাণ্ডের রাজার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে দেখা যায়নি।

আমেরিকাতেও তাই অন্যান্য বৈপ্লবিক দেশগুলির মত প্রথমে একদলীয় রাজনৈতিক পদ্ধতি ছিল। জর্জ ওয়াশিংটন এবং আরও অনেক বিপ্লবি নেতাই সেই পদ্ধতি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। ওয়াশিংটন তাঁর বিদায় সম্ভাষণে আমেরিকার জনসাধারণকে "বিশেষ করে ভৌগোলিক পার্থক্যের ভিত্তিতে দল গঠন' করার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। "দলীয় মনোভাব রক্ষ ভয়ংকর পরিণাম" সম্বন্ধে তিনি আমেরিকানদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন: "এতে সময় সময় মারামারি ও বিদ্রোহ দেখা দেয়।"

হুইগ ও টোরিদের তিক্ত সংঘাত ওয়াশিংটনের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি মনে করেছিলেন, দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দল গড়ে উঠলে তারা হয়ত দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন সরকার এবং সামরিক বাহিনীও সৃষ্টি করবে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ১৮৬১ সালে এই রকম ঘটনাও ঘটেছিল।

'ফেডেরাালিস্ট পেপার্স' * নামক প্রবন্ধ সংগ্রহে শাসনতন্ত্রকে গ্রহণ করার পক্ষে

*জেমস ম্যাডিসন, জন জে এবং আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বিশ্লেষণ ও সেটা গ্রহণের সুপারিশ করে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিলের মধ্যে নিউইয়র্ক নগরী থেকে প্রকাশিত 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জার্ণালে' ধারাবাহিকভাবে ৭৮টি প্রবন্ধ লেখেন। ছদ্মনামে লিখিত এই প্রবন্ধগুলির সঙ্গে আরও ৬টি প্রবন্ধ যোগ করে পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। জনমনে এই প্রবন্ধগুলির সবিশেষ প্রভাব পড়েছিল এবং এগুলি শাসনতন্ত্রের প্রামাণিক ব্যাখ্যা বলে বিবেচিত হয়।

স্থপাবিশ কবতে গিয়ে জেমস্ ম্যাডিসন্ বহু পরিশ্রম করে দেখিয়েছিলেন যে, জনসাধারণের অংশবিশেষের হিংসাত্মক কাযকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার বা তাকে ভেঙ্গে দেওযার ক্ষমতা থাকবে, এমন কবেই যুক্তবাষ্ট্রীয় সবকারেব কাঠামো তৈরী করা হয়েছে। প্রেসিডেণ্ট নিবাচনের ক্ষেত্রে দলীয বাজনীতি এড়িয়ে যাবাব উদ্দেশ্য নিয়েই 'ইলেকটোবেল কলেজকে' বিশেষভাবে সৃষ্টি কবা হয়েছিল। বাষ্ট্রসংগঠকদেব মধ্যে অনেকে প্রেসিডেণ্টকে এমন নির্বাচিত বাজা মনে কবতেন যিনি ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট অথবা ইংলণ্ডেব বাজাব ন্যায় দলীয বাজনীতির উর্ধে থাকবেন। প্রথম যে শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল তাতে বাষ্ট্রপতি নিবাচনেব বিষয়ে নির্দেশ ছিল,—প্রত্যেক রাজ্যে নিবাচকবা যেন সমবেত হয়ে সমর্থনের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য প্রদর্শন না কবে দু'জন প্রার্থীকে নিবাচিত কবেন। এ'তে যে প্রাথি সবচেয়ে বেশী সমর্থন পাবেন, তিনিই হবেন প্রেসিডেণ্ট এবং যিনি তাঁর থেকে অপেক্ষাকৃত অল্প সমর্থন লাভ কববেন, তিনিই হবেন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। দেশেব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমর্থন লাভ কবে এইভাবে দেশেব সেরা ব্যক্তিবাই প্রেসিডেণ্ট নিবাচিত হতে পারবেন মনে করেই এই ব্যবস্থা কবা হযেছিল।

লিখিত শাসনতন্ত্র অনুমোদন কবা উচিত কি, উচিত নয়, এ নিয়ে ১৭৮৭ সালে যখন শাসনতন্ত্র বচনা হয়েছিল তখনও জনমত বিভক্ত ছিল। কিন্তু জনসাধাবণেব এই মতামত তখনও কোন সংহত দলীয় বাজনীতিব রূপ পবিগ্রহ করেনি। আলেকজেণ্ডার হ্যামিলটনেব নেতৃত্বে সাধাবণভাবে ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কমালিক এবং রক্ষণশীল ভূম্যধিকাবীবা তখন এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ কবতে চেযেছিল। অপরদিকে, কৃষক এবং বিশেষ ক'বে স্থানীয় বাজনীতিবিদ্‌বাই তাদেব বাজ্যের অস্তিত্ব লোপ ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকাব হাবানোব ভয়েই তাব বিবোধিতা কবেছিল। সামান্য কিছুসংখ্যক ভোটেব তফাতেই এই শাসনতন্ত্রটি গৃহীত হয়েছিল। অতি অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিশেষ ক'বে বিত্তশালীদেব মধ্যে তখন ভোট সীমাবদ্ধ ছিল বলেই ঐ অনুকূল ব্যবধান হতে পেবেছিল।

কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটনেব জনপ্রিযতা এবং শাসনতন্ত্রেব কল্যাণে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও জাতীয় সমৃদ্ধিব ফলে ওয়াশিংটনেব দ্বিতীয় দফার রাষ্ট্রপতিত্বেব শেষভাগ পযন্ত এখানে পবস্পর-বিবোধী কোন বাজনৈতিক দলেব উৎপত্তি হয়নি। এর পর থেকে নতুন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন নিয়ে পবস্পব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দলাদলির সৃষ্টি হয়। এক এক পক্ষ একজন প্রার্থীকে সমর্থন করতে থাকে। একদিক ব্যবসায়ী, ধনী এবং সহবে মধ্যবিত্তশ্রেণীব ফেডাবাালিষ্ট দল (উত্তর-পূর্ব আমেরিকার বাজ্যগুলিতেই তাদের প্রাধান্য বেশী ছিল), অপরদিকে টমাস জেফাবসনের নেতৃত্বে রিপাবলিক্যান দল। গ্রামীন জনসাধাবণ, ভার্জিনিয়ার ভদ্রলোক থেকে টেনেসি অঞ্চলের পথিকৃতের দল পর্যন্ত গ্রামীন লোকজন এবং সহরেব বহু মজুর—সবাবই সমর্থন ছিল এই শেষোক্ত দলে।

জনসাধারণের মধ্যে দলীয় বিভেদ আসন্ন দেখে ওয়াশিংটন অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে

পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কথায় কোন ফল হল না। স্বাধীন মানুষ তাদের মধ্যে-কার স্বাভাবিক বিরোধ নিরসন করার জন্য একটা না একটা উপায় বার করবেই থাকে।

এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের একদলীয় বৈপ্লবিক সরকার ভেঙ্গে দ্বি দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেডার‍্যালিস্টরা জয়লাভ করে এবং জন অ্যাডামস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পার্টি দুইটি সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে এবং উভয়ে নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রার্থী দাঁড় করায়। টমাস জেফারসন্ এবং অ্যারান বা'রকে প্রার্থী খাড়া করে রিপাবলিক্যানরা নির্বাচনে জয়লাভ করে, এবং এর পর 'ইলেক্‌টোর‍্যাল কলেজের' সমস্ত সদস্যরা তাদের প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু সমর্থন জানানোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদর্শনের কোন প্রথা না থাকায় একটি সমস্যা দেখা দেয়। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিনিধি সভা জেফারসনকেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে। কিন্তু, সমস্যার এই নিষ্পত্তির জন্য ৩৫ বার ভোট নিতে হয়েছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হল যে, পরাজিত দল ভোটের কারচুপি করে অনায়াসেই বিজয়ী দলের উদ্দেশ্য বানচাল করে দিতে পারে।

এই বিসদৃশ অবস্থার ফলে শাসনতন্ত্রের দ্বাদশ সংশোধন অনুষ্ঠিত হয়, এবং তারপর থেকে ইলেক্টররা স্বতন্ত্রভাবে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের জন্য ভোট দেবেন স্থির হয় যা'তে করে কংগ্রেসের আর এই বিষয়ে কিছু করার না থাকে। কিন্তু এই সংশোধনের ফলে 'ইলেকটোরেল কলেজ' গঠনের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। এতে দলীয় রাজনীতি স্বীকৃতি লাভ করে, এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচকরা পার্টিগুলির পূর্বনির্ধারিত মতামত কার্যকরী করার আজ্ঞাবহ সামগ্রী হয়ে উঠে, পার্টি আগেই যাকে যাকে প্রার্থী মনোনীত করেছে, তাদেরকেই ভোট দিতে হয়।

জেফারসনের পার্টিকে বর্তমান ডেমোক্র্যাটিক দলের পূর্বপুরুষ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই পার্টিকে কেন পূর্বে রিপাবলিক্যান বলা হত এই প্রসঙ্গে তা বলা যেতে পারে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসন্‌বাদীরা নিজেদের রিপাবলিক্যান বলত। তখন এর অর্থ ছিল, রাজার-বিরোধী। তারা তখন ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক ছিল। ফরাসী বিপ্লবকে তারা আমেরিকান বিপ্লবের পন্থা অনুসারী মনে করত। অপরপক্ষে ফেডার‍্যালিস্টরা ফরাসী অভিজাত জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা ও গিলোটিন করতে দেখে ফরাসী বিপ্লবের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। ফ্রান্সের রাজার প্রতি তাদের প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল। তারা জেফারসনপন্থীদের "ডেমোক্র্যাট" (গণতন্ত্রী) বা ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক ব'লে দোষারোপ করতে থাকে। "গণতন্ত্র" কথাটি তখন 'ইতর শাসন' অর্থে ব্যবহৃত হত, এবং কথাটি তখন বেশ চালু ছিল, এখন যেমন আমরা র‍্যাডিকাল্‌ইজম অর্থাৎ—আমূল সংস্কার-নীতি—কথাটি ব্যবহার করি। নেপোলিয়নের আবির্ভাব ও পতনের পর এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের

সুর অনেকখানি নরম হয়ে যায়। জেফারসন প্রেসিডেণ্ট থাকাকালে তিনি কখনও নিজেকে "ডেমোক্র্যাট' বলেন নি। অনুরূপভাবে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেণ্টও নিজেকে "র‍্যাডিকাল" বলে জাহির করেন নি।

কিন্তু আপন সৃষ্টির সার্থকতাতেই ফেডারয়্যালিস্টদের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে। তারা শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার চেয়েছিল ও তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলে দেশ দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। আপালেশিয়ান পর্বতমালা অতিক্রম করে মানুষ ওহায়ো ও টেনেসির দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পশ্চাতের অঞ্চলগুলি জনসংখ্যায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সহরগুলির চেয়ে ভারী হয়ে উঠে।

১৮০১ সালে জেফারসন প্রেসিডেণ্ট হলে তিনি আমেরিকায় এই সম্প্রসারণ প্রবাহকে আরও বেগবতী করার চেষ্টা করেন। শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন সম্পর্কে তিনি পূর্বে যে সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়েছিলেন, তার অনেকগুলোই তখন সরিয়ে রাখেন, এবং সাহস সহকারে মিসিসিপি নদীর পশ্চিমাঞ্চলের সমগ্র উপত্যকা—'লুইজিয়ানা' ক্রয় করে ফেলেন।

ফেডারয়্যালিস্টরা প্রতিযোগিতার আর বেশীদিন টিকতে পারল না। তাদের পার্টি মরে গেল, ১৯২০ সালের নির্বাচনে তারা প্রার্থীও দাঁড় করাল না। এর ফলে দেশ আবার একদলীয় হয়ে উঠল। এই সময়টাকে আমেরিকার "সৌহার্দের যুগ" বলা হয়ে থাকে, কারণ কয়েক বৎসর ধ'রে তখন কোন বিরোধী দল ছিল না। কিন্তু তাহলেও রিপাবলিক্যান দলের মধ্যেই আবার মতভেদ চাড়া দিয়ে উঠছিল, এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার দেশে দু'টি পার্টি দেখা দিল। রিপাবলিক্যানরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক পক্ষ জন কুইন্সি অ্যাডমসের নেতৃত্বে নিজেদের "ন্যাশনাল রিপাবলিক্যানস" বলে পরিচয় দিতে লাগল। এই দল অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল হয়ে উঠল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাডামস্ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু অপর পক্ষ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজেদের পরিচয় ঘোষণা ক'রে নির্বাচনে নামে, এবং তাদের পক্ষ থেকে এণ্ড্রু জ্যাক্‌সন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। এই দল "ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক্যানস্" বলে নিজেদের অভিহিত করত।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমোক্ত দলটি হুইগ নাম গ্রহণ করে। এই হুইগদের সঙ্গে বিপ্লবী হুইগ বা স্বদেশীদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। এমন কি ইংল্যাণ্ডের হুইগদের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক ছিল না। তারা ছিল রক্ষণশীল, কেবল ভোট টানার জন্যই "হুইগ" নাম গ্রহণ করেছিল। এই সময়ে ফেডারয়্যালিষ্ট-ন্যাশনাল রিপাবলিক্যান-হুইগ দলের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল, কারণ সীমান্ত রাজ্যগুলি সবই জ্যাক্‌সনপন্থী রাজনীতির পক্ষে ভোট দিয়েছিল। হুইগরা কোন প্রকারে তাদের দলের দু'জন খ্যাতিমান সমরনায়ককে জয়ী করাতে সমর্থ হয়েছিল: ১৮৪০ খ্রীঃ উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসন এবং ১৮৪৮ খৃঃ জ্যাকারি টেলর নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৮৫০ দশকে দাসপ্রথা নিয়ে দলীয় সংঘাত আরও তীব্র হয়ে ওঠে, এবং ইতিমধ্যে 'ডেমোক্র্যাট, নামে পরিচিত হুইগ এবং ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিক্যান

দলে দাস-প্রথা প্রসঙ্গে অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দিল এবং উভয় দল বিভক্ত হয়ে গেল। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ডেমোক্র্যাটরা পরস্পর-বিরোধী হয়ে উঠল। হুইগ পার্টি ভেঙ্গে গেল এবং মূলতঃ দাস-প্রথার বিরোধিতা করার প্রশ্ন নিয়ে রিপাবলিকান নাম নিয়ে একটি নতুন পার্টি গড়ে উঠল। এব্রাহাম লিঙ্কন এই পার্টির পক্ষ থেকে প্রেসিডেণ্ট প্রার্থী মনোনীত হয়ে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে জয়লাভ করলেন।

ভৌগোলিক ভিত্তিতে পার্টি-সংগঠনের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে ওয়াশিংটং পূর্বেই আমেরিকানদের সচেতন করে দিয়েছিলেন। ১৯৬০ খৃঃ ভৌগোলিক ভিত্তিতে দলীয় দ্বন্দ—দাসপ্রথা নিয়ে উদ্ভূত উচ্ছাসের সংঙ্গে জড়িত হয়ে ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। এই উচ্ছাসবিজড়িত দাস-প্রথার প্রশ্ন ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ও দক্ষিণাঞ্চলের তুলা-ব্যবসায়ীদের স্বার্থের মধ্যে দীর্ঘ দীনের সংঘাত ছিল। প্রথমোক্তরা চড়া হারে এবং শেষোক্তরা নিম্নহারে শুল্ক দিত। উভয় সংঘাতই আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রকটিত হয় এবং জাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। বিরোধীরা এর ফলে অন্তর্যুদ্ধ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। লিঙ্কন নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

এই অন্তর্যুদ্ধের পর আমেরিকানরা আর কখনও সেইভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে নি। শ্রমিক আইন, ব্যয়, রাজস্ব, সামাজিক নিরাপত্তা বা একচেটিয়া আধিপত্যের বিরোধিতা নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত এলোপাথারি হয়ে কাজ করেছে, কিন্তু কোন বিশেষ একটি স্বার্থসংঘাত অপর সমস্ত সংঘাতকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। ধনী-দরিদ্রের সংঘাত এবং সহুরে জনসাধারণ ও চাষীদের সংঘাতই প্রধানতঃ উত্তর ও দক্ষিণ এবং উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের সংঘাতকে ছাপিয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ স্বার্থ নিয়ে অন্তর্যুদ্ধ হবার মত অবস্থা আর কখনও সৃষ্টি হয় নি।

যুক্তরাষ্ট্রে আর কোন বিপ্লব দেখা দেবারও সম্ভাবনা নেই। রাশিয়ার কেরেনেস্কি-বিপ্লব বা হিটলার ও মুসোলিনী জার্মাণী ও ইতালিতে যেভাবে অন্তবিপ্লব এনেছিলেন সে রকম কোন বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার মত অবস্থা ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের পর থেকে আমেরিকায় সৃষ্টি হয় নি। কোন সহিংস জন-সংঘাত দেখা দিলে দেশের বিপুল পরিধির জন্য সেটা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি, ঝিমিয়ে পড়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের কোন ব্যাপক অংশ জুড়ে সহিংস সংঘাত দেখা যায় নি। মুসোলিনী যেভাবে ইতালীর তদানীন্তন সরকারের পতন ঘটিয়েছিলেন, সে রকম কোন মোর্চা নিয়ে ওয়াশিংটন অভিযান ক'রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পতন ঘটানোর সম্ভাবনা এখানে অচিন্ত্যনীয়।

আমেরিকার বর্তমান রাজনৈতিক পার্টি—রিপাবলিক্যান ও ডেমোক্র্যাটিক দল দুটি কি করে সৃষ্টি হ'ল তার কথাও অনেকাংশে আমেরিকার এই অনুকূল পরিস্থিতির বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে। প্রায় শত বৎসর ধ'রে বিভিন্ন ধরণের দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমেরিকান জনসাধারণ এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যাতে ক'রে অন্তর্যুদ্ধ বা বিপ্লবের সম্ভবনা এড়িয়েই তাদের জটিল রাজনৈতিক সংঘাতগুলির সমাধান করা যায়।

—২

কোন বিজয়ী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কর্তৃত্বাধীনে সরকার গঠন করতে গিয়ে সজ্ঞান পরিকল্পনার চেয়েও অধিকতর পরিমাণে সহজাত প্রবণতার বশবর্তী হয়েই আমেরিকার আধুনিক দ্বি-দলীয় পদ্ধতিটি গড়ে উঠেছে। প্রেসিডেণ্ট, সেনেট ও প্রতিনিধি সভা, সবই প্রায় সব সময়ে একটি দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সংখ্যালঘু দলও কিন্তু সাধারণতঃ এমনভাবে পরাজিত হয় না যা'তে করে জয়ের আশা একেবারে মুছে যায়।

য়ুরোপের বহুদলীয় সরকার ও ব্রিটেনের দ্বি-দলীয় পদ্ধতির সংঙ্গে আমেরিকার এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য আছে। আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, য়ুরোপীয়ানরা তা বুঝতে পারে না, ইংরেজরাও তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।

য়ুরোপীয় গণতন্ত্রে বহু দল থাকে, এবং প্রত্যেক দলেরই এক একটি স্বতন্ত্র আদর্শ থাকে। একদল ক্রিশ্চয়ান সোস্যালিষ্ট এবং অপর দল রক্ষণশীল ক্যাথলিক হতে পারে। ইতিহাসের অদ্ভুত আবর্তে র‍্যাডিকাল সোস্যালিষ্ট দলকেও মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী-স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে হতে পারে। সেখানে আবার কমিউনিষ্টরাও আছে। উৎকৃষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা ও অনড় অভিপ্রায় নিয়ে তারা যে কোন দলের সঙ্গে ভিড়ে প'ড়তে পারে এবং সে দলকে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে।

বহু দলীয় ব্যবস্থার আদর্শ হচ্ছে, প্রত্যেক দলেরই স্বতন্ত্র আদর্শ থাকবে, এবং জনসাধারণের যার যে আদর্শ মনঃপুত হ'বে, সে সেই অনুযায়ীই এক এক দলে যোগদান করবে এবং সেই দলকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে। কিন্তু আধুনিক জীবন বড় জটিল। এখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বহু মতামত থাকায় এ'তে বহু "খুচরো উপদল" সৃষ্টি হবার সুযোগ রয়েছে, এবং হয়েছেও তাই।

কিন্তু পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে গঠিত গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনা করতে পার্লামেণ্টে সরকারী দলের সংখ্যাধিক্য থাকা চাই। প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীপরিষদের আনীত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত না হলে সেই সরকারের 'পতন' অনিবার্য। এর ফলে হয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রপরিষদকে পদত্যাগ করতে হবে, অথবা শাসনতন্ত্রে সে রকম কোন ব্যবস্থা থাকলে—পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন ভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। য়ুরোপে সরকার গঠন করার সময় তাই দেখা যায়, প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পার্টিকে 'কোয়ালিশন' করে সরকার গঠন করতে হয়।

প্রত্যেকটি পার্টিই নিজের মতটিকে একমাত্র সাচ্চা মনে করে; কিন্তু গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া বিশুদ্ধ পার্টি-নীতি অনুযায়ী তারা একক কেউ সরকার পরিচালনা করতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে হলে স্বকীয় বিশুদ্ধতার সঙ্গে অপর দু'তিন দলের অবাঞ্ছিত নীতির সংমিশ্রণে কাজ করতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন দলের এই মিলন স্থায়ী হতে চায় না,

অনেক সময় উন্নয়নমূলক কাজ দৃঢভাবে চালিয়ে যাবার পূর্বেই সরকারের পতন ঘটে।

এ ছাড়াও আমেরিকানদের কাছে আর একটি বিষয় নৈরাশ্যজনক মনে হয়। তারা দেখেছে, বহু পার্টি অধ্যুষিত দেশে একমাত্র মডারেট বা মধ্যপন্থী দলগুলি সম্মিলিত হয়েই তবে দেশকে একনায়কত্বের হাত থেকে মুক্ত রাখতে পারে।

সাধারণতঃ যেমন বলা হয়ে থাকে, এই মধ্যপন্থীদের দক্ষিণে থাকে ফ্যাসিষ্টরা; তারা গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত করে নতুন এক হিটলার বা মুসোলিনীকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, এবং বামে থাকে কমিউনিষ্টরা—তারা চেকোশ্লোভাকিয়ার মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করতে চায়। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুকূল দলগুলি ঐ দুই শক্তির মাঝামাঝি জায়গায় থাকে, কোন কোনটি দক্ষিণ দিকে, আবার কোন কোনটি বাম দিকে একটু বেশী ঝুঁকে যায়।

এইরূপ পার্টি সংগঠন সুবিধাজনক নয়, কারণ এতে গণতন্ত্রী দলগুলো উল্লিখিত দুই প্রকার একনায়কত্বের টানাপড়েনে একদলে ভিড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। ফ্যাসিস্টরা নিও নাৎসীরা 'দক্ষিনপন্থীরা মূলতঃ সবাই এক'—এই কথা ব'লে কিছু কিছু সৎ রক্ষণশীলকে দলে টেনে নিতে পারে। কমিউনিষ্টরা 'সমস্ত বামপন্থীদের সংযুক্ত ফ্রন্টের' নামে সরল উদারতন্ত্রীদের প্রায়ই এইভাবে প্রতারিত করে থাকে। এদের এই সমস্ত অসৎ প্রচেষ্টা সফল হলে দেশের রাজনীতিতে দুই পরস্পর বিরোধী শক্তি তুল্যরূপ ধারণ করবে, এবং নির্বাচকদের তখন ফ্যাসিষ্ট ও কমিউনিষ্ট সর্বাত্মক একনায়ক-তন্ত্রের একটিকে বাছাই করে নিতে হবে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আত্মঘাতী পরিকল্পনার একটিকে বাছাই করে নেওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে হ'লে স্বাধীন বিশ্বকে 'জলে কুমীর ও ডাঙ্গায় বাঘের' নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে রাখা সমীচীন হবে না।

একদিকে ফ্যাসিষ্ট, অপর দিকে কমিউনিষ্ট, এবং মধ্যখানে উভয়ের দ্বারা আক্রান্ত গণতন্ত্রী শক্তি,—পার্টিগুলির অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করা যথার্থ হবে না। পার্টি-গুলির সত্যিকার সম্পর্ক অনেকটা ক্ষীণসূত্র ত্রিভুজের মত। গণতন্ত্রী পার্টি ও প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে একদিকে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রী পার্টিগুলি রয়েছে অপরদিকে, পরস্পরের দূরত্ব বেশী নয়। ফ্যাসিষ্ট বা চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং কমিউনিষ্ট বা উগ্র বামপন্থী উভয়েই সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রী পুলিশী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কেবল ক্ষমতা নিয়ে, লোকচক্ষুর অন্তরালস্থ অসৎচক্রের লড়াইয়ের মত। ১৯৩৯ সালে হিটলার ও ষ্টালিন যেমন মৈত্রীবদ্ধ হয়েছিলেন, এরাও সেইভাবে প্রায়ই মৈত্রীবদ্ধ হয়ে থাকে। পার্লামেণ্টে কমিউনিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট সভ্য বেশী থাকলে সরকারকে গদীচ্যুত করার আশায় তাদের প্রায়ই যৌথভাবে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে দেখা যায়।

গণতন্ত্র বিরোধী দলের সভ্যরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হবে মনে করলে যে কোন রকম রাজনৈতিক ডিগবাজি খেলতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ

পূর্ব-জার্মাণীর কমিউনিষ্ট সরকারের কথা বলা চলে। সেখানে কমিউনিষ্টরা প্রাক্তন নাৎসীদের নানা কাজে, বিশেষতঃ সৈন্য বিভাগে নিয়োগ করেছে।

আমেরিকানদের কাছে যে বিষয়টি বহুদলীয় রাজনীতির চরম ত্রুটি ব'লে মনে হয় সেটা হচ্ছে, জনসাধারণের স্বাধীনতা এতে প্রতিটি নির্বাচনেই মধ্যপন্থী গণতন্ত্রী দলগোষ্ঠীর জয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি নির্বাচনই এতে স্বাধীনতা ও সর্বনাশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় জনসাধারণের কেবল উত্তপ্ত কড়াই ও জলন্ত আগুনের মধ্যে একটাকে বাছাই করে নিতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বহু য়ুরোপীয় রাষ্ট্রকে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। পছন্দ হোক্ আর না হোক, মন্দের ভাল হিসাবে জনসাধারণকে উত্তপ্ত কড়াইয়ের মধ্যেই বসে থাকতে হয়েছে। উত্তপ্ত কড়াই থেকে ঝাঁপ দিলেই গিয়ে পড়ত সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রের আগুণের মধ্যে, পূর্ব য়ুরোপের জনগণ সে আগুণে দগ্ধ হচ্ছে।

আমেরিকান প্রথা ত্রুটিহীন নয়, কিন্তু এতে একটি সুবিধা হচ্ছে,—জনসাধারণ স্বাধীন সরকার গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দলদ্বয়ের একটি বাছাই করে নিতে পারে। দেশোন্নয়ন, দেশরক্ষা বা অপব্যয় ও দুর্নীতি নিবারণ ইত্যাদি ব্যাপারে জনসাধারণ কোন একটি দলকে অধিকতর কার্যকরী মনে করতে পারে। কিন্তু কেবল নির্বাচন দ্বন্দ্বের আবেগময় মুহূর্তগুলি ছাড়া জনসাধারণ বিশ্বাস করে যে, বিরোধী পার্টি জয়লাভ করলেও সেটা অন্ততঃ আমেরিকান বিরোধী ও গণতন্ত্র বিরোধী হবে না। এখানে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ আত্মঘাতী দল নেই যা জনসাধারণের অসচেতন মুহূর্তে শাসকদলকে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে দেশকে রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে পারে।

এই রকম স্বাধীনভাবে সরকার মনোনয়ন করার ব্যবস্থার জন্য পার্টিগুলিকে উপযুক্ত নেতা ও সমর্থক এবং যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যুক্তিসহ আদর্শ তুলে ধরতে হয়। জয়ী দলকেও কম বেশী নিষ্ঠার সঙ্গে জনসাধারণের অভিপ্রেত সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

একবার যদি মেনে নেওয়া হয় যে, আমেরিকার দ্বিদলীয় রাজনীতির স্বার্থে উভয় দলকে কার্যতঃ ভোটারদের একটা বিরাট অংশ কর্তৃক সমর্থিত আদর্শ ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে, উভয় দলের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনও। নির্বাচনের পূর্বে উভয় পার্টি জনসাধারণের সামনে কার্যক্রম তুলে ধরে এবং নিজেদের শাসনক্ষমতা পরিচালনার যোগ্য প্রমাণিত করতে চায়। জনসাধারণেরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন থাকলে সে সম্পর্কেও তাদের সচেতন করে তুলতে হয়। সুতরাং আমেরিকার নির্বাচকদের কাছে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিক্যান দল দুইটিকে প্রার্থীর বিভিন্নতা ছাড়া অভিন্ন মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এখানে পার্টি হচ্ছে নির্বাচনে জয়লাভ করার ও সরকার নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার লাভের সংগঠন, কোন আদর্শের বিকল্প আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য পার্টি নয়।

অবশ্য পার্টিগুলির মধ্যে একমাত্র প্রার্থী ছাড়া আদর্শ ও কর্মসূচীর কোন অনৈক্য

নেই এ'কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সাদৃশ্য যতই থাক, একজন সম্পূর্ণ আর একজনের মত হতে পারে না।

ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিক্যান দলের মধ্যে সত্যিকার পার্থক্য কোথায় এ'কথা কোন বিদেশী পর্যটকের কাছে বুঝিয়ে বলা আমেরিকানদের কাছে কষ্টসাধ্য, এমন কি দ্বি-দলীয় রাজনীতিতে অভ্যস্ত ইংরেজদেরও বোঝানো শক্ত হবে। নির্বাচনী বাগ-বিতণ্ডার কথা ছেড়ে দিলেও রক্ষণশীল, উদারতন্ত্রী, "ছন্নছাড়া স্বাধীনচেতার দল" ও ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে পার্টিগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সংখ্যা-লঘু দল সাধারণতঃ অর্থমঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ক্ষমতাশীল দল থেকে অনেক বেশী মিতব্যয়ী হতে চায় এবং সাধারণতঃ রাজ্যগুলির অধিকারের অধিকতর সমর্থক হয়ে থাকে। আঞ্চলিক এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থও এক একটি পার্টিকে অপর পার্টি অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবিত করে থাকে।

ফেডারেলিষ্ট ও জেফারসনপন্থীদের পুরানো পার্থক্যের জের কিছু কিছু এখনও রয়েছে। মনে হয়, কিছু সংখ্যক রিপাবলিক্যান ব্যবসায়ী স্বার্থের দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত হয়ে চলে, আবার কিছু সংখ্যক ডেমোক্রাট শ্রমিক স্বার্থের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়ে থাকে। কিন্তু উভয় পক্ষেই এর বহু ব্যতিক্রমও রয়েছে। কার্যক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায়, বৈদেশিক বা আভ্যন্তরীন বিষয় নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এলে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু দল বিভক্ত হয়ে যায়, তবে সব সময় তা একভাবে হয় না।

প্রার্থী অথবা নির্বাচনী প্রসঙ্গ নির্বিশেষে রিপাবলিক্যান অথবা ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীকে ভোট দেবার মত লোক দু'দলেই আছে, তবে নির্বাচকমণ্ডলীতে তারা সুনিশ্চিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। আমেরিকানদের দৃষ্টিতে দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক পদ্ধতির এ'ও একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। যদি দলবিশেষ জয়লাভ করবেই ধারনা হত, তাহলে নিবাচকরা একদলীয় পদ্ধতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। একদল তখন ভেঙ্গে দু'দলের সৃষ্টি করতে হ'ত। ১৮২৪ খৃঃ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক্যানরা এইভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। দ্বি-দলীয় রাজনীতি সুস্থভাবে চলার সময় মধ্যবর্তী "নিরপেক্ষ" লোকদের উপরই নির্বাচনের জয় পরাজয় নির্ভর করে। তারা প্রতিদ্বন্দ্বী দলদ্বয়ের কার্যক্রম ও প্রতিশ্রুতিগুলি যাচাই করেই ভোট দিয়ে থাকে। প্রতি নির্বাচনেই এই সমস্ত নির্বাচকরা ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিক্যানদের মধ্যেকার পার্থক্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারনার অনেকখানি গ্রহণ করে থাকে। সাধারণতঃ তারা রিপাবলিক্যান দলকে ডেমোক্র্যাটিক দল অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল বলে ধরে নেয়; এটার অর্থ তখন যাই হোক না তা'তে এসে যায় না। তার পর, তাদের উপর প্রভাব পড়ে সমৃদ্ধি, দুর্নীতি অথবা শান্তির আদর্শের; এগুলির মধ্যে অধি-কাংশই তারা বেছে নেয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের মাধ্যমে।

আমেরিকার কতকগুলি রাজ্য পুরোপুরিভাবে ডেমোক্র্যাটিক দলের পক্ষে এবং কতকগুলি পুরোপুরিভাবে রিপাবলিক্যানদের পক্ষে থাকায় সাধারণতঃ একে গণতান্ত্রিক

পদ্ধতির একটি ক্রটি বলা হয়ে থাকে। অঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী দলের প্রাথমিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার অধিকার তাদের থাকলেও কার্যতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাচনে এই সমস্ত রাজ্যের প্রকৃত কোন ক্ষমতা নেই।

কোন একটি বিশেষ দল অধ্যুষিত রাজ্য জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রিত করতে না পারার ফলেই সামগ্রিকভাবে জাতীয় গণতন্ত্র নিরাপদ রয়েছে। আমেরিকার সৌভাগ্য, এখানে সংহত কোন ধর্মীয় বা বর্ণগত গোষ্ঠী নেই যা'রা প্রার্থীর গুণাগুণ বা সমস্যা বিচার না করেই কাউকে দলবদ্ধভাবে ভোট দেবে। আমেরিকান-দের মতে, বিভিন্ন দলের প্রার্থী ও মতবাদ অবাধে বেছে নেবার জন্য নির্বাচকদের অধিকারের ভিত্তিতে অধিকাংশ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপরই গণতন্ত্র নির্ভর করে।

ব্রিটেনের দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এ থেকে একটু স্বতন্ত্র। ব্রিটীশ জনসাধারণ মনে করে, আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিক্যানদের মধ্যে আদর্শ ও কার্যক্রম নিয়ে যতখানি পার্থক্য আছে, বৃটেনের শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে সেই পার্থক্য তদপেক্ষা অনেক বেশী। যদি তাই হয়, তাহলে সেই পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করা প্রয়োজন।

সম্ভবতঃ এই পার্থক্যের সব চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা হচ্ছে—দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক পদ্ধতিতে নির্বাচকরা যখন অন্তর্যুদ্ধ ছাড়াই যে কোন একটি প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারে, তখন যত সম্ভব তারা ভিন্ন নীতি ও মতামত দেখতে চায়। প্রগতির মূল ধারা নিয়ে আমেরিকায় কোন গুরুতর মতদ্বৈধতা নেই। কোন বড় দলই এখানে একনায়কত্বের পথ গ্রহণ করতে চায় না, দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় বা সামগ্রিক দুর্বিপাক দেখা দিতে পারে এমন কোন নীতি গ্রহণ করে না।

কিন্তু এ হচ্ছে প্রশস্ত পথ। এর সঙ্গে রয়েছে দ্রুত ও মন্থর অলিগলি; সময় সময় আঁকাবাঁকা বা সংক্ষিপ্ত পথ। দ্রুত ও মন্থর অলিগলির মধ্যে দিয়ে পার্টিগুলির প্রকৃত পার্থক্য প্রায়শঃই পরিস্ফুট হয়ে উঠে এবং নির্বাচনে জনসাধারণ সে সমস্ত পার্থক্য বিচার করে দেখে।

সরকার-বিরোধী দল জনসাধারণের সমালোচনা ও তাদের অসন্তোষগুলিকে জনসমর্থন লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, এবং এইভাবে সরকারী দলের জন সমর্থন ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বহু সংখ্যক নির্বাচক শঙ্কিত হয়ে উঠতে পারে এমন কাজ কোন দলই করে না। বাস্তবপন্থী রাজনীতিজ্ঞেরা এমনভাবে নির্বাচনী প্রসঙ্গ নির্ধারণ করে নেয় যাতে কেউ তাদের শাসনতন্ত্র উল্টে দেওয়ার অভিসন্ধির দায়ে অভিযুক্ত করতে না পারে।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যদি আমেরিকার রাজনৈতিক দলগুলি অপেক্ষা অধিকতর পার্থক্য থাকে, তবে তার এই কারণ হতে পারে যে ব্রিটেনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নির্বাচনসাপেক্ষে বিপুল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে দিতে পারে, অথচ, জনসাধারণ তাতে তাদের প্রতি বিশেষ বিরূপ হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহের হুমকি ব্রিটিশ জনসাধারণকে বড়

উত্তেজিত করে তুলেছিল। কিন্তু তার পর থেকে ব্রিটিশ জনসাধারণ আর কখনও তেমন উত্তেজিত হয় নি, মনে হয় আমেরিকানদের চেয়েও তারা কম উত্তেজনা অনুভব করে, কোন রকম গণ্ডগোল না করেই তারা চার্চিলের পরিবর্তে এটলীকে শাসন কর্তৃত্বে বসিয়েছে, আবার এটলীর স্থলাভিষিক্ত করেছে চার্চিলকে। আমেরিকানরা সমাজতন্ত্রী দলের জয় হয়ত এত শান্তভাবে গ্রহণ নাও করতে পারে, কিন্তু তারা কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়াই হুভার থেকে রুজভেল্ট, এবং টু্ম্যান থেকে আইজেনহাওয়ারকে গ্রহণ করতে পারে। দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কার্যক্ষেত্রে দু'টি দলের প্রকৃত পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিক্যান দলের মধ্যে তাই কমবেশী পরস্পরবিরোধী লোকজন রয়েছে। এই পার্টিগুলির মধ্যে সব সময়েই বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে। আগামী নির্বাচনে নেতৃবৃন্দকে জয়ী করতে হবে এই চিন্তাই হয়ত পার্টিকে বিচ্ছেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু সময় সময় কোন কোন বিদ্রোহী নেতা দলত্যাগ করে তৃতীয় দল সৃষ্টি করে। পরিত্যক্ত দল তাদের কাছে অত্যন্ত রক্ষণশীল মনে হওয়ায় তারা আর সেই দলে থাকতে পারে না। ১৯১২ সালে থিওডোর রুজভেল্ট এইভাবেই রিপাবলিক্যান দল পরিত্যাগ করেছিলেন এবং প্রগ্রেসিভ বা বুল মুজ পার্টি গঠন করেন। রবার্ট-লা ফোলেট (বড) ১৯২৪ সালে প্রগ্রেসিভ হিসাবে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন। এ'ও রিপাবলিক্যান দলের মধ্যে বিচ্ছেদের ফলে হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ডেমোক্রেটিক দল থেকে দু'টি বিচ্ছিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। ওয়ালেসপন্থী প্রগ্রেসিভরা ডেমোক্র্যাটদের অতিরিক্ত রক্ষণশীল ব'লে সমালোচনা করেছিল, কিন্তু ডিক্‌সক্র্যাটরা গণতন্ত্রীদের অতিমাত্রায় প্রগতিবাদের দায়ে অভিযুক্ত করেছিল। কিন্তু কোন বিচ্ছিন্ন দলই মূল পার্টিকে ধ্বংস করতে পারেনি, এবং নিজেরাও তার স্থান গ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য ১৯১২ সালে বুল মুজারদল গঠিত হওয়ায় রিপাবলিক্যানরা শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং এরই ফলে উড্রো উইলসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তৃতীয় দল গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে, তারা সব সময়েই আদর্শগত বিরোধ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে, এবং যারা সেই বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী কেবল তাদেরই দলে টানতে পারে। এই সমস্ত ছোট-খাট দলগুলির সমর্থকদের অনেকেই খোলাখুলিভাবে আদর্শগত ভিত্তিতে দল পুনর্গঠনের কথা বলে থাকে এবং সাদৃশ্যমূলক দ্বি-দলীয় রাজনীতির অবসান চায়।

তারা চায় রক্ষণশীলরা, দেশীয় ফ্যাসিষ্ট ও তথাকথিত পাগলাটে দক্ষিণপন্থী-সহ সবাই একটি রক্ষণশীল দলেই থাকবে, আর উদারতন্ত্রীরাও সবাই থাকবে একদলে এবং সেখানে কমিউনিস্ট থেকে তথাকথিত 'পাগলাটে বামপন্থী' সবাইকে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারা মনে করে এই রকম ব্যবস্থাতে নির্বাচকরা যথার্থভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে।

কিন্তু মুড়ি-মুড়কির এই স্বতন্ত্রকরণের প্রস্তাব কার্য্যকরী হলে দেশের মধ্যে দুই

ভয়ঙ্কর প্রান্তিক বিরুদ্ধতা গড়ে উঠবে। এটা আত্মহত্যার যুক্তির মতই মারাত্মক হবে। যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, জনসাধারণকে তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের সুযোগ দেবার জন্য সার্থক গণতন্ত্র মাত্রকেই কোন না কোন প্রকার পার্টিপ্রথা প্রবর্তন করতে হয়। কোন সংঘাতে প্রবৃত্ত হতে না দিয়ে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী স্বার্থকে স্বার্থের করার পথে অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক্যানদের রয়েছে। এই ব্যবস্থায় বহু ত্রুটি আছে, এবং এর জন্য বহু অযৌক্তিক রফা করতে হয়েছে, কিন্তু তবুও এ'পর্যন্ত এ'তে কোন বিপর্যয় হয় নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দল দুইটিকে যারা পরিচালনা করেন, এই সমস্ত বাস্তববাদী রাজনীতিকদের বেশীর ভাগই আদর্শগত ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটি দল গঠনের প্রস্তাব ভাল চোখে দেখেন না? যখন অসন্তুষ্ট নির্বাচকরা দলত্যাগ করে তৃতীয় পার্টি সৃষ্টি করে, তখন তারা তাদের জন্য দলের দরজা বন্ধ করে দেন না। তৃতীয় দলের কবলমুক্ত করে নির্বাচকদের যথাসম্ভব দলে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁরা একটা আপোস করবার চেষ্টা করেন। দলত্যাগী নেতৃবৃন্দ দলে ফিরে এলে দলের অন্যান্য ভোটারদের বিগড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে তাঁরা কেবল সেই সমস্ত বেয়াড়া নেতৃবৃন্দের দলে ফিরে আসার পথ রুদ্ধ করে দেন। বিরুদ্ধ মতের লোকদের একযোগে বেঁধে রাখবার এই ব্যবস্থাই দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক পদ্ধতির সব চেয়ে বড় শক্তি।

তৃতীয় পার্টি ছাড়াও এখানে ছোটখাট অগণিত দল থাকে। এদের মধ্যে কতক-গুলো কোন কোন অঞ্চলে বেশ শক্তিশালী, যেমন কৃষক-শ্রমিক দল এবং বিভিন্ন প্রগতিবাদী পার্টি, এই শতাব্দীর প্রথমভাগে এরা মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল।

অন্যান্য ছোটখাট দলগুলি জাতিগত ভিত্তিতে সংগঠিত এবং কয়েক লক্ষের বেশী ভোট তারা পায় না। কোন একটি রাজ্যে নির্বাচিত হতে পারবে এমন আশা তাদের সদস্যরা করে না। অবশ্য, সোস্যালিষ্টরা বেশ কিছুদিনের জন্য মিল-ওয়াকি ব্রিজপোর্ট সহরের উপর কর্তৃত্ব করতে পেরেছিল। ছোট ছোট পার্টিগুলি আশা করে যে, নির্বাচনে নেমে এবং নিজেদের সংখ্যালঘু উৎসাহী সমর্থকদের সংহত করে তারা বড় বড় পার্টিগুলিকে তাদের সমর্থন লাভের আশায় নিজেদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে রাজী করাতে পারবে। ছোটখাট দলগুলির দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজও হয়ে থাকে। তাদের নেতাদের মধ্যে কেউ শাসন সরকারে থাকে না, কিন্তু তারা আগামী কালের আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হবার পথ উপদলগুলির নিকট উন্মুক্ত করে দেয়। উনিশ শতকের প্রথমভাগে সোসালিষ্টদের পরিকল্পনাগুলির প্রায় সবই আজ—অবশ্য স্বতন্ত্র নামে—ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিক্যান দলের কার্যক্রমে স্থান লাভ করেছে। এক সময় মাদক-নিবারণকারীদের প্রস্তাব শাসনতন্ত্রের সংশোধন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। কমিউনিষ্টদের সমর্থক সংখ্যা অল্প হলেও প্রতিক্রিয়াশীল প্রার্থীকে সমর্থন করে বা কোন লিবার‍্যাল প্রার্থীকে অবাঞ্ছিত সমর্থনের প্রলোভন দেখিয়ে নির্বাচনকে খানিকটা তারা প্রতিকূল প্রভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

১ পবিশেষে প্রধান প্রধান দলগুলিকে চাপে ফেলতে পাবে এমন গোষ্ঠীগুলির কথা বর্ণনা না-করে আমেবিকার পার্টি-পদ্ধতিকে যথাযথভাবে বর্ণনা করা যাবে না। সরাসবি নির্বাচনে না নামলেও এবা তা'তে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে এরা দাঁড়ায় না। সবকাবী পদেব জন্য কাউকে নির্বাচিত কবাব প্রয়োজন হলে তাবা কোন বড পার্টিব মনোনীত প্রার্থী হিসাবে তাকে দাঁড কবায় এবং পরোক্ষভাবে সে নির্বাচনকায সমাধা কবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার "ফেডাবেশন অফ্ লেবাব'-এব কথা বলা চলে। বহুদিন পূর্বে থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি আমেবিকাব বড দুটি বাজনৈতিক দলকেই শ্রমিক সমর্থন লাভেব জন্য প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে দিয়েছে। আমেবিকায় যে "শ্রমিক দল" নেই তাব কাবণও এইখানে। শ্রমিক নেতাবা যে দলেব যে প্রার্থীকে শ্রমিক স্বার্থেব দিক থেকে সুবিধাজনক মনে কবে, (কোথাও বিপাবলিক্যান আবাব কোথায় বা ডেমোক্র্যাট) সে প্রার্থীকেই সমর্থন কবে। তাবা মনে কবে, "শ্রমিক সমর্থনকে" পবাজিত দলেব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কবা অপেক্ষা জয়ী দলেব উপব প্রভাব বিস্তাব কবে অধিকতর সুযোগ সুবিধা আদায কবাই শ্রেয়ঃ। তাছাড়া "শ্রমিক ভোট" বলতে স্বতন্ত্র কিছু আমেরিকায় দেখা যায় না। আমেবিকাব শ্রমিকবা সব সময় নেতাদেব উপদেশ মত ভোটও দেয না। যাঁকে বলে "শ্রেণী চেতনা,"—ইউবোপের তাদের কতকগুলি দেশেব মত আমেবিকাতেও তাব বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই।

এ'ছাড়া যুক্তবাষ্ট্রীয় চেম্বাবস্ অফ কমার্স ও ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ম্যানু-ফ্যাকচারর্স (ব্যবসায়ী স্বার্থমূলক সংগঠন; ফার্ম ব্যুবো ফেডাবেশন দি গ্র্যাঞ্জ, এবং ফার্মার্স ইউনিয়ন (কৃষকদেব স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান), লীগ অব ওমেন ভোটার্স ও জেনাবেল ফেডাবেশন অব ওমেনস্ ক্লাবস্, আমেবিকান লিজিয়ান ও ভেটারেন্স অব ফরেন ওয়াবস এবং ডটাবস্ অব আমেবিকান বিভলিউশান ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠনই আমেবিকাব রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে।

যে সমস্থ সংগঠন কেবল নিজেব স্বার্থ-সিদ্ধিব জন্যই আইনসভাব সদস্যদের প্রভাবিত কবার চেষ্টা করে, এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেশেব কল্যানের জন্য বাজনীতি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে, যুক্তবাষ্ট্রীয় আইনে বাজস্ব আদায়েব ক্ষেত্রে তাদের প্রতি ভিন্ন ব্যবস্থা করাব চেষ্টা কবা হয়েছে। বাজনৈতিক দল অথবা আইনসভার লবীতে হানা দিয়ে প্রতিনিধিদেব প্রভাবিত করে কার্যসিদ্ধি কবাব প্রয়াসী 'লবী' নামে খ্যাত সংস্থাগুলির আয়ের উপব যুক্তবাষ্ট্র সবকার যখন কব ধার্য্য কবেন তখন আয়েব পরি-মাণ থেকে বাইরেব লোকের দানের অর্থ বাদ দেওয়া হয় না।

বাজনৈতিক দলগুলিকে তাই বিভিন্ন ধরণেব প্রভাব ও চাপেব মধ্যে দিয়ে কাজ কবতে হয়। তারা শুধুমাত্র নির্বাচকদের প্রয়োজন (যেটাকে তারা সম্ভাব্য মনে করে) মিটিয়েই চলে না, নানা অসাধু "স্বার্থবাদীদেব" প্রভাবেও চালিত হয়। এই সব স্বার্থ-সংশ্লিষ্টবা হাতেব সুতো টেনে "ধোঁয়া ভর্তি-ঘরে" উপবিষ্ট ব্যক্তিদের চালায়।

বড় বড় পার্টিগুলির চারদিকে রয়েছে ছোট ছোট পার্টি ও ব্যক্তিগত সংগঠন। তারা নানাভাবে বড় বড় দলগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে। তাদের প্রত্যেকটি পার্টি বলে— তাদের সহস্র সহস্র সমর্থক আছে, এবং যে পার্টির প্রতিশ্রুতি তাদের কাছে যথার্থ মনে হবে, তাকেই তারা সমর্থন জানাবে। পার্টিনেতাদের কাজ প্রতিশ্রুতিগুলির যথার্থ সমন্বয়সাধন করা এবং শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে কার্য সমাধা করা। নির্বাচনে জয়লাভ এর উপরই নির্ভর করে।

॥ দলীয় সংগঠন ও কার্যধারা ॥

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রসঙ্গে আমেরিকায় যখন প্রথম রাজনৈতিক পার্টিগুলির উদ্ভব হয়েছিল তখন সারা দেশ জুড়ে তাদের কোন সংগঠন ছিল না। জাতীয় কর্মসূচী ও প্রেসিডেন্ট পদের জন্য জাতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে বিভিন্ন মতামত সৃষ্টি হত মাত্র। কংগ্রেস তখন বিভিন্ন বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে যেত এবং দলের নেতৃবৃন্দরা নিজেরা সম্মিলিত হয়ে নির্বাচনের জন্য প্রতিনিধি ঠিক করে দিত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে এইভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন দলের সভ্যদের অমনঃপূত হয়ে গেল। যে সমস্ত পার্টি নেতা কংগ্রেসের সদস্য ছিল না তারা কেবল নির্বাচনে নয়, নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রেও নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে চাইল। নির্বাচকদের অযথা অসন্তুষ্ট না করে ও ভোট না হারিয়ে অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞেরা প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করে। আমেরিকায় পার্টিগুলির অগ্রগতির ইতিহাস অনেকখানি এই সংগ্রামেরই ইতিহাস।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এণ্ড্রু জ্যাকসনকে দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী মনোনীত না করে কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিকান দলের অভ্যন্তরীন কেন্দ্রটি নির্বাচকদের নিরাশ করেছিল। চার বৎসর পরে তারা সে ভুলের সংশোধন করে নেয়। এণ্ড্রু-জ্যাকসন এইবার নির্বাচিত হন, কিন্তু কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ঘরোয়াভাবে প্রার্থী মনোনয়ন প্রথা সবার অপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর পর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি সম্মেলন করে নিজের নিজের প্রার্থী মনোনয়ন করতে থাকে। দলের স্থানীয় সম্মেলনগুলি রাজ্যসম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে, এবং রাজ্য-সম্মেলনগুলি দলের জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠায়। এই সম্মেলনগুলি স্থানীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদগুলির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী মনোনয়ন করে। বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্ষেত্রে দলের সক্রিয় সভ্যরা সমবেত হয়ে তাদের মনোমত প্রার্থী নির্বাচন করতে পারত ব'লে এই ব্যবস্থা তার স্বকীয় পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক ছিল বলতে হবে। অপর পক্ষে একমাত্র নির্বাচনের দিন ছাড়া দলের সাধারণ সভ্যরা তাদের মতামত প্রকাশের কোন অবকাশ পেত না। এইজন্য এর বিরুদ্ধেও সমালোচনা চলে এবং কালে বহু রাজ্যে প্রাথমিক নির্বাচনী প্রথা প্রবর্তিত হয়।

নির্বাচনী বৎসরে বসন্তকালে বা গ্রীষ্মের প্রথম দিকে আমেরিকার প্রায় সকল রাজ্যগুলিতেই প্রাথমিক নির্বাচন হয়ে যায়। এই সমস্ত নির্বাচনে পার্টিগুলি তাদের স্থানীয় রকার, রাজ্যসরকারের উচ্চপদ, এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রার্থীদের মনোনীত করে থাকে। কতকগুলি রাজ্যে দলের জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধিও প্রাথমিক নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে যায়। দলের জাতীয় সম্মেলনে কোন্ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে সমর্থন করবে, অন্ততঃ প্রথম কয়েকটি ভোট কাকে দেবে, এই প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দলের পক্ষ থেকে কাকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী দাঁড় করানো উচিত, নির্বাচকরা প্রাথমিক নির্বাচনে সে সম্বন্ধেও মতামত ব্যক্ত করতে পারে।

কিন্তু প্রাথমিক নির্বাচনী ব্যবস্থাগুলি এমন পর্যায়ে এসে পড়ে নি যাতে করে পূর্বাহ্নেই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী স্থির করে রিপাবলিক্যান ব. ডেমোক্র্যাটিক দলের জাতীয় সম্মেলন বসতে পারে, এবং কার্যতঃ সেরকম কখনও হয় নি। যে সমস্ত প্রার্থী প্রাথমিক নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করেও জাতীয় সম্মেলনে দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী মনোনীত হতে পারেন না, তাঁরা স্বতঃই রাজ্যের প্রাথমিক নির্বাচনী ব্যবস্থার সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চান। যে সমস্ত পেশাদার রাজনীতিজ্ঞ এই সমস্ত সম্মেলন পরিচালনা করেন, তাঁরা স্বভাবতঃই নিজের হাতের মুঠোয় দলের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রাখা শ্রেয়ঃ মনে করেন।

যতদিন পর্যন্ত দলের পক্ষ থেকে কে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তা নির্ণয় করার সত্যিকার ক্ষমতা জাতীয় সম্মেলনগুলির রয়েছে, ততদিন পর্যন্ত এই সমস্ত সম্মেলন আমেরিকার জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত উদ্দীপনাময় রাজনৈতিক উৎসব হিসাবে বিরাজ করবে।

এই সমস্ত সম্মেলনের হট্টগোল দেখে অনেকে আশ্চর্য হয়ে ভাবে, আমেরিকার মত মহান গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক দলগুলি এত হৈ-হুল্লোরের মধ্যে দিয়ে কেন তাদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনীত করে। উপরের হৈ-হুল্লোর দেখে এই সম্বন্ধে কোন ধারণা করা কিন্তু ভুল হবে। এখানে সম্মিলিত প্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে না। এখানে তারা দলের সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে তাদের উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছে, আর বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতারা অন্তরালে থেকে তাদের শক্তি যাচাই করে নিচ্ছে, কোন্ ব্যক্তিকে প্রার্থী মনোনীত করলে দলীয় ঐক্য বজায় থাকবে ও নিরপেক্ষ নির্বাচকদের অধিকতর সমর্থন পাওয়া যাবে, তাঁকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। দলের নেতারা প্রতিনিধিদের মনো-বাসনা অবহেলা করে না, কিন্তু তারা ঘরোয়া সভায় সমবেত হয়ে সমস্ত কিছু ঠিক করে নেয়। টেলিভিশনের পর্দায় এই সমস্ত ঘরোয়া বৈঠকগুলোকে দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে সম্মিলিত প্রতিনিধিরা সেই তথাকথিত বিক্ষোভের মধ্যে ব্যাণ্ডের বাজনায় ও কুচকাওয়াজের সুরে উল্লসিত হয়ে উঠে, দারুণ গ্রীষ্মেও তাদের উদ্দীপনা বেড়ে যায়। প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হলে কিন্তু তাদের যুদ্ধ-নৃত্য

তাণ্ডব রূপ গ্রহণ করে, এবং যতক্ষণ পরাজিত পক্ষ হৈ-হুল্লোর ও উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে সেই সম্মিলিত আনন্দরোলে যোগদান না করছে, এবং সবার মার্চের সুরে সামিল না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই যুদ্ধ-নৃত্য সমানে চলতে থাকে।

টেলিভিশনে দেখে এই দৃশ্য অনেকের কাছে অসভ্যতার পরিচায়ক মনে হতে পারে। সত্যিই এটা সভ্যতাসম্মত নয়। কিন্তু মানবজাতির অগ্রগতির ইতিহাসে যুদ্ধ-নৃত্যের সুদীর্ঘ ও সার্থক ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বের সমস্ত বর্বর জাতিগুলিই সহজাত অনুভূতি থেকে যুদ্ধ-নৃত্যকে তাদের গোষ্ঠীগত ঐক্য ও অলসতা ঝেড়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে সমস্ত বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞেরা জাতীয় সম্মেলনগুলির সৃষ্টি করেছেন তাঁদের সহজাত অনুভূতিকে উপেক্ষা করা সম্ভবতঃ ঠিক হবে না।

অপর পক্ষে, টেলিভিশানের প্রচলন হওয়াতে ভবিষ্যতে সম্মেলনের আঙ্গিকও অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। এতে দ্বিগুণ প্রতিনিধি (প্রত্যেকের যা হওয়া উচিত তার অর্ধেক সংখ্যক ভোট) পাঠানোর অভ্যাসেরও পরিবর্তন হতে পারে। এইভাবে ভোট দেওয়ার রীতিতে অযথা অনেক সময় নষ্ট হয়, এবং প্রয়োজন হলে সময় সময় এতে রাজনৈতিক নেতাদের সময়ক্ষেপ করতে সুবিধা হয়। টেলিভিশানের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিধিদের প্রচারিত হবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। ১৯৫২ সালে একজন বিক্ষুদ্ধ প্রতিনিধি নেতা 'টেলি-ভিশানে বলতে চাই' ব'লে চিৎকার করে উঠেছিলেন। কিন্তু এসব টেলিভিশনের দর্শকদের ভাল লাগে না, এবং তাদের বিরক্ত করা বিচক্ষণ রাজনীতির পরিচায়ক নয়। টেলিভিশনের ক্যামেরায় প্রায়শঃই টেলিস্কোপ-লেন্স থাকে ও জনসাধারণ সম্মেলন-মণ্ডপে তাদের ব্যক্তিগত আচরণ দেখতে পারে এবং বধির নাগরিকরাও মুখভঙ্গী দেখে তারা কি বলছে তা ধরে ফেলতে পারে, এই জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সংযত হবে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে।

কিন্তু সম্মেলনের আঙ্গিকের যতই পরিবর্তন হোক্ না কেন, দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেণ্ট প্রার্থী মনোনয়নের পর্বটি পার্টি নেতারা কখনও জাতীয় সম্মেলন ছাড়া হতে দেবে কিনা সন্দেহ আছে।

জাতীয় সম্মেলনে পার্টিগুলি দলের নির্বাচনী ইস্তাহার অথবা নীতিবিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ করে। সম্মেলনের প্রথম কয়েকদিন প্রস্তাব রচনার জন্য একটি কমিটি বসে। এই কমিটি শ্রমিক, ব্যবসায়ী, নারী, নিগ্রো এবং কৃষক প্রতিনিধি, বা যে কেউ নির্বাচনে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এমন রাজ্য থেকে অধিকতর ভোট টানার সম্ভাবনার দিক থেকে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে। কোন প্রতিনিধির আবেদনের অংশ বিশেষ নির্বাচনী ইস্তাহারে স্থান পেলে ভোট টানার পক্ষে সুবিধা হবে মনে করলে কমিটি তা নির্বাচনী ইস্তাহারের অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু তা পার্টিনীতি-বিরুদ্ধ হলে চলবে না। পার্টিনীতি বিরুদ্ধতা বলতে কি বোঝায়? দলের সাধারণ সভ্যরা অসন্তুষ্ট হবে এবং নির্বাচনের দিনে ভোট কেন্দ্র

অপেক্ষা ঘরে বসে থাকা শ্রেয় মনে করবে' এমন সব কাজই পার্টিনীতি বিরোধী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৪৮ সালে ডেমোক্রেটিক দলের জাতীয় সম্মেলনে "মানব অধিকার" বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহারের জন্য আইন প্রণয়নের প্রস্তাব নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক দেখা দেয়। এক পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এ'তে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির লক্ষ লক্ষ ভোটার দলের প্রতি আকৃষ্ট হবে, অন্যপক্ষ থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, এতে দলের লক্ষ লক্ষ "নিয়মিত সভ্য" দল পরিত্যাগ করে যাবে। শ্রমিক বা কৃষি-নীতি নিয়েও এই রকম তর্ক বিতর্ক উঠে, বিশেষতঃ এ রকম কোন প্রশ্নে যদি এক দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে দাঁড করানো সুবিধা-জনক হয়, তখন সেই প্রশ্নে খোলাখুলিভাবে দলের নীতি ঘোষণার দাবী করা হয়।

কমিটি অবশ্য যথাসম্ভব সকলকে সন্তুষ্ট রাখার দিকে দৃষ্টি রেখেই নির্বাচনী ইস্তাহার রচনা করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে—সুসম বাজেট, শুল্কের হার হ্রাস ও আমেরিকান জীবনধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করেই এই ইস্তাহার রচিত হয়।

পার্টিগুলি প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যাবলীর নজীরের উপরই নির্ভর করে। পার্টির বক্তারা এই সমস্ত নজীর দেখিয়ে নিজের পার্টিকে সৎ, সংহত ও নির্ভরযোগ্য বলে দাবী করে। বিরোধী দলের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে তাকে নির্বাচকদের কাছে অপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা ক'রে তারা নিজের দলের দিকে নির্বাচকদের আকৃষ্ট করতে চায়। প্রত্যেকটি পার্টিরই একটি সাবেকী ঐতিহ্য রয়েছে, বিরোধী দলের শোচনীয় হালচাল ও ঐতিহ্যর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তারা সেটা তুলে ধরতে চায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রিপাবলিকানরা তাদের পার্টিকে সৎ ও কর্মক্ষম হিসাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করে, এবং ডেমোক্র্যাটদের তারা অযোগ্য ও আধা-কমিউনিষ্ট ব'লে। ডেমোক্র্যাটরা নির্বাচকদের বলে, তারাই জনসাধারণের বন্ধু, প্রগতিপন্থী, কিন্তু রিপাবলিকানরা হচ্ছে ধনীর বন্ধু, রক্ষণশীল—"ধাক্কা দিয়ে ও হৈ-হুল্লোর করে তাদের বিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত করে তুলতে হবে।" উভয় দলেই অনেক গণ্যমান্য লোক রয়েছেন, তাঁদের আচরণ এই সমস্ত উক্তির বিরোধী। নির্বাচকরা দলগুলির এই সাবেকী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে খানিকটা সত্যি আছে মনে করে।

খুব কম সংখ্যক ভোটারাই নির্বাচনী ইস্তাহার পাঠ করে। রাজনৈতিক বক্তারা প্রায়ঃশই এই ইস্তাহার উদ্ধৃত করে বক্তৃতা দিয়ে থাকে। অধিক সংখ্যক ভোটার অসন্তুষ্ট হবে এমন কিছু নির্বাচনী ইস্তাহারে থাকলে বিরোধী দলের বক্তারাও প্রতি-পক্ষের নির্বাচনী ইস্তাহারের ঐ সমস্ত অংশ উল্লেখ করে বক্তৃতা দেন। প্রকৃতপক্ষে দলের প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী বক্তৃতার মধ্য দিয়ে নির্বাচনের উপযুক্ত ইস্তাহার তৈরী করে নেয়। তাঁরা সরাসরি কখনও পার্টির বিঘোষিত নীতির বিরোধিতা করেন না। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামত যেখানে যা বাদ দেওয়া প্রয়োজন তা উল্লেখ করেন না, এবং যেখানে তাঁদের ভাল লাগে তার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে পার্টি ইস্তাহারের ব্যাখ্যা করে যান। নির্বাচনের পর জনসাধারণ প্রেসিডেন্টের

ভাষণকে বিজয়ী দলের প্রতিশ্রুতি মনে করে, এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেসকে বুঝিয়ে বা ভয় দেখিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি পুরণে বাধ্য করার জন্য প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দলের কর্মসূচী নির্ধারনে জাতীয় সম্মেলনের স্থান তাই প্রেসিডেন্টের নীচে। প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজস্ব একটা কর্মসূচী স্থির করে নেন। জাতীয় সম্মেলনের সাধারণ কাজ হচ্ছে দুটি: প্রার্থী নির্বাচন করা এবং আনুষ্ঠানিক উৎসবের মধ্য দিয়ে দলীয় ঐক্যবিধান করা। চলতি প্রথায় প্রেসিডেন্ট ভাইস-প্রেসিডেন্টকে মনোনীত করেন এবং বিতর্কশ্রান্ত প্রতিনিধিরা বিশেষ তর্ক-বিতর্ক ছাড়াই সে মনোনয়োন মেনে নেন। জাতীয় সম্মেলন পরাজিত পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাধারণতঃ সেই গোষ্ঠি থেকেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত করে। প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হলে কিন্তু এতে দলের বিজয়ী অংশের অবস্থা পাল্টে যাবার আশঙ্কা থাকে। এই রীতির সমালোচকরা নিয়ত দাবী করে যে, প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত হলে নিজ যোগ্যতাবলেই নির্বাচিত হতে পারবে এরূপ ব্যক্তিকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত করার একটা পদ্ধতি থাকা উচিৎ। কিন্তু দলীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদটি ব্যবহৃত হওয়ায় স্বাধীন নির্বাচনের ভিত্তিতে সে পদ পূরণ করার পথে শক্তিশালী প্রতিবন্ধক রয়েছে।

প্রত্যেক পার্টিরই একটি ক'রে জাতীয় কমিটি থাকে। জাতীয় সম্মেলনগুলির অন্তবর্তী সময়ে তারা কাজ করে। জাতীয় সম্মেলনগুলি চার বৎসর অন্তর হয়ে থাকে। এই কমিটিগুলির বেশীর ভাগ কাজই অবশ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বৎসর হয়ে যায়। জাতীয় সম্মেলনের স্থান ও সময় তারা নির্ধারণ করে দেয়। এর পদাধিকারীর নির্বাচনী পুস্তক-পুস্তিকা তৈরী করে ও পার্টির বক্তাদের কাছে সে সব পাঠিয়ে দেয়। প্রেসিডেন্টের ও কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযানের জন্য তারা কিছু অর্থও সংগ্রহ করে।

প্রত্যেক রাজ্য, অঞ্চল এবং দ্বীপভূমি থেকে একজন করে পুরুষ ও মহিলা নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। রাজ্য প্রতিনিধিবর্গ বা রাজ্যের প্রাথমিক নির্বাচনগুলো এঁদের নির্বাচিত করে দেয়। এই কমিটির সভ্যদের বেশীর ভাগ কাজই তাদের নিজের রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সেখানে তারা রাজ্য কমিটিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করে। দলের মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী তাঁর নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার জন্য জাতীয় কমিটির সভাপতি মনোনীত করেন।

এই সভাপতি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে ব্যাপক নির্বাচনী অভিযানের পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। কিন্তু তিনি ছাড়াও কমিটিতে সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষের মত আরও গুরুত্বপূর্ণ সভ্য থাকেন। দলের কেন্দ্রীয় দপ্তরের অসংখ্য দলিল-পত্র ও লেখা পড়ার কাজ সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে থাকে, এবং নির্বাচনী প্রচারের বেশীর ভাগ অর্থই কোষাধ্যক্ষ সংগ্রহ করেন।

এই কমিটির অধীনে একদল গবেষক থাকে। তারা দলের প্রার্থী ও অন্যান্য

বক্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। প্রত্যেক জিলার অর্থনৈতিক, জাতিগত, ধর্মসংক্রান্ত ও রাজনৈতিক অবস্থা, কংগ্রেস প্রতিনিধিরা নির্বাচনে কে কত ভোট পেয়েছে, সবই তাদের নখদর্পণে থাকে। এ'ছাড়াও ভোট সংগ্রহ করার পক্ষে প্রয়োজনীয়, এবং যেগুলির উল্লেখ ভোটাররা অসন্তুষ্ট হতে পারে এমন যত সমস্ত তথ্য তারা সংগ্রহ করে আনে। কর্মব্যস্ত কংগ্রেস সভ্য ও সেনেটরদের নির্বাচনী বক্তৃতা বা কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত বিতর্কে পার্টি-পক্ষ সমর্থনের জন্য বক্তৃতা রচনা করে দেবার মত বিচক্ষণ লেখকও কমিটিতে থাকে।

কংগ্রেসের ভিতরে প্রত্যেক পার্টির আবার বিশেষ কমিটি থাকে। দলের কংগ্রেস সভ্যদের নির্বাচনে সাহায্য করার জন্য এই কমিটির নিজস্ব অর্থভাণ্ডারও থাকে। আর একটি কমিটি থাকে নির্বাচনী অভিযানে সেনেটরদের সহায়তা করার জন্য। যে সমস্ত অঞ্চলে নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, সেই সমস্ত অঞ্চলে এই সব কমিটিগুলি অর্থ ও বক্তা পাঠিয়ে দলীয় প্রার্থীকে সাহায্য করে থাকে।

প্রত্যেক রাজ্যে প্রত্যেক পার্টির একটি করে রাজ্য কমিটি থাকে। যে সমস্ত রাজ্যে পার্টিগুলির মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে সেখানে এই কমিটিগুলি অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। কমিটি সেখানে কাউন্টি-কমিটি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। নগর সহর এবং পরিশেষে নির্বাচনী ইউনিট পর্যন্ত তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে।

নির্বাচনী ইউনিটে কাজকর্মকে অনেক সময় "আহ্বানঘণ্টি বাজানর" কাজ বলা হয়ে থাকে। পার্টি সভ্যরা জনসাধারণের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের যথাসময়ে ভোটার হিসাবে নাম রেজেষ্ট্রী করে আসতে বলে। নির্বাচনের প্রার্থী সহরে এলে তারা জনসাধারণকে সভায় আসার জন্য আহ্বান জানায়, পরিশেষে নির্বাচনের দিনে তাদের ভোট দেবার জন্য অনুরোধ করে। নির্বাচনী এলাকার উপরোক্ত বিভিন্ন স্তরের কমিটিগুলোর বেশীর ভাগ কাজই হচ্ছে নির্বাচনী এলাকার কর্মিদের ভোট সংগ্রহের কাজে সহায়তা করার জন্য বক্তা প্রেরণ করা, নির্বাচনী পুস্তিকা সরবরাহ করা এবং বেতার ও টেলিভিশনের বন্দোবস্ত করার জন্য অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকা।

দেশের আয়তন ও ভোটারের সংখ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে জাতীয় নির্বাচনের জন্য ব্যয় অল্পই বলতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত মোট ব্যয়ের বেশীর ভাগ হিসাবে দেখা গেছে, ভোটার-প্রতি ব্যয় ২৫ সেণ্টের মত হবে, আর মোট ব্যয় হবে দুই থেকে তিন কোটি ডলারের মত। ১৯৪৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিক্যানরা যথাক্রমে ৭,৫০০,০০০ ডলার ও ১৩,০০০,০০০ ডলার ব্যয় করেছে ব'লে জানিয়েছে। দলের জাতীয় কমিটিগুলি নির্বাচনী প্রচারে ত্রিশ লক্ষ ডলারের বেশী খরচ করতে পারে না। কিন্তু রাজ্য ও আঞ্চলিক কমিটিগুলি নিজেরা নিজেদের অর্থ সংগ্রহ করে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান ও লোকজন নিজেদের অর্থ ও সময় ব্যয় করে তাদের মনোমত প্রার্থীর জন্য কাজ করে যায়। হ্যাচ আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের অসামরিক সরকারী কর্মচারীরা রাজনৈতিক প্রচারে অংশ গ্রহণ

করতে পারে না। কিন্তু নির্বাচনীতে সাধারণ নাগরিকরা কে কোথায় কত সময় ও অর্থ ব্যয় করছে তার হিসাব দিতে বাধ্য করার মত কোন উপায় এখনও উদ্ভাবিত হয় নি।

এক পার্টি অপর পার্টির বিপুল অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ করে থাকে, এবং প্রত্যেকটি পার্টিই তার সামর্থ্যের মানদণ্ডে নির্বাচনী ব্যয় সীমাবদ্ধ করে দেবার দাবী করে। কিন্তু অতীতের মত এখন ভোট কে'না সচরাচর ঘটে না, এবং টাকা খরচ করলেই যে নির্বাচনে জেতা যায় না বিভিন্ন নির্বাচনের ফলাফল থেকেই তা দেখা গেছে।

পার্টিগুলির সরকারী সাহায্য লাভের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে জনসাধারণ। মনে হয়, রাজনীতি যে সরকারের ন্যায়সঙ্গত আঙ্গিক এ'কথা স্বীকার করতে তারা কুণ্ঠিত। অনেকে রাজনৈতিক দল দু'টিকে দেড় বা দুই কোটী ডলার হিসাবে সরকারী সাহায্য বরাদ্দ করার প্রস্তাব করেছে। কিন্তু কংগ্রেসে এই রকম প্রস্তাব পেশ করার পূর্বে জনসাধারণের মন থেকে দলীয় রাজনীতি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণার মনোভাব ঝেড়ে ফেলতে হবে। এমন কি ওয়াশিংটনের আমল হতে আজ পর্যন্ত তারা দলীয় রাজনীতিকে কিছুটা অশোভন মনে করে। কংগ্রেসের কমিটিগুলি দলীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হয়, তাদের পদাধিকারীদেরও দলীয় ভিত্তিতে নিয়োজিত করা হয়, কিন্তু বিধানসংক্রান্ত বিষয়ে দলবিশেষের নামোল্লেখ করতে কংগ্রেস সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। পার্টিগুলিকে রাজনৈতিক পদ্ধতির ন্যায়সঙ্গত অংশ মনে করার পথে আর একটি প্রতিবন্ধক হচ্ছে—পার্টি পদ্ধতির বড় বড় পৃষ্ঠপোষকরা অনেকে তা পছন্দ করেন না। তাঁরা পার্টির জন্য অর্থ ব্যয় করতে রাজী কিন্তু পার্টিগুলিকে তাঁদের সাহায্যমুক্ত হতে দিতে চান না।

নভেম্বর মাসে নির্বাচনের তিন কোটি উৎসাহী সমর্থক থাকে। কিন্তু সে সমর্থকের অন্ততঃ এক বা দেড় কোটি সভ্যের কাছ থেকে জনপ্রতি এক ডলার করে সংগ্রহ করতে পারলে নির্বাচনী ব্যয় চলে যেতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, এরূপ অর্থ সংগ্রহের ব্যয় প্রচুর।

টেলিভিশনের আবির্ভাবের ফলে জাতীয় নির্বাচনের ব্যয়ের সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। জনসাধারণ টেলিভিশনের পর্দায় দলগুলির জাতীয় সম্মেলন ও নির্বাচনের সময় প্রধান প্রার্থীদের দেখতে চায়। এটা আশা করা যায় যে, নির্বাচনের সময় টেলিভিশনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দেখতে পাবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভোটার প্রতি ৪০ বা ৫০ সেণ্ট ব্যয় অত্যধিক মনে নাও হতে পারে।

নির্বাচনী সংগঠন যখন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং একটির পর একটি নির্বাচন যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত করতে পারে, তখনই তাকে নির্বাচনী যন্ত্র বলা হয়।

আমেরিকায় প্রতি দুই বৎসর অন্তর কংগ্রেসের নির্বাচন হয়, এবং রাজ্য নির্বাচন ও প্রাথমিক নির্বাচনী ত প্রায়ই এক বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে আমেরিকার নির্বাচনী যন্ত্রগুলি পরিপুষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছে। একমাত্র জাতীয় সম্মেলনগুলিই

প্রতি চার বৎসর অন্তর ঘুরে আসে। দলের জাতীয় কমিটীগুলি এই অন্তবর্তী সময়ে প্রায় চুপ-চাপ বসে থাকে, কিন্তু রাজ্য ও স্থানীয় অঞ্চলের নির্বাচনী যন্ত্রগুলি সব সময়েই কর্মব্যস্ত থাকে।

বহুসংখ্যক পেশাদার রাজনৈতিক কর্মী নিয়েই এই নির্বাচনী যন্ত্র গড়ে উঠে। রাজনীতির মধ্যে দিয়েই তারা জীবিকানির্বাহ করে। অবসর কালে কাজ-করা সখের রাজনীতিজ্ঞরা এদের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে তাই পাল্লা দিতে পারে না; তাদের সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাগুলি সেজন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এই সমস্ত পেশাদার রাজনীতিজ্ঞরা নিয়মিতভাবে কঠিন পরিশ্রম ক'রে সমস্ত সমাজের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে, শত্রুদের কূট কৌশলের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখে; কোন্ আইন প্রয়োগের ফলে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, আইনসঙ্গত ও বে-আইন সমস্ত বিষয়েরই সংবাদ রাখে; আইন সভার প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মচারীদের কি এবং কোন্টা কি বিষয় সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত করে থাকে। বিভিন্ন ভাবে এই সমস্ত কর্মীদের ইনাম দেওয়া হয়। অনেকের আত্মীয়স্বজনকে সরকারী বিভাগে কাজ দেওয়া হয়। অনেকে আবার নিজেরাও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকে। যে সমস্ত ব্যবসায়ী লাইসেন্স্ বা কণ্ট্রাক্ট অথবা হয়ত পুলিশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদের নিকট থেকেও তারা অর্থ গ্রহণ করতে পারে।

সবচেয়ে মজবুত নির্বাচনী যন্ত্রগুলি একজন উপরিস্থের তত্ত্বাবধানে থাকে। তিনি সাধারণতঃ কোন পদাধিকারী হন না। বস্তুতঃপক্ষে পদাধিকারীরা যে সমস্ত সূত্রে নিয়মিত কাজে আবদ্ধ থাকে, তিনি সে সমস্ত সূত্র নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে দৃঢ় নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে রাখেন এবং তার প্রতিদানে তিনি তাদের এমন নেতৃত্ব ও সহযোগিতা দিয়ে থাকেন যা'তে কাজে সাফল্য সম্বন্ধে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে।

কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক অনুগ্রহ প্রয়োজনীয় হ'লে উপরিস্থ সে সব দেখে থাকেন। তিনি জনসাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণ, বিদেশ-জাত ব্যক্তির ও নগণ্য অপরাধে অপরাধীদের বন্ধু। প্রায়ই দেখা যায়, উপরিস্থ নিজেই হয়ত কোন বিদেশীর ঔরসজাত সন্তান, নিজের সংগঠন শক্তি ও দরিদ্র জনতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ব'লে রাজনৈতিক যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বস্তীর সাধারণ মানুষ থেকে এতখানি উচ্চে উঠতে সমর্থ হয়েছেন। জর্জ প্লানকিট এই রকম একজন নামজাদা বিচক্ষণ রাজনীতিক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "আমার জেলাতে কোন লোক অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে দাতব্য সমিতিগুলি কিছু করার পূর্বে সে খবর আমি জেনে যাই, এবং আমার লোকজনই সর্বপ্রথম সেখানে গিয়ে হাজির হয়। এই ধরণের ব্যাপার দেখার জন্য আমার বিশেষ লোকজন রয়েছে।" এর ফলে দরিদ্র জনসাধারণ জর্জ প্লান্কিটকে পিতার মত শ্রদ্ধা করে, যখনই কোন অসুবিধা হয়, তাঁর কাছে ছুটে আসে, এবং নির্বাচনের দিনে তাঁকে ভুলে যায় না।

রাজনৈতিক উপরিস্থের কাজ হল বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা, সে দরিদ্র

গোক্ আর ধনীই হোক। এক হাতে তিনি বিপদগ্রস্ত সন্তানের জন্য ভুল পথে চলে আসা ভিনদেশী মায়ের উদ্বেগ নিরসনের চেষ্টা করেন, বা প্রসিদ্ধ দাতব্য সংস্থাগুলি যে বৃদ্ধ দম্পতিকে সাহায্যদানের "অনুপযুক্ত" মনে করেছে, তাদের কাছে কম্বল বা খাদ্য পাঠান, বা পার্টি সভ্যের পুত্রের জন্য পুলিশ বিভাগে একটি চাকরী করে দেন। একটা যে বিশেষ দয়াপরবশ বা নৈতিকতার মনোভাব থেকে তিনি এই সমস্ত কাজ করেন তা নয়। উপকৃত ব্যক্তিরা এজন্য তাঁর খুব অনুগত থাকে। তিনি যে প্রার্থীকে ভোট দিতে বলেন, তারা ও তাদের আত্মীয়স্বজনরা সবাই তাকে গিয়ে ভোট দিয়ে আসে। অপর হাতে তিনি ধনী ও তাদের বন্ধুশ্রেণী—কণ্ট্রাক্টর, নিষ্কাষণ কোম্পানী, জমিদার, শুঁড়িখানার মালিক এবং তদপেক্ষা নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন যে সমস্ত ব্যক্তির পুলিশের কড়াকড়ি একটু ক'মে গেলে সুবিধা হয়, তাদের সাহায্য করেন। এ সমস্ত সাহায্যের জন্য তিনি রাজ্যের রাজধানী বা সহরের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে খবর পাঠিয়ে দেন। তাঁরা তাঁর কথানুযায়ী কাজ করে, কারণ উপরিস্থের বন্ধুবান্ধব ও অনুগামীদের সমর্থনেই তাঁরা নির্বাচনে জয়লাভ করেন। উপরিস্থ তাঁর সমস্ত ধনী মক্কেলদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার অর্থ গ্রহণ করেন এবং সে অর্থ তাঁর কর্মী ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিলি করে দেন।

এই ধরণের নির্বাচনী যন্ত্র আজকাল অনেকটা অকেজো হয়ে পড়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা, স্থায়ী বসবাসেচ্ছু ভিনদেশী সম্পর্কিত আইন ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরীর ব্যবস্থা হওয়ায় এই "রবিনহুডী" রাজনীতি আর সুবিধা করতে পারছে না। দরিদ্রের সংখ্যা আজ বড় নেই, বড় বড় সহরে বিদেশাগত জনসাধারণকে আর তেমন হতাশ হয়ে ঘুরতে দেখা যায় না, তাদের কাছে গিয়ে রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেদের একমাত্র দরদী বলে পরিচয় দেবার আর সুযোগ পায় না। পার্টি কর্মীদের পোষণকল্পে চাকরী দেবার সুযোগও কমে গেছে। বহু সহরের পুলিশী ব্যবস্থা অবশ্য এখনও দুর্নীতিগ্রস্থ রয়েছে, এবং এটা প্রাচীন রাজনৈতিক যন্ত্রকে জিইয়ে রাখবার বিশেষ অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কিন্তু ১৯৫২ সালের নির্বাচনে দেখা গেছে, যে সমস্ত সহরে মন্দার দিনে ডেমোক্রেটিক দলের রাজনৈতিক যন্ত্রগুলি সম্প্রসারিত হয়েছে, সেখানেই প্রাচীন পুলিশী ব্যবস্থাগুলি শক্তিহীন হয়ে পড়েছে উভয় দলই সৌখিন রাজনৈতিক যন্ত্র গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারা উৎসাহী পার্টি সমর্থকদের আমন্ত্রণ জানায়, দলের সভা-সমিতি ও সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সুযোগ দেয়, একদিন তারা হয়ত পার্টি মনোনয়নও পেয়ে যেতে পারে। ১৯৫২ সালে আইজেনহাওয়ার ও ষ্টীভেনসন, উভয়েই অসংখ্য তরুণসহ বহু লোককে স্ব স্ব দলের প্রতি উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ এই সমস্ত সৌখিন সংস্থাগুলিই ভোট সংগ্রহের গোড়ার কাজে অধিকতর পরিমাণে ব্যবহৃত হবে, এবং তখন রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস একেবারে পাল্টে যাবে। অতীতে অসহায় দরিদ্র জনসাধারণকে বাস্তবপন্থী দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিজ্ঞরা সহৃদয়তায় আবদ্ধ করে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে জড় করে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করত।

কিন্তু অসহায় দরিদ্রের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এইভাবে ক্ষমতা লাভের সুবিধা বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৫২ সালে মনে হয় প্রেসিডেণ্ট প্রার্থীদ্বয়ই ছিল ক্ষমতার উৎস। পার্টির নির্বাচকগণ, মধ্যবিত্তশ্রেণী ও সখের রাজনৈতিক কর্মীদের অধিকতর সমর্থন লাভের কথা চিন্তা করেই তাঁদের প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছিল। কৃতজ্ঞতা বা পারিতোষিকের আশায় নয়, অন্তরের শ্রদ্ধা থেকেই তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। জনসাধারণের এই মনোভাব স্থায়ী হলে পূর্বতন রাজনৈতিক কলাকৌশলের অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

নির্বাচনের দিনে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকায় ১৩০,০০০টির মত নির্বাচনী এলাকা বা জেলা রয়েছে, এবং এদের প্রত্যেকটিতে ৩০০ থেকে ১০০০ ভোটার ভোট দিয়ে থাকে। সাধারণতঃ বিদ্যালয়, খালি দোকানঘর, দমকল ভবন বা থানায় ভোটকেন্দ্র করা হয়। স্ত্রীলোকরা ভোটের অধিকারী হওয়ার পর থেকে ভোটকেন্দ্রগুলি ১৯২০ সালের পূর্ব থেকে অনেক বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

নির্বাচন পরিচালনায় কর্মচারীরা প্রধান দলগুলির দ্বারা মনোনীত হয়ে থাকে এবং আইন অনুযায়ী সরকারী তহবিল থেকে তাদের বেতন দেওয়া হয়। তারা ভোটারদের নামের তালিকা মিলিয়ে দেখে, এবং প্রত্যেকটি ভোটার যাতে একখানা করে ভোট-পত্র পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখে। প্রতারণা বন্ধ করার জন্য তারা ভোটের বাক্স বা ভোটযন্ত্রের দিকে সজাগ দৃষ্টি দেয়, এবং ভোট দেওয়া শেষ হয়ে গেলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসে ভোট গণনা করে ও ভোটের ফলাফল ঘোষণা করে। উভয় পার্টির পক্ষ থেকে প্রতি ভোটকেন্দ্রে দু'জন ক'রে প্রতিনিধি থাকে। ভোটের ব্যাপারে কোন অসাধুতা দেখলে তারা তার প্রতিবাদ করে। এই সমস্ত প্রতিনিধির খরচ পার্টি থেকেই বহন করা হয়।

গোপনে ভোট দেওয়ার আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে বসেছে। রাজনৈতিক যন্ত্র বিভিন্ন সূত্রে ভোটার কিভাবে ভোট দিচ্ছে তা জানতে পারে, কিন্তু বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা এইভাবে ভোটের গতি অনুধাবন করা পছন্দ করে না।

"দীর্ঘ ভোট-পত্র" আমেরিকার ভোট ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি। রাজ্য, কাউণ্টি ও সহরে শাসন ব্যবস্থাগুলির বিভিন্ন প্রার্থীর একযোগে ৫০ থেকে ১০০টি নাম ভোটপত্রে চিহ্নিত করতে হলে সাধারণ নির্বাচকরা হতভম্ব হয়ে পড়বে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। পাঁচশত প্রার্থীর নামসহ বার ফুট লম্বা ভোট-পত্রের নজীরও এদেশে আছে। গভর্ণর ছাড়াও রাজ্যের ছয়জন সরকারী পদাধিকারী, কাউণ্টি-কমিশনার ও বিচারপতি, একজন কোষাধ্যক্ষ ও জেলার এটর্ণি, এবং আরও অন্যান্য কর্মচারীদের তাদের নির্বাচিত করতে হয়। মেয়র, অলডারম্যান, স্কুল বোর্ডের সভ্য, সহরে আদালতের বিচারপতি, এসেসার, ট্যাক্স্ কালেক্টর এবং আরও বহু কর্মচারীকে তাদের নির্বাচিত করতে হয়। কেবলমাত্র পেশাদার রাজনৈতিকের পক্ষেই কয়েকজনের চেয়ে বেশী প্রার্থীর পরিচয় জানা সম্ভব হতে পারে।

প্রার্থী মনোনয়নের সময় তাঁদের হাত থাকে বলেই তাঁরা এঁদের জানতে পারেন। সাধারণ ভোটাররা প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর, মেয়র এবং অন্যান্য বয়েকজনকে ভোট দিয়ে অন্যান্য সবাইকে হয় অন্ধভাবে, নয়তো ভোট না দিয়েই চলে আসে।

প্রাচীনপন্থী রাজনীতিকরা দীর্ঘ ভোট-পত্রই পছন্দ করে। কারণ এতে তারা জনসাধারণের কাছে জবাব-দিহি হবার হাত থেকে মুক্তি পায়। এই পদ্ধতিতে তারা জনসাধারণ বুঝতে না-পারে বা মনে রাখতে না-পারে, এমন সব ছোটখাট পদে অনুগতদের মনোনয়ন দিতে পারে। জনসাধারণ তাদের অন্ধভাবে নির্বাচিত করে, অথচ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে রাজনৈতিক নেতাদের এই সমস্ত বন্ধু বান্ধবদের—জনসাধারণ যাদের সজ্ঞানে নির্বাচিত করেছে, সেই সব মেয়র ও গভর্ণরদের নির্দেশমত চলতে হয় না।

এতে রাজ্য ও স্থানীয় নির্বাচনগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাচন থেকে অপেক্ষাকৃত কম গণতন্ত্রসম্মত হয়ে থাকে। জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণ প্রেসিডেন্ট ও সঙ্গে ভাইস-প্রেসিডেন্ট, এবং কংগ্রেস সভ্যদের নির্বাচিত করে। সেনেট-সভার তিনটি নির্বাচনের মধ্যেও দুটি জাতীয় ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এই সমস্ত পদাধিকারীদের সবাই জানে এবং তাঁদের কাজকর্মের জন্য তাঁদের দায়ী করা চলে।

দীর্ঘ ভোট-পত্রের ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নাতি-দীর্ঘ ভোট-পত্র চালু করার আন্দোলন সুরু হয়। নাতি-দীর্ঘ ভোট-পত্রে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন উড্রো উইলসন। অধিকাংশ সরকারী পদাধিকারী যাতে নির্বাচনের পরিবর্তে নিয়োগের ভিত্তিতে নিযুক্ত হয় সেটাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মত গভর্ণর ও মেয়ররা যাতে কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারেন এবং স্ব স্ব শাসন বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হয়ে উঠতে পারেন, তাই ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু রাজনীতিকরা দীর্ঘ ভোট-পত্র পছন্দ করে। রাজ্যশাসনের প্রতি যেখানে জনসাধারণের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নি, সেখানে এই আন্দোলন তেমন সাফল্য অর্জন করে নি। সহরে কিন্তু এই আন্দোলন অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯১০ সালে যতটা পারতেন মেয়র আজ তদপেক্ষা অনেক বেশী চাকরী দিয়ে থাকেন, এবং বহু সহরে সরকারের কমিশান বা সিটি-ম্যানেজার ধরণের শাসন-ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ভোটাররা নাতি-দীর্ঘ ভোট-পত্র ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে।

দীর্ঘ ভোট-পত্রে ভোটার সংখ্যা, বিশেষতঃ নিরপেক্ষ ভোটারের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সম্ভব। ভোটপত্রে একগাদা অজানা নাম থেকে বেছে ভোট দিতে হলে ভোটাররা বিরক্ত হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে দলের প্রতি আনুগত্যশীল ভোটারদের কাছে এটা অবশ্য স্বাভাবিক মনে হতে পারে।

প্রায় বারো আনা ভোটার বংশপরম্পরায় এক একটি দলকে ভোট দিয়ে আসছে। বিরোধী পক্ষের কোন প্রার্থী তাদের ভোট পেতে পারে এ কথা তারা ভাবতেও পারে না। সুতরাং যে রাজ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠে, শতকরা ২৫

ভোটের দ্বারাই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে দলীয় প্রতিযোগিতা নেই, সেখানে দলের আভ্যান্তরীণ উপদলগুলি তাদের মতামত প্রার্থি মনোনয়নের মধ্যে দিয়ে নির্বাচনে নিজেদের প্রধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এই নিরপেক্ষ নির্বাচকমণ্ডলীই জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এনে দেয়, এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতীর স্বার্থকতা এই অনিশ্চয়তার উপরই নির্ভর করে। আমেরিকায় মনে হয় এই অনিশ্চয়তা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে।

জাতীয় সংকটের সময় রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নেতা—প্রেসিডেণ্ট বা পদ-প্রার্থীর মধ্য দিয়েই জনসাধারণকে তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুগামী করে তুলতে চায়। নির্বাচনের দিন তিনিই ভোটারদের সুখশয্যা ছেড়ে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। প্রতিপক্ষ দল ও নেতার সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দিতা করে তাকেই নিরপেক্ষ ভোটারদের হৃদয় জয় করতে হয়।

নির্বাচন অভিষেক অনুষ্ঠানের পর মনোমত আইন প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসে তাঁর দল বল পরিচালিত করে থাকেন। সংকটের সময় প্রেসিডেণ্ট তাঁর স্থান ইতিহাসের পাতায় উল্লিখিত হবার উপযুক্ত করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। নির্বাচনী প্রচারের প্রতিশ্রুতি ও পরবর্ত্তিকালে উদ্ভাবিত কল্যানের পরিকল্পনার মধ্যে তিনি প্রায়ই শেষোক্ত বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন, এবং সেই প্রচেষ্টা স্বার্থক করে তোলার জন্য তাঁকে কংগ্রেসের স্বদলীয় ও বিপক্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অবশ্যই আলাপ আলোচনা করতে হয়। নিজেদের দলের মধ্যেও অনেকে প্রেসিডেণ্টকে হিংসা করতে পারে, এবং বিরোধী নেতৃবৃন্দ তাঁর এই প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হতে পারে, আবার নাও পারে। তারা তাদের সম্প্রতি পরাজিত প্রেসিডেণ্ট পদ প্রার্থীর নেতৃত্বেও পরিচালিত হতে পারে।

সঙ্কটের সময় নেতৃত্ব দেওয়াই পার্টিগুলির সব চেয়ে বড় কাজ। অন্ততঃ আমে-রিকার তরুণ জনসমাজের কাছে এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। প্রবীণ আমেরিকানরা ১৯২০ সালের মত স্বতন্ত্র সময়ের স্মৃতি বহন করে থাকতে পারেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধান্তে সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল এবং কোন নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হবার পর মত কারও মনের অবস্থা ছিল না।

দেখা গেছে, আমেরিকার জনসাধারণ নিজেদের যখন সঙ্কটাপন্ন মনে করে না, তখন তাদের মধ্যে কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতার আবির্ভাব হয় না। কিন্তু যখন দুর্দ্দিনের কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, তখন দেখা যায়, কি এক অনি-র্বচনীয় উপায়ে তাদের মধ্যে লিঙ্কন ও উইলসনের মত মানুষের অবির্ভাব হয়েছে।

অনেক গবেষক কিন্তু একে তেমন অত্যাশ্চর্য কিছু মনে করে না। তারা বলে বিশ্বব্যাপী সংবাদ সংগ্রহের কেন্দ্র হচ্ছে হোয়াইট হাউস। দেশ-বিদেশের অবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এবং সবরকম গোপন ও প্রকাশিত খবরাখবর প্রেসিডেণ্টের হাতের কাছে থাকে, এবং তিনি যেভাবে চান সেভাবেই তাদের সংক্ষেপে তাঁর কাছে পরিবেশিত হতে পারে। একাধিক প্রেসিডেণ্টের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিশ্ব পরিস্থিতি

সম্বন্ধে স্তূপীকৃত তথ্যের মুখোমুখী হয়ে সাধারণ মানুষ থেকে একরকম রাতারাতিই তাঁরা অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনেতা হয়ে গেছেন। দেশের সামনে যখন কোন সংকট থাকে না, তখন প্রেসিডেণ্ট আলস্যে কালাতিপাত করতে পারেন, এবং তাঁর মধ্যে কোন প্রতিভার পরিচয় না পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু সংকটের দিনে সেই মানুষই কুঁড়েমি ঝেড়ে ফেলে সেই সংগৃহীত তথ্যের জোরে এমন মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করতে পারেন নিকটতম সুহৃদের কাছেও তা অভাবনীয় ব্যাপার মনে হয়।

সমকালীন অবস্থার তাগিদে পড়ে প্রধান দলগুলিকে তাদের সংগঠন ও কার্য-ধারা রূপান্তরিত করতে হতে পারে। ১৯৩০ সাল থেকে দেশ সংকটের সম্মুখীন হয়ে আছে এবং মনে হয় আরও অনেক বৎসর ধরে এই অবস্থা চলবে। এই অবস্থায় হোয়াইট হাউস এবং কংগ্রেসে জনপ্রিয় নেতৃত্ব ও বিজ্ঞ রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। বেতার ও টেলিভিশানের ফলে রাজনীতিতে আজকে আর পূর্বের মত গোপন ব্যবস্থা বা পারিতোষিকের দুর্নিতি চালানো সম্ভব নয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় জনসাধারণকে আজ আর পূর্বের মত স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-দের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হয় না। আজকে তারা মনোরম গৃহে বাস করে এবং ভোটের সময় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের রাজনৈতিক দাবী দাওয়ার কথা বলে। নির্বাচনে অর্থের ক্ষমতা আজও রয়েছে, এবং উভয় দলের উপরই অর্থপ্রদানকারীদের প্রভাব দেখা যায়। নির্বাচকরা আজ দুর্নীতি সম্বন্ধে সজাগ হয়েছে, সম্ভবতঃ পূর্বা-পেক্ষা অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে।

পার্টিগুলি তাদের সমর্থকদের একেবারে গোড়া থেকে নতুনভাবে সংগঠিত করার চিন্তা করছে। রাজনীতি-বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক নেতাদের নতুনভাবে দলীয় সং-গঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে যাতে করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা করেই দলের কার্যসুচি গৃহীত হতে পারে। তাঁদের অভিমত হচ্ছে, গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলিতে পার্টি সভ্যরা অধিকতর পরিমানে যোগ-দান করবে এবং তাতে আরও বেশী সংখ্যক প্রার্থী রাজ্যসভা ও কংগ্রেসের সভ্য নির্বাচিত হয়ে পার্টির পক্ষে ভোট দিতে পারবে। কতকগুলো পার্টিনেতা যে নতুন-ভাবে চিন্তা আরম্ভ করেছে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাচীন পার্টিপদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

॥ শাসন ব্যবস্থা ॥

শাসনতন্ত্রে আছে, "শাসন ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের হাতেই ন্যস্ত থাকবে।" এই "শাসন ক্ষমতা" কি, তা নিয়ে প্রায়ই প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট না থাকায়, এবং সে ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত হওয়াতে, প্রচলিত নীতির সঙ্গে খাপ খায় না, এমন সব ব্যাপারই প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতাধীন হয়ে উঠে।

শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভোটের ক্ষমতা কংগ্রেসের এক-ষষ্ঠাংশ উপস্থিত সভ্যের ক্ষমতাব সমান। কংগ্রেসে তাঁর সামর্থিত প্রস্তাব সামান্যতম ব্যবধানেও গৃহীত হয়, কিন্তু তাঁর অসমর্থিত প্রস্তাব গ্রহণ করাতে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়।

পররাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়ে কিছু করতে হলে প্রেসিডেন্টকেই তার উদ্যোক্তা হ'তে হয়। প্রেসিডেট আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন এমন কোন সন্ধি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সেনেট সভা বাধা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু সেনেট সভার সদস্যরা এ বিষয়ে নিজে থেকেও কিছু করতে পারে না, বা রাষ্ট্রপতিকেও কিছু করার জন্য বাধ্য করতে পারে না। অনুরূপভাবে, শাসন নির্বাহ বিভাগ ও সৈন্য বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ কবার ক্ষমতাও প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত। অবশ্য এ নিযুক্তি সেনেট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কোন সেনেটার কোন প্রার্থীর বিষয়ে প্রেসিডেন্টের নিকট সুপারিশ করলে সেই সেনেটারের সমর্থন তাঁর কাছে কতখানি প্রয়োজন তা বিবেচনা না কবে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। "সেনেটি ভদ্রতা" ব'লে একটি প্রথাও সেখানে প্রচলিত আছে। এই প্রথানুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন সেনেটার প্রার্থী বিশেষকে তিনি "ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন না" ব'লে তাঁর রাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রিয় সরকারী পদলাভে বাধা দিতে পারেন; তাঁর সহযোগী সেনেটাবই তখন ভদ্রতা-ব'শে সেই প্রার্থীর নিযুক্তি মঞ্জুর করেন না। কিন্তু এই প্রথা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন থাকার সময় রিপাবলিক্যানদের দক্ষিণাঞ্চলে তাঁদের দলের প্রার্থীকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সবকাবী পদে নিযুক্ত কবতে কোন অসুবিধা হয় না, ডেমোক্র্যাটদেব সময় উত্তবাঞ্চলের রিপাবলিক্যান অধ্যুষিত বাজ্যগুলিতে দলীয় লোক নিয়োগে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তকদেব উপর বৃটিশ দার্শনিক জন লকের প্রভাব খুব বেশী কাজ করেছিল। জন লক তাঁর "ি ট্রিটিসেস্ অফ গবর্ণমেন্ট" নামক পুস্তকে "বিশেষ ক্ষমতা" বা ইংল্যাণ্ডের শাসন কর্তৃপক্ষেব ক্ষমতার বিচিত্র ও যুক্তিবর্হিভূত প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "আমাদের বিজ্ঞতম ও সর্বোত্তম রাজন্যবর্গদের হাতে সব সময়েই সবচেয়ে বেশী বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কারণ··· জনসাধাবণের কল্যাণ ছাড়া তাঁদের আর কোন লক্ষ্য ছিল না। রাজন্যবর্গের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল, এবং তাই তাঁরা আইন ছাড়া বা আইন বহির্ভূত কাজ করলেও জনসাধারণ তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করত। তারা মনে করত, জনসাধারণের কল্যাণই সব আইনের মূল ভিত্তি, এবং সেটাই যখন তাঁদের মুল উদ্দেশ্য, তখন তাঁরা ইচ্ছা করে আইনবিরোধী কাজ কবেন না।"

লক্ আরও বলেছিলেন যে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হল চূড়ান্ত এবং "পবিত্র; সমাজ একবার যে ক্ষমতা অর্পণ করে আর সেটার পরিবর্তন করতে পারে না।" ইংল্যাণ্ডের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসও বহুলাংশে এই পরস্পর-বিরোধী সম্পর্কের দ্বারা নিরূপিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, বিশেষতঃ বেতার ও টেলিভিশানের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের অধিকতর নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকলে শাসন ক্ষমতাও ক্রমে অধিকতর পরিমাণে প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাবের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠে। কিন্তু আমাদের প্রারম্ভিক যুগেও প্রেসিডেন্ট কোন কোন ক্ষেত্রে "আইন ছাড়া বা আইনবিরুদ্ধ কাজও করেছেন।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৭৯৩ সালে ফ্রান্স বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন সেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন যে "ফ্রান্স যখন আক্রমণকারী তখন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মৈত্রী চুক্তি এ ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে না।" ম্যাডিসন এইজন্য ওয়াশিংটনকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ করার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন, এবং বলেছিলেন যে তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজার মত বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন।

আবার ১৮০৩ সালে প্রেসিডেন্ট জেফারসন নেপোলিয়ন থেকে লুইজিয়ানা রাজ্য কি'নে নিয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ এই সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং সেই সুযোগ তাড়াতাড়ি ব্যবহার করে না নিলে নেপোলিয়ন খুব সম্ভব সেই বিক্রীর প্রস্তাব বাতিল করে দিতেন। জেফারসন বেসরকারীভাবে এই কাজ "শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বহির্ভূত" বলে স্বীকারও করেছিলেন, কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন যে, কংগ্রেস তাঁর এই কাজ সমর্থন করে অর্থ মঞ্জুর করবে। কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন করেছিল; এবং এইভাবেই যুক্তরাষ্ট্র অদ্যাবধি মিসিসিপি উপত্যকার পশ্চিমার্ধ অধিকার করে আছে।

সম্ভবতঃ এব্রাহাম লিঙ্কনই অন্য যে কোন প্রেসিডেন্ট অপেক্ষা বিভিন্নভাবে শাসনতন্ত্র বহির্ভূত কাজ করেছেন। কিন্তু সেজন্য আমেরিকার জনসাধারণের স্মৃতিতে তাঁর প্রতি কোন বিরাগ নেই। লিঙ্কন হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার খর্ব করেছিলেন। তাঁর একাজ শাসনতন্ত্র বিরোধী ছিল। সমগ্র শাসনতন্ত্রটিকে রক্ষার জন্যই তিনি এই অধিকার খর্ব করার যৌক্তিকতা দেখিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "একটি আইন ছাড়া কি আর সবই অকর্মা হয়ে থাকবে? এবং সেই আইন লঙ্ঘন করার ভয়ে কি সরকারকে ভেঙ্গে খান খান হতে দেব? এমন কি সে ক্ষেত্রেও কি সরকারী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না? যেখানে একটি আইন রদ করে দিলে সরকার রক্ষা হয়, সেখানে সেই আইন বজায় রেখে কি সরকারকে বিপর্যস্ত হতে দেওয়া সঙ্গত হবে?"

১৯১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করার পূর্বে উড্রো উইলসন আমেরিকার সওদাগরী জাহাজগুলিকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করার জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন লাভের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা'তে ব্যর্থ হয়ে তিনি তাঁর প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করে কিছুসংখ্যক সশস্ত্র সৈন্যকে সওদাগরী জাহাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া

বা না-হওয়ার সিদ্ধান্ত কংগ্রেসই করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেশের যে কোন প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী প্রতিষ্ঠানই যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে পারে। এমন কি সানফ্রানসিস্কোর শিক্ষাবোর্ডও সেই রাজ্যের জনসাধারণের মনোভাবের সঙ্গে সায় মিলিয়ে ১৯০৬ সালে আদেশ দিয়েছিল, স্কুলগুলোতে জাপানী ছেলেমেয়েদের যেন শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসতে দেওয়া না হয়। এ নিয়ে তখন জাপানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট তাঁর কার্যনির্বাহক পরিষদের একজন সদস্যকে এইজন্য সানফ্রানসিস্কো পাঠিয়েছিলেন। শিক্ষাবোর্ডকে সেই আদেশ প্রত্যাহার করানোর ক্ষমতা তাঁর অবশ্য ছিল না, কিন্তু জাপানীদের প্রতি এই অবমাননা নিরসন করার চেষ্টা করে তিনি তাদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে দেশকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উড্রো উইলসন জার্মান ও বৃটেন কর্তৃক নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির অধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তার উল্লেখ করা যায়। তিনি এমনভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন যাতে আমেরিকার জনসাধারণের নিরপেক্ষ মনোভাব ক্রমশঃ জার্মান-বিরোধী মনোভাবে রূপান্তরিত হতে থাকে। যখন তিনি কংগ্রেসকে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য আহ্বান করেছিলেন, তখন যুদ্ধ ঘোষণা না করে কংগ্রেসের উপায়ন্তর ছিল না। অপর পক্ষে ১৮১২ সালে কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছিল। কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিকের ধারণা, ১৮১২ সালে প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্টকে প্রায়শঃই যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্ন নিরূপণ করতে হয়। তখন তিনি কংগ্রেস বা জনসাধারণের মতামতের জন্য বসে থাকেন না। পার্ল হারবারের ঘটনার পূর্বে প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট বহুক্ষেত্রে হিটলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। বিলম্ব করলে সে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ত সম্ভব হ'ত না। তিনি গ্রীনল্যাণ্ড সৈকতে জার্মান ফাঁড়ি অধিকার করে নিয়েছিলেন এবং আইসল্যাণ্ড রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানও বার্লিন অবরোধ এবং কমিউনিষ্টদের দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের ক্ষেত্রে অনুরূপ জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। জাপানী, ইটালী ও নাৎসী আক্রমণকারীদের জন্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। বার্লিন ও কোরিয়া থেকেও অনুরূপভাবে স্বাধীন জগতের উপর হামলা সুরু হয়েছিল। যদি বার্লিন ও কোরিয়া থেকে অবিলম্বে সোভিয়েট প্রয়াসের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া না হত, তাহলে সমস্ত পৃথিবী আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে এসে পড়ত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন আপন ক্ষমতাবলে ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে সেই সমস্ত আপৎমূলক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা আর কারও ছিল না।

কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের থাকলেও

প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন কংগ্রেস অর্থ মঞ্জুর না করে সেই নীতি বানচাল করে দিতে পারে। অতীতে প্রেসিডেণ্টরা যেমন প্রধান সেনাপতি হিসাবে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী বিদেশে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানও অনুরূপভাবে য়ুরোপে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত "উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থার" প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে জোরদার করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এ'রকম ক্ষমতা আছে কিনা তা নিয়ে কংগ্রেসে সেদিন ব্যাপক বিতর্ক উঠেছিল এবং তাঁর কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থ-বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে তাঁর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই সংঘাতের প্রকৃতি যতটা ছিল বিধিগত তার চেয়েও বেশী ছিল রাজনৈতিক।

শাসন কর্তৃপক্ষ ও বিধান প্রণেতাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই এবং রাজনৈতিক সুবিধার জন্য জটিল সংঘাত, এই দুইয়ে মিলে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রীর দলের সমর্থকরা প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করে থাকেন, কারণ কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যদি প্রধানমন্ত্রীর পরাজয় হয়, তবে তিনিও তাঁর দল ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়েন। কিন্তু কংগ্রেসের রীতি অনুযায়ী, হোয়াইট হাউসের অর্থাৎ প্রেসিডেণ্টের তরফের প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় দলের মধ্যে ভাঙ্গন এনে দেয়। কেউ প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সায় দেয়, আবার কেউ তার বিরোধিতা করে, অন্যেরা আবার পার্টির স্বার্থে প্রেসিডেণ্টের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট দিয়ে শাসনতন্ত্র পাঠ করে। এখানে ঠিক ঠিক কিভাবে কাজ হয়ে যায় সেটা বোঝার উপায় নেই। প্রেসিডেণ্ট যদি বিচক্ষণতার সঙ্গে বন্ধু সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে এমন কি তিনি বিরোধী দলের সভ্যদেরও অনুরক্ত করে তুলতে পারেন। কেবল বন্ধুত্বের জোরেও তিনি অনেকের ভোট পেতে পারেন। দেওয়ার মত কেন্দ্রীয় সরকারের অধিক সংখ্যক চাকরী প্রেসিডেণ্টের হাতে থাকলে তিনি সেগুলিতে তাঁর প্রতিপক্ষের প্রার্থী নিয়োগ করে তাঁদের বশীভূত করতে পারেন। দেখা গেছে, যে কংগ্রেস সভ্য আদর্শের বশবর্তী হয়ে প্রেসিডেণ্টের পক্ষে থাকেন, তাঁর চেয়েও তাঁর বিরোধী সভ্যের অনুরোধে বেশী চাকরী হয়ে থাকে। বাঁকা অঙুলে ঘি উঠে বেশী। তাই বলা হয়ে থাকে,—নতুন নতুন হোয়াইট হাউসে এসে প্রেসিডেণ্ট মাত্রেরই মধুযামিনী চলে। এই সময়ে তাঁর হাতে দেবার মত বহু চাকরী থাকে। তিনি চাকরী দিয়ে তখন শত্রুদের সন্তুষ্ট রাখতে পারেন। কিন্তু চাকরী ফুরিয়ে এলে কংগ্রেস ও হোয়াইট হাউসের মধ্যে আবার সেই চিরন্তনী সংঘাত সুরু হয়। তখন থেকে প্রেসিডেণ্টকে জনসাধারণের সমর্থন ও তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধুর্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট তাঁর "ঘরোয়া কথায়" বেতারকে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছিলেন। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসের সঙ্গে বহু প্রচণ্ড লড়াইতেও তিনি তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী কাজ করতে পেরেছিলেন, তার কারণ, কংগ্রেসের প্রতিপক্ষীয় সদস্যরা তাঁর অনুগত জনসাধারণকে ভয় করত।

অপর দিকে প্রেসিডেন্ট যদি তাঁর নিজের দলের কোন কংগ্রেস সভ্য বা সেনেটারকে দল থেকে বহিষ্কৃত করার চেষ্টা করেন, তাহলে জনসাধারণ তাঁদের পক্ষ নেয়। ১৯৩৮ সালে রুজভেল্ট তাঁর বিরোধী কয়েকজন ডেমোক্র্যাট যাতে পুনরায় নির্বাচিত হতে না পারেন সে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত করেছিল। নির্বাচনের সময় প্রেসিডেন্ট গোপনে দলের অভ্যন্তরে তাঁর কোন শত্রুর বিরোধিতা করলেও দলের সংহতি নষ্ট করেন না। তবে তিনি সময় সময় বিশেষ গোপনতা সহকারে দলের অভ্যন্তরে তাঁর কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নিজ প্রভাব প্রয়োগ করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট কাউকে বহিষ্কৃত করিতে চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে যে সর্বজনীন প্রতিবাদ উঠে, আমেরিকার দ্বি-দলীয় রাজনীতির বিশিষ্ট ধরার প্রতি সহজাত অনুরক্তি থেকেই তার উৎপত্তি।

এখানকার মন্ত্রণা পরিষদ ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রসম্মত প্রতিষ্ঠান নয়। এখানে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা কংগ্রেসের সভ্য নন, এবং প্রতিনিধি সভায় তাঁদের হাজির হতে হয় না বা জবাবদিহি করতে হয় না। প্রেসিডেন্ট বহু জটিল বিবেচনার পর তাঁর পরিষদের সভ্যদের নিজেই বাছাই করে নেন, কাজের যোগ্যতা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় বিচার করেই তিনি তাঁদের গ্রহণ করেন। বিভিন্ন রাজ্য বা অঞ্চল থেকে এঁদের নেওয়া হয় যাতে করে ভোটের সুবিধা হয়। প্রভাবশালী ধর্মগোষ্ঠী ও অর্থ-নৈতিক গোষ্ঠী থেকেও এঁদের নেওয়া হয়। দক্ষিণের ডেমোক্র্যাটদের পূর্ণ প্রভাবাধীন অঞ্চল বা মেইন ও ভারমণ্ট রাজ্যের মত রিপাবলিক্যান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি থেকে কদাচিৎ মন্ত্রণা সভার সভ্য মনোনীত হয়। দল বিশেষের শক্ত ঘাঁটি হওয়ায় প্রেসি-ডেন্টরা তাঁদের রাজনৈতিক সম্পদগুলি অযথা এ সমস্ত অঞ্চলে ব্যয় করতে চান না।

মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ থাকে, তারা সবাই প্রেসি-ডেন্টের নির্দেশে চলে। প্রেসিডেন্টের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাধীন কোন কর্তব্য সম্পাদনে অস্বীকার করার জন্য তিনি মন্ত্রণা পরিষদের যে কোন সভ্যকে বরখাস্ত করে দিতে পারেন। প্রথমে পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ বিভাগকে প্রেসিডেন্টের অধীনে রাখার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই দুটি বিভাগের মধ্য দিয়ে তাঁর শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কার্যকরী হত। অর্থসচিবকে তাঁর কার্যের জন্য জবাবদিহি করতে হোত কংগ্রেসের কাছে, কারণ কংগ্রেসের প্রদত্ত ক্ষমতার বলেই তাঁকে কর্তব্য নির্বাহ করতে হত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন ধীরে ধীরে মন্ত্রণা পরিষদকে প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আনার কাজ সুরু করেন। আজ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সাধারণভাবে বিভিন্ন বিভাগের উপর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আর কেউ প্রশ্ন করে না, অপরপক্ষে কংগ্রেস তার নিজস্ব ক্ষমতা বলে নতুন দায়িত্ব সৃষ্টি করতে পারে, এবং সে দায়িত্ব মন্ত্রণা পরিষদের কোন সদস্য বা সদস্যমণ্ডলীর প্রধানের উপর সরাসরি ন্যস্ত করতে পারে। এইরকম দায়িত্ব-সম্পাদনরত সদস্য বা কর্মকর্তাকে প্রেসিডেন্ট কতটুকু নির্দেশ দিতে পারেন বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, সে প্রশ্নের আজও সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয় নি।

কংগ্রেস অনেকগুলো জরুরী ও অনন্যনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে। ১৯৩৫

সালে বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্য এবং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথাক্রমে "ওয়ার্কস কংগ্রেস এড্‌মিনিস্ট্রেশান্" ও "ফেডারেল ট্রেড কমিশান্" নামক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের সম্পর্ক নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দিয়াছে। বিচারালয় এখনও এই সমস্ত সমস্যার সন্তোষজনক কোন সমাধান দিতে পারেনি।

গ্রামীন বৈদ্যুতিকীকরণ বিভাগের মত জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণ বিভাগের ন্যায় জাতীয় শাসন ব্যবস্থার কর্ণধার হিসাবে প্রেসিডেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা যেতে পাবে, কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রেসিডেণ্টের সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে আনার মত উপযুক্ত নয়। "সিভিল এভিয়েশান বোর্ড" এবং "ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশান"-কে যথাক্রমে উড়োজাহাজ ও বেতার পরিচালনার নিয়ম কাম্নন রচনার ভার দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের রচিত নিয়মকাম্নন মর্যাদালাভ করে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন বিষয় শ্রবণ ক'রে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করে এবং কংগ্রেসের গৃহীত আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাধারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগে প্রেসিডেণ্টের যেমন কর্তৃত্ব থাকে, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তেমন থাকে না।

তারপর, "ফেডারেল ট্রেড্ কমিশানের" মত আধাআধি বিচারক প্রতিষ্ঠান-গুলিও রয়েছে। তারা অভিযোগ শ্রবণ ক'রে ঘোষণা করে, অমুক অমুক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আইন লঙ্ঘন করছে, এবং তাদের কাজের ধারা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে, প্রেসিডেণ্টের মনোমত কাজ না করলেও প্রেসিডেণ্ট ফেডারেল ট্রেড্ কমিশানের কোন সদস্যকে বরখাস্ত করতে পারবেন না।

বিধান, শাসন ও বিচার বিভাগের এই অপূর্ব সংমিশ্রন সম্পর্কিত তত্ত্ব কোর্ট-গুলিকে মহা মুস্কিলে ফেলেছে। কিন্তু এসবের বাস্তব কার্যকরিতা বুঝতে বেশী বেগ পেতে হয় না। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকে এবং সেনেট সভার দ্বারা সে মনোনয়ন অনুমোদিত হয়। "ফেডারেল পাওয়ার কমিশানের" ঘটনা থেকে এর রাজনৈতিক দিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই কমিশান অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। কমিশন গ্যাস্ কোম্পানীগুলির আকাঙ্ক্ষা মত গ্যাসের দাম নির্ধারণ করতে অস্বীকার করলে কোম্পানীগুলি তা নিয়ে কংগ্রেসে আবেদন জানায়, এবং এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে কমিশানের নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত করা হয়। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সেই প্রস্তাব ভেটো প্রয়োগ করে দেন। প্রস্তাবটির উপর প্রেসিডেণ্টের ভেটো নাকচ করার মত সমর্থন কংগ্রেসে পাওয়া যায়নি। তারপর, যে সমস্ত কমিশনার গ্যাস্ কোম্পানীর বিরুদ্ধে ছিল, তাদের মধ্যে একজনের কর্মসময় ফুরিয়ে এলে তাকে পুনরায় সেই কর্মে নিযুক্ত করা হয়। তখন গ্যাস্ কোম্পানীগুলি সেনেটারদের ধরে এই কমিশানারের পুনর্বহাল নাকচ করে দেয়। পরিশেষে কোম্পানীগুলির একজন মনোনীত প্রার্থী এই পদে

নিযুক্ত হন ও সেনেট সভায় অনুমোদন লাভ করেন। এই নিযুক্তির ফলে কমিশানের সংখ্যাধিক্য সদস্যের মধ্যে পরিবর্তন আসে, এবং তারপর কমিশান গ্যাস্ কোম্পানীগুলির প্রস্তাব মেনে নেয় এবং এর পরে সমস্ত গোলমাল মিটে যায়। এই ঘটনার শিক্ষা হল, যে কোন কমিশান, এমন কি কোর্টকেও নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী চলতে হয়, আশু না হলেও তাদের সদস্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সেটা তাকে করতে হয়।

নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা সম্পন্ন শাসন-সংস্থা বা রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের নীচে রয়েছে রাজনীতি-নিরপেক্ষ অসামরিক কর্মচারী,— বেয়ারা থেকে বিচক্ষণ গবেষক ও পরিদর্শক। তারা সব সময় নিয়মমত কাজ করে যায়। এই সমস্ত কর্মচারীরা যদি কোন রাজনৈতিক দলকে পছন্দ করে, তবে আইন অনুযায়ী তারা তাদের স্ব স্ব রাজ্য-নির্বাচনে গিয়ে ভোট দিতে পারে, কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

রাজনীতি অনেকসময় কর্মচারীদের কাজকর্মে দক্ষতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত বিভাগও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের যদি কংগ্রেসের কর্তৃত্বের বাইরে রাখা হত, তহালে তাদের কর্মদক্ষতা অথবা কর্তব্যে অক্ষমতা নির্ধারিত হত দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে। এতে কর্মদক্ষতা আসতে পারে এ'ভাবে: অভিজ্ঞ পরিদর্শক ও বিচক্ষণ কর্মকর্তারা বহুল সংখ্যায় এতে থাকেন, তাঁরা সরকারী চাকুরিয়াদের কি'ভাবে চালাতে হয় সেটা জানেন। এছাড়া পাওয়া যায় উপরিস্থ কর্তাদের, তাঁরা অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের কাজ উপলব্ধি করেন। ১৯৪৭ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর এক আদেশ ব'লে বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভালভাবে পরিচালনা করার ও বিচক্ষণতা সহকারে কাজকর্ম করার জন্য অভিজ্ঞতা আদান প্রদান করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই আদেশ বলে বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে করে তারা বেসরকারী বীমা ও ব্যাঙ্কগুলির মত আধুনিক কায়দায় পরিচালনার ব্যবস্থা করে কাজের উন্নতি বিধান সম্ভব হয় এমনভাবে কাজের মান স্থাপন করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের অনেক জায়গায় সবিশেষ কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং এখানকার কার্যপদ্ধতি বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়শ:ই অনুসরণ করে না।

আর মন্দের মধ্যে, জনসাধারণকে পরিচালিত করার আধুনিক কায়দা কানুনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মত অনভিজ্ঞ পরিচালকরা সরকারী কর্মদক্ষতার পক্ষে ক্ষতিকর হত। যে সমস্ত কর্মচারীকে রাজনৈতিক কারণে বা সামরিক বিচক্ষণতার জন্য, বা পররাষ্ট্র বিষয়ক জ্ঞানের বিচারে নিযুক্ত করা হয়, পরিচালনার বিষয়ে তাঁদের কোন জ্ঞান না থাকতে পারে। বিরাট বিরাট বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলি কি ক'রে অল্প খরচে চালানো যায়, কেবল এই বিবেচনার বশবর্তী হয়ে প্রেসিডেন্ট মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যদের নিয়োগ করতে পারেন না।

সরকার পরিচালনার ব্যয় কমানোর দিকে কংগ্রেসের ঝোঁক থাকে, কিন্তু তা'তে

অসামরিক বিভাগের কর্মদক্ষতা কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অত্যন্ত কর্মকুশল বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে দেখা গিয়েছে যে আধুনিক কর্ম পরিচালন ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে কর্মচারীদের প্রতি ভদ্র আচরণ। পূর্বাহ্নে কফি পান করার জন্য কাজে একটু বিরতি দেওয়া, এই ধরণের ভদ্র আচরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কর্মচারীদের ভদ্রভাবে পরিচালিত করলে অল্প খরচে অধিক কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু এ'রকম ব্যবস্থায় আবার রাজনৈতিক মহলে সমালোচনা উঠতে পারে।

পরিচালকদের বিরুদ্ধে অলসতা ও অসততার অভিযোগ এনে রাজনীতিকরা ভোট সংগ্রহ করতে পারে। যেখানে যথাযথ হিসাব রাখা হয়েছে তা'তে দেখা গিয়েছে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার ফলে তার প্রায় এক লক্ষ ডলার ক্ষতি হয়েছে। অপরপক্ষে দেখা গেছে, কংগ্রেসের তরফ হ'তে যথাযথ ও সংভাবে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনার ফলে কোন্ অযোগ্য পরিচালকের দোষে অপব্যয় হচ্ছে তা নির্ণয় করে সেটা রোধ করা যায় ও বহু অর্থ বাঁচানো সম্ভব।

সরকারী কর্মচারী বিভাগে রাজনীতির প্রভাবজনিত অসুবিধা দূর করার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হল, কর্মপরিচালনার আধুনিক পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ খ্যাতনামা ব্যবসায়ীদের সাহায্য গ্রহণ করা। এঁরা যদি কংগ্রেসে তাঁদের প্রভাব জোরদার করার জন্য অধিকতরভাবে এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেন, তবে কর্মপরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস বন্ধ হতে পারে। তাঁরা কুশলী সরকারী পরিচালকদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন এবং তাঁদের অতি প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের আয়তন একটি বিরাট চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। কেবল বিপুল অর্থব্যয় হয় ব'লে নয়, অর্থের চেয়েও তার আমলাতান্ত্রিকতাই বেশী উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে উঠেছে। "আমলাতন্ত্র" শব্দটি এখানে ভীতিমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সহস্র সহস্র কর্মচারীসহ অসংখ্য সরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের অস্পষ্ট গোলোকধাঁধাঁর মধ্যে তারা ডুবে যায়, কংগ্রেস এমন কি প্রেসিডেন্টের কাছেও হয়ত সেটা অজানা থেকে যায়। এই সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কতকগুলো সন্দেহও উঠে, এবং দেখা গেছে, সে সমস্ত সন্দেহ সব সময় অমূলকও হয় না। তারা মনে করে, জরুরী প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত অনেক বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পরও স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে থেকে যায়। কেউ হয়ত তাদের খোঁজও রাখে না, আর সেজন্য সেগুলির অস্তিত্বও লোপ হয় না।

জনসাধারণের আর একটি ধারণাও অধিকতর যথার্থ ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। ধারণাটি হোল, বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এমনভাবে তাদের কাজ সম্প্রসারিত করেছে যে, শেষ পর্যন্ত তারা তাদের কাজের এক্তিয়ার ছাড়িয়ে গিয়েছে। সময় সময় প্রতিষ্ঠান বিশেষকে মনে হয় যেন ভুলে ভিন্ন বিভাগে কাজ করছে, কারণ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মত কাজ সেখানে হয় না।

সাম্প্রতিক কালের সমস্ত প্রেসিডেন্টই শাসন বিভাগকে অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ ও

বিচক্ষণ করে তোলার জন্য পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রেসিডেন্ট হুভার বিক্ষিপ্ত যুদ্ধফেরতদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্রিত করে "ভেটরন্স এ্যাড্‌ মিনিষ্ট্রেশান" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৩২ সালে গৃহীত পুনর্গঠন আইন ব'লে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁর ইচ্ছামত পুনর্গঠন করার ক্ষমতা লাভ করেন এই আইন অনুযায়ী পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমস্ত পরিকল্পনাই কংগ্রেসে পেশ করতে হয়েছিল। ঠিক ছিল, পেশ করার সময় থেকে ষাট দিনের মধ্যে যদিসেগুলো নাকচ করে দেওয়া না হয়, তবে তাদের গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

১৯৩২ সালে কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, এবং তারা হুভারের পরিকল্পনাগুলি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। তারা চেয়েছিল পরবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী প্রেসিডেন্ট হ'লে তিনি এই সমস্ত পুনর্গঠনের কাজ করেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৩৬ সালে পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিষয় অনুধাবন করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ১৯৩৭ সালে এই কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে তা'তে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সুপারিশ ছিল। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধবাদী দল থেকে এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উঠে। এ থেকে অনেক কাট-ছাঁট দিয়ে ১৯৩৯ সালে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং তার মধ্যে দিয়ে প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু কিছু সংস্কার সাধন করতে সমর্থ হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বাজেট দপ্তরকে প্রেসিডেন্টের কার্যনির্বাহক দপ্তরের আয়ত্তাধীনে আনেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি গৃহ ও জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্রিত ক'রে "জাতীয় গৃহ নির্মাণ বিভাগ" ও "যুদ্ধ জাহাজ বিভাগ" সৃষ্টি করেন, এবং তার যুদ্ধজনিত জরুরী ক্ষমতা বলে অন্যান্য বিভাগেরও সংস্কারসাধন করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান একটি পুনর্গঠন আইন ব'লে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুভারের নেতৃত্বাধীনে একটি দ্বি-দলীয় কমিশান বসান। হুভার কমিশান সমস্ত বিষয় অনুধাবন করে যে সুপারিশ করে তা'তে হিসাব করে দেখান হয় যে, প্রতি বৎসর সরকারের ৩,০০০,০০০,০০০ ডলার ব্যয় কমানো যেতে পারে। জনসাধারণ হুভার কমিশানের রিপোর্টকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এর ভিত্তিতে কংগ্রেসে প্রায় ২০টি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। কংগ্রেস সে সমস্ত পরিকল্পনার চারভাগের তিন ভাগ অনুমোদন করেছিল। ১৯৫৩ সালে কংগ্রেস পুনর্গঠন সংক্রান্ত আইনের মেয়াদ বাড়িয়ে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে এই ব্যাপারে ক্ষমতা দিয়েছিল।

এই সমস্ত সংস্কারের এমন কিছু একটা চোখ-ধাঁধান ফল হয়নি যাতে করে জনসাধারণ এদের খুব উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠে। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে শাসন বিভাগের বহু মারাত্মক ত্রুটি নিরসন হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মত কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের কংগ্রেসে এত প্রবল রাজনৈতিক সমর্থন রয়েছে যে, এর বিরুদ্ধে কোন প্রেসিডেন্টই তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারেন.নি।

মিতব্যয়িতা, বা জনসাধারণ যা চায় না, তা ক্রয় না-করা, এটা হোল কংগ্রেসের এক্তিয়ারে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট টাইট' বাজেট পেশ করে, এবং বাজেটে জনসাধারণের অনভিপ্রেত বিষয় না রেখে অথবা অল্প রেখে কংগ্রেসের সেই সুনাম লাভের পথ বন্ধ করে দিতে পারেন। অপর দিকে বিভাগীয় কর্মকুশলতা, অর্থাৎ কিনা নিম্নতম ব্যয়ে সবচেয়ে বেশী কাজের ব্যবস্থা করা প্রেসিডেণ্টের কর্তব্য। অপরদিকে কৃপণতা করে এবং কোন বিশেষ মহলের তুষ্টির জন্য অপচয়শীল বরাদ্দ করে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে কতকটা বেকায়দায় ফেলতে পারে। কিন্তু তাহলেও মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রেসিডেণ্ট হুভার ও তাঁর পরবর্তী প্রেসিডেণ্টরা সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভাগগুলির সুসংগঠন ও আধুনিক পরিচালনার দিক দিয়ে অনেকখানি উন্নতি বিধান করতে পেরেছেন।

॥ কংগ্রেস ॥

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সঙ্গে পার্লামেণ্টের প্রধান পার্থক্য হল যে, কর্মকর্তারা এর অন্তর্ভুক্ত নন। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে যেমন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রি-পরিষদের সভ্যরা পার্লামেণ্টের সদস্য থাকেন, এখানে প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর মন্ত্রণ পরিষদের সদস্যরা কংগ্রেসের সভ্য থাকেন না। একমাত্র অভিযুক্ত করার সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে উপরিস্থের মত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে না, এবং কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের প্রস্তাব গ্রহণ না করলে সরকার "সঙ্কটের" সম্মুখীন হয় না। এই অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট পদত্যাগ করেন না, বা কংগ্রেস ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন না।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারে কংগ্রেস একভাবে এবং প্রেসিডেণ্ট অপরভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেন। কংগ্রেস এবং প্রেসিডেণ্ট উভয়েই একে অপরের বিরুদ্ধে সরাসরি জনমতের দ্বারস্থ হতে পারেন এবং তাঁরা তা করেও থাকেন। এর ফলে কংগ্রেস ও শাসন নির্বাহীদের সংঘাত বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে থাকে,—খোলাখুলি সংগ্রাম থেকে সাময়িক সন্ধি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এমন কি কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্টের দলের সংখ্যাধিক্য থাকার সময়েও এ রকম সংঘাত দেখা দেয়। আর একটি জিনিষ পার্লামেণ্টে হতে পারে না, কিন্তু কংগ্রেসে হতে পারে। জনসাধারণ এক পক্ষ থেকে প্রেসিডেণ্ট এবং অপর পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক সভ্য নির্বাচিত করতে পারে। এই অবস্থায় দেশের আইন প্রণয়ন বিভাগ ও শাসন নির্বাহ বিভাগ স্বতঃই পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠে।

আমেরিকার কংগ্রেস তাই পার্লামেণ্ট অপেক্ষা অনেক বেশী দায়িত্বহীন। কারণ এতে প্রেসিডেণ্টের দলের সদস্যরা প্রেসিডেণ্টের পদত্যাগের কারণ না হয়েও সরকারের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে। এই দায়িত্বহীনতার ফলে কংগ্রেসে গরম গরম বক্তৃতার খুব অবকাশ পাওয়া যায়, কারণ ক্ষমতাসীন দলের কাছে দলীয় নিয়মানুবর্তিতা জীবন মরণের প্রশ্ন হয়ে উঠে না।

কলেজে অধ্যাপনা করার সময় উড্রো উইলসন শাসনতন্ত্রের সংশোধন করে কংগ্রেসকে পার্লামেন্টের অনুরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্বের অধিকারী করার কথা বলেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, যদি কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব পাশ না করলে কংগ্রেস সঙ্কটের সম্মুখীন হবে এমন ব্যবস্থা থাকে, তাহলে কংগ্রেস তার কর্তব্য আরও অধিকতর নিষ্ঠাসহকারে পালন করবে এবং কংগ্রেসের কার্যাবলী সম্পর্কে জনসাধারণ আরও বিচারবুদ্ধিশীল হয়ে উঠবে। উইলসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তিনি স্থির করেছিলেন, কংগ্রেস থেকে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তিনি সঙ্কট সৃষ্টি করবেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রণা পরিষদের সমস্ত সদস্যকে নিয়েই তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করতে পারতেন। এর ফলে, তদানীন্তন আইন অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের কোন উত্তরাধিকারী থাকত না এবং কংগ্রেসকে নতুন শাসন নির্বাহী পরিষদের ব্যবস্থা করতে হত। কিন্তু তখন যুদ্ধ এসে পড়েছিল, এবং এতদিনকার স্থায়ী ব্যবস্থা পাল্টে দেবার মত ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন নি। কংগ্রেসকে পার্লামেন্টের মত গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের নিকট থেকেও তেমন কোন দাবী ওঠেনি।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতির ফলে সেনেটসভাও প্রতিনিধি সভার মত সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্যান্য দেশে যেখানে নিম্ন-পরিষদ শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানে নিম্ন-পরিষদের মধ্যে সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রাস করার প্রবণতা দেখা যায়। উচ্চতর পরিষদ সেখানে অনেকটা প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞদের বিতর্কসভায় পরিণত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংল্যাণ্ডের লর্ড সভা আজ আর নিম্ন-পরিষদের গৃহীত কোন প্রস্তাব বাতিল করে দিতে পারে না। কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তারা তা'কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কালক্ষেপ করতে পারে, কিন্তু নাকচ করে দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কমন্স সভা সর্বেসর্বা। আমেরিকায় কিন্তু সেনেট-সভা প্রতিনিধি সভার মতই ক্ষমতাবান, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী।

দ্বি পরিষদী বিধান সভা আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনে দৃঢ় মূল হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক যুগেও রাজ্যগুলিতে দুইটি পরিষদ ছিল। একমাত্র নেব্রাস্কা ছাড়া অন্য সমস্ত রাজ্যগুলিতে আজ দুইটি পরিষদ আছে। আমেরিকা যে এক-পরিষদী কংগ্রেসের কথা চিন্তা করে না তার প্রধান কারণ, আমেরিকা আজও ছোট বড় বিভিন্ন রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্র হয়ে আছে। দ্বি-পরিষদী কংগ্রেস ছাড়া এই সমস্ত ছোট বড় রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত রাখার সন্তোষজনক অন্য কোন প্রস্তাব এখনও আসেনি।

কোন প্রস্তাব আইন হিসাবে গৃহীত হতে হলে দুইটি পরিষদেই তাকে গ্রহণ করতে হয়। আইন পাশ করানোর ক্ষেত্রে এই বিলম্বের জন্য কিন্তু জরুরী অবস্থার সময়ে কোন অসুবিধা হয় না। তখন জনসাধারণ সম্মিলিত ভাবে প্রেসিডেন্টের নেতৃত্ব মেনে চলার পক্ষপাতী থাকে। কিন্তু সাধারণ সময়ে সাধারণ আইন গ্রহণ করার সময় কংগ্রেস ধীরে সুস্থে আইন পাশ করে, এ-পরিষদে ও-পরিষদে আলোচনা ও বিতর্ক চলে, এবং বিরোধী পক্ষের তা'তে সুবিধা হয়। বিতর্কমূলক

আইনগুলি যে সহজে পাশ হয় না এ'জন্য আমেরিকানদের মনে কোন ক্ষোভ নেই। কথায় বলে, এক মাথা থেকে দু মাথার বুদ্ধি বেশী।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন করে সেনেট সভার সদস্য নির্বাচনের অধিকার রাজ্য-আইন-পরিষদের হাত থেকে এখন জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবুও সেনেট-সভা ও প্রতিনিধি-সভার গঠন ও মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেনেটাররা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে থাকেন। কংগ্রেসের সভ্যরা প্রায়শঃই সেনেট-সভার সদস্য হয়ে থাকেন। কিন্তু অদ্যাবধি খুব কম সংখ্যক প্রাক্তন সেনেটারই কংগ্রেসের সদস্য হবার চেষ্টা করেছেন। সেনেট সভ্যদের সম্মান বেশী। সমস্ত রাজ্য মিলে তাঁরা মাত্র ৯৬ জন। কিন্তু কংগ্রেস সভ্য থাকে ৪৩৫ জন। সেনেট সভার পদের খুব নাম, তা নিয়ে খুব হাঁক ডাক হয়। ভাল মন্দ দু'ভাবেই তাকে ব্যবহার করা যায়।

প্রেসিডেন্টের সম্পাদিত চুক্তি ও তৎকর্তৃক প্রদত্ত চাকুরী সেনেটারদের অনুমোদন সাপেক্ষ। এইজন্য অনেক সেনেট সভ্য পররাষ্ট্র ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই সমস্ত বিষয়ে নামজাদা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন।

সেনেট ও প্রতিনিধি সভার অর্ধেকের বেশী সভ্য হচ্ছেন আইন-ব্যবসায়ী। কোন আইনজীবি ব্যক্তি কংগ্রেসে সদস্য থাকার পর পরবর্তী নির্বাচনে যদি নির্বাচিত হতে না পারেন, তবে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর আইন-ব্যবসায়ে ফিরে যেতে পারেন। এতে তাঁর জীবিকা উপার্জনের আরও সুবিধা হয়। তাছাড়া, কংগ্রেসের সদস্য থাকার সময়েও আইন ব্যবসায়ে অংশীদারী চালিয়ে যাবার বিরুদ্ধে কোন আইনগত বাধা নেই। সেখানে তিনি আইন প্রণয়ন ব্যাপারে উৎসাহী লোকজনের কাছ থেকে রিটেনার ফি, অর্থাৎ ব্যবহারজীবীকে নিযুক্ত রাখার জন্য প্রদত্ত দক্ষিণা গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে, নির্বাচিত না-হয়েও তিনি আর্থিক অসুবিধায় পড়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। কিন্তু সরকারী চাকুরীয়া বা শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এইরকম ব্যবস্থা মহা অপরাধ বলে গণ্য হয়।

কোন স্কুলের একটি ছেলে নাকি একদা বলেছিল, "আমাদের সরকার আইনজ্ঞদের সরকার, মানুষের নয়।" কথাটিতে একটু অতিরঞ্জন থাকলেও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমাদের কংগ্রেসে অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী বা সাংবাদিকদের চিন্তাধারার চেয়ে আইনজ্ঞদের প্রভাবই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

কংগ্রেস ও প্রেসিডেন্ট পদ, প্রধানতঃ এই দু'টির মধ্যে দিয়েই এখানে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি দেশের শাসনক্ষমতা পরিচালনা করে ও রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য লড়াই করে। প্রেসিডেন্ট পদটি ব্যক্তিবিশেষের হওয়াতে তিনি কতকগুলি সুনিশ্চিত ভিত্তিতে বিজয়ী দলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। পুনর্বার নির্বাচিত হবার বা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবার আশা সুনিশ্চিতভাবে প্রেসিডেন্টের নীতি

নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাজ করে। অপর পক্ষে কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের দলের মধ্যে বরাবরই এমন দু'চারজন লোক থাকেন যাঁরা একভাবে না একভাবে প্রেসিডেন্টের নীতির বিরোধিতা করেন। দলে আবার এমন অনেক লোকও থাকেন যাঁরা মনে করেন যে, আঞ্চলিক স্বার্থ সংরক্ষণের আনুকূল্য করার উপরই কংগ্রেসে তাঁদের পুনর্নির্বাচন নির্ভর করছে। অনেকক্ষেত্রে এ বিষয়টি দলের সামগ্রিক নীতির বিরোধীও হয়ে থাকে। সেজন্য কংগ্রেসের ভোট নেওয়ার সময়ে প্রায়শঃই সরকারী দলে মতনৈক্য দেখা যায়, এবং এভাবেই প্রেসিডেন্টের নিজ দলই বিরোধী দলে পরিণত হয়।

প্রতি দুবছর অন্তর কংগ্রেসের দায়িত্বের অবসান ঘটে, এবং তাও হয় সাধারণ ও কতকটা অনির্দিষ্টভাবে।

কংগ্রেসের অদলীয় সভ্যরা সামগ্রিকভাবে পরবর্তী নির্বাচনের উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে না যদিও তাদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় দলগুলির জয়-পরাজয় তাদের উপরই নির্ভর করে। এই অবস্থা শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতিকূল। অনেক কংগ্রেস সভ্য এমন অঞ্চল হতে নির্বাচিত হয়ে আসেন যেখানে তাঁদের সাফল্য সুনিশ্চিত। সে অঞ্চলের জনসাধারণ চটে যায় এমন কোন কাজ না করলে সেই অঞ্চল হতে তাঁদের পুনর্নির্বাচন আটকায় না, এবং জনসাধারণ প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায় এমন কাজও তাঁরা সচরাচর করেন না।

তাঁরা জাতীয় দল থেকে এরূপ স্বাধীনভাবেই কংগ্রেসে থাকেন; তবে দলের সঙ্গে সম্পর্ক এই—তাঁদের সমর্থিত দল পরাজিত হলে কংগ্রেসে নিযুক্ত কমিটিগুলির চেয়ারম্যান পদ থেকে তাঁদের বঞ্চিত হতে হয়। অপরিবর্তিত স্থানীয় পরিস্থিতির দরুণ যে সমস্ত রাজ্য ও জেলা হতে কংগ্রেসের সদস্যরা পুনর্নির্বাচিত হন, সেই সমস্ত অঞ্চলের সর্বশক্তিমান জনসাধারণের প্রতি কংগ্রেসের দায়িত্ব এই রকম বোধাতীত ভাবে প্রতিপালিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে যখন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, এবং জনসাধারণ যে সমস্ত বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাদের সঙ্গে যদি কোন নির্বাচনপ্রার্থীর কাজকর্ম জড়িত বলে তারা মনে করে, কেবল তখনই সার্বভৌম জনসাধারণ নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করে।

যে রাজ্যে কোন্ দল জয়লাভ করবে তার নিশ্চয়তা থাকে না, সেখানে নিরপেক্ষ নির্বাচকরাই সাধারণতঃ নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করে থাকে। আবার রাজ্যে একটি দল জোরদার থাকলে নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরা সে দলেও যোগদান করতে পারে এবং দলের প্রাথমিক সংগঠনগুলিতে তারা বেশ প্রভাবশীল হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু লোয়েল মেলেট তাঁর "হ্যাণ্ডবুক অব পলিটিকস"-এ যথার্থই বলেছেন যে, নিরপেক্ষ নির্বাচকরা প্রায়ই তাদের ভোট বিভক্ত করে তাদের ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে। নিরপেক্ষ ভোটাররা প্রায়শঃই "উদারনৈতিক" হয়ে থাকে এবং মনে করে যে প্রাথমিক নির্বাচনে যোগ্যতম প্রার্থীকে ভোট দেওয়া তাদের কর্তব্য। অনেক সময় তারা কোন বিষয়ে প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে কোন একটা ছোট-খাট দল

উপদলকে বহু ভোট দিয়ে থাকে। অথচ, এই ভোটগুলি তারা কোন প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে দিলে তাদের সমর্থিত প্রার্থীর অনুকূলে নির্বাচনের মীমাংসা হতে পারে।

ঝুনো রাজনীতিজ্ঞরা সময় সময় জনসাধারণের এই আচরণের সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়ে না। যে পার্টি নিরপেক্ষ ভোটারদের ভয় করে, সে পার্টি দলের প্রার্থী জয়লাভ করতে পারে না, কিন্তু যারা যোগ্যতম ব্যক্তিকে ভোট দিতে চায়, তাদের ভোট তিনি টানতে পারেন। এইভাবে নিরপেক্ষ ভোটারদের ভয়ে ভীত দলগুলি বুদ্ধির খেলায় তাদের পরাস্ত করে।

মেলেট বলেছেন, নির্বাচনের ফলাফল যখন নিরপেক্ষ ভোটারদের হাতে থাকে তখন সেই ক্ষমতা সর্বাধিক কার্যকরী করে তোলার জন্য তাদের আগে ঠিক করে নিতে হবে যে, বর্তমান সদস্যকে তারা পছন্দ করে কি না, অবশ্য এ ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে তিনি আবার নির্বাচনে অবতীর্ণ হবেন। তারা যদি তাঁকে পছন্দ করে, তাহলে সবাই একজোট হয়ে তাঁকে বহাল রাখতে পারে, এবং সে ক্ষেত্রে সদস্যটি প্রবীণত্ব ও প্রভাবের দিক দিয়ে আরও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠবেন। কিন্তু তাকে পছন্দ না হলে তারা সমবেতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অন্য প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী "সেবা মানুষ" হোন্ বা না হোন্, তাঁরই নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। কিন্তু নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে তিনি যতই অবাঞ্ছিত হোন্ না কেন, বহাল সদস্যকে পরাস্ত করে নির্বাচিত হতে পারলে কংগ্রেসে তিনি 'নবাগত সদস্য' হিসাবে প্রবেশ করেন এবং কর্মক্ষেত্রে তিনি নবীন হিসাবে পরিগণিত হন।

সার্বভৌম জনসাধারণের সঙ্গে তাদের প্রতিনিধিদের এই রকম সম্পর্ক অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে শিথিল মনে হতে পারে। কিন্তু, আমেরিকার স্বাধীনতার সনদে বিঘোষিত গণতান্ত্রিক আদর্শের মূলনীতির সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। শাসিতের সম্মতি হতেই সরকার তার ন্যায়সম্মত শাসনক্ষমতা লাভ করে,—এই হ'ল সেই মৌলিক আদর্শ। যে সমস্ত রাজ্য-কংগ্রেসের নির্বাচনী অঞ্চলে কেবল একটি দলই সব সময়ে জয়লাভ করে, সেখানে জনসাধারণ তাদের দলকে চোখ বুজেই সমর্থন করে থাকে। কিন্তু ইচ্ছা করলে তারা সে দলকে সমর্থন না-ও করতে পারে। তাছাড়া গণতান্ত্রিক সরকারের নিয়ম হচ্ছে, কেবল যারা ভোট দিতে পারে নি তারা নয়, যারা ভোট দিয়ে পরাজিত হয়েছে তাদেরও নির্বিবাদে বিজিত দলের শাসন মেনে চলতে হয়। অন্য যত ত্রুটি থাক না কেন, কংগ্রেসের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এর ফল পুরাপুরি পাওয়া যায়।

কার্যকাল অন্তে প্রেসিডেণ্ট যদি পুনর্বার নির্বাচিত হন এবং তাঁর পার্টি যদি পুনর্বার হোয়াইট হাউস দখল করতে পারেন, তাহলে তাতে কংগ্রেসে তাঁর দলের সভ্যদের খুব সুবিধা হয়। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠলে যে পক্ষ থেকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন, কংগ্রেসের নির্বাচনের ফলাফল তাদের অনুকূলে হবার

সম্ভাবনা থাকে। আমেরিকায় একে বলে প্রেসিডেণ্টের জামার খুঁট ধরে চলা। এই রীতি কংগ্রেস ও সেনেট সভ্যদের তাদেব দলপতির অনুগত রাখার পক্ষে সহায়ক হয়। তারা যদি প্রেসিডেণ্টকে খুব বেশী আঘাত করে, তাহলে তাদের নিজেদেরও ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা। দেখা গেছে হোয়াইট হাউস যাদের হাতে থাকে, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনেব অন্তর্বর্তীকালে নির্বাচনের সময় তাঁবা প্রায়ই হেরে যান।

যাঁরা প্রেসিডেণ্টকে সমর্থন করেন, তাঁদেব মধ্যে থেকেই সাধাবণতঃ কংগ্রেসে পার্টি নেতৃত্ব বাছাই করা হয়, কিন্তু কতকগুলো ক্ষমতাবান কমিটির চেয়ারম্যানকে আবার হোয়াট হাউসেব সম্পূর্ণ বিবোধী হয়ে উঠতেও দেখা গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৫৩ সালে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের শাসনেব সূচনাতেই 'হাউস ওয়েজ এণ্ড মিন্‌স্‌'-কমিটির চেয়ারম্যান কবেব পবিমাণ হ্রাসের পূবে বাজেটকে সুগম করার জন্য প্রেসিডেণ্টেব নীতির তীব্র বিরোধিতা কবেছিলেন।

পার্টির মধ্যে এই রকম বিশৃঙ্খলা দেখা গেলে পববর্তী নির্বাচনে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে অনেকে পার্টি সংগঠনকে আরও সুদৃঢ় করে তোলার প্রস্তাব করেছে। সময় সময় উভয় পরিষদের পার্টি-মাতব্বর বা নীতিনির্ধারক সভাগুলো পার্টি-প্রতিনিধিদের পার্টির নির্দেশ মেনে চলার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু, যাদের কোনরূপ প্রতিশ্রুতিতে অবাদ্ধ হওয়ার বা দলের নির্দেশানুযায়ী ভোট দেবাব পথে বাধা আছে, তাদের পার্টির অনুশাসন হতে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। পার্টি শৃঙ্খলা বজায় রাখার পথে মস্ত অসুবিধা হল,—শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের শাস্তি দেবাব কোন ব্যবস্থা নেই। আসল অসুবিধা হচ্ছে, দলেব জাতীয় নেতৃবৃন্দ কোন লোককে তাঁর নিজের রাজ্যের মধ্যে দল থেকে ছাড়িয়ে দিতে পাবেন না। যতক্ষণ না জনসাধারণ তাঁকে পুনর্বাব নির্বাচিত করছে, ততক্ষণ তিনি নিজেকে ডেমোক্র্যাট বলে পরিচয় দিয়ে রিপাবলিক্যানদের ভোট দিলেও কেউ তাঁকে আটকাতে পারে না। পার্টি তাঁকে কমিটি থেকে বরখাস্ত করে দিতে পারে। ১৯৫৩ সালে রিপাব্লিকানবা সেনেটাব মোর্সকে কমিটি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন।

মোটমাট এই শৃঙ্খলাহীনতা পার্লামেণ্টারী ক্ষমতা ও দায়িত্ববর্জিত কংগ্রেসের দ্বি-দলীয় পদ্ধতিরই যুক্তিসিদ্ধ পরিণতি।

প্রেসিডেণ্টের প্রতিপক্ষ দল সাধারণতঃ (কিন্তু সব সময়ে নয়) কংগ্রেসের উভয় পরিষদেই সংখ্যালঘু থাকে। প্রতিপক্ষের কাজ বিরোধিতা করা,—এ'কথা শুধু আংশিক সত্য। অস্পষ্টার্থ প্রশ্নগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এবং শাসনতন্ত্রের সন্দেহ-জনক রীতিগুলোকে পরিপূর্ণভাবে অনুসন্ধান করে দেখা বিরোধী দলের কর্তব্য। কিন্তু সংখ্যালঘু দলের অভ্যন্তরে মতানৈক্য এবং প্রেসিডেণ্ট ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে মতবিরোধের ফলে বিরোধী দলের মধ্যে জটিলতা এসে পড়ে। প্রায় প্রত্যেক প্রশ্নে প্রত্যেকটি পার্টিরই কিছু সংখ্যক সভ্য আপন আপন দলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে

থাকে। প্রায়শই সংখ্যালঘু দলের একান্ত অনুগত সভ্যদের মধ্যে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়: "আমরা প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করব, না তাঁর দলের বিরোধিতা করব?"

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রিপাবলিক্যানদের সাধারণ নীতি ছিল প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করা। কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট অসুবিধায় পড়লে বহু রিপাবলিক্যান দক্ষিণাঞ্চলের ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করেছিল। এই সমস্ত ডেমোক্র্যাটরা দলের অভ্যন্তরে থেকে প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করত। এই নীতির ফলে রিপাবলিক্যানরা বহুদিন যাবৎ নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে নি, কারণ জনসাধারণ কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট দল অপেক্ষা প্রেসিডেন্টের প্রতিই বেশী অনুরক্ত ছিল। পরিশেষে শাসনতন্ত্রের বিরোধী সমালোচনা ভোটারদের মনে রেখাপাত করতে সমর্থ হলে পর তারা সাফল্য লাভ করতে পেরেছিল।

কংগ্রেসে বিরোধী-পক্ষ সংখ্যাধিক থাকলে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের সংঘাত তীব্র রূপ ধারণ করে, কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কয়েকজন "বাতুল দলভুক্ত" ছাড়া কোন রাজনীতিবিদই প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সংঘাতকে এমন স্তরে টেনে তুলতে চাইবে না যাতে জাতির নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হয়। আইনতঃ বিরোধী কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের অর্থ মঞ্জুরীর দাবীতে কাটছাঁট করতে পারে, এবং বিরোধী সদস্য-নিয়ন্ত্রিত সেনেট প্রেসিডেন্টের মনোনীত মন্ত্রণা পরিষদকেও অনুমোদন না করতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের বিচক্ষণ সদস্যরা চরম বিরুদ্ধ কলাকৌশলকে কল্যাণকর রাজনীতি বলে মনে করে না। ফলে প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে সংঘাত কখনও সর্বাত্মক হয়ে উঠে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, অশীতিতম কংগ্রেসে মিঃ ট্রুম্যান কংগ্রেসে রিপাবলিক্যান দলের বিজ্ঞ নেতা সেনেটার ভ্যাণ্ডেনবার্গের সহায়তায় মার্শাল পরিকল্পনা অনুমোদন করতে পেরেছিলেন। ভ্যাণ্ডেনবার্গ তাঁর দলকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে লাভ হবে অতি সামান্য, কিন্তু ক্ষতি হবে প্রচুর। এই পরিকল্পনা যদি তখন পাশ না হত এবং ১৯৪৮ সালের নির্বাচনে ইতালিতে যদি কমিউনিষ্টরা জয়লাভ করত, তাহলে ইতালির সেই বিপর্যয়ের দায়িত্ব এসে পড়ত মার্শাল পরিকল্পনা বাতিলের প্রয়াসে অংশগ্রহণকারী বিরোধী সদস্যদের উপর। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তখন রিপাবলিক্যান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের সঙ্গে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্টের যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল তা কোনক্রমেই তুচ্ছ নয়। প্রেসিডেন্ট একে একে জনসাধারণের সমর্থন আছে এমন সব ব্যবস্থা অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসে প্রস্তাব আনতে থাকেন। এমন কি কংগ্রেস ডেমোক্র্যাটদের করায়ত্ত থাকাকালেও যা হয়ত পাশ করান যেত না সেই রকম প্রস্তাবও তিনি কংগ্রেসে পেশ করেন। রিপাবলিক্যানরা বেশ কিছুসংখ্যক ডেমোক্র্যাটদেরও সহায়তাপুষ্ট হয়ে তাঁর প্রত্যেকটি প্রস্তাব নাকচ করে দিতে থাকে, এবং ট্রুম্যানও তাঁর নির্বাচনী নোটবুকে এক একটি ক'রে সমস্ত টু'কে রাখেন। এইভাবে রিপাবলিক্যানরা "ট্রুম্যানের

নীতিতে বাধা সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে নি, এবং তিনি নির্বাচনে জয়লাভও করেছেন।

অপরপক্ষে ১৯৩২ সালে প্রেসিডেণ্ট হুভার কংগ্রেসের বিরোধিতার সম্মুখীন হলে ডেমোক্র্যাটরা তাঁর মন্দা-নিবারণী শেষ প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিতে পেরেছিল, এবং সমস্ত দোষ তাঁর উপর চাপাতেও সমর্থ হয়েছিল। প্রায়শঃই এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে যে, যে প্রেসিডেণ্টের পার্টি মধ্যবর্তী সময়ের নির্বাচনে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব হারায়, সেই প্রেসিডেণ্ট দুই বৎসর পরে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে থাকেন।

প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেসের বিবাদ এবং দু'ই দলের অনবরত সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সরকারকে কিছু করতে দেখে অনেকে আশ্চর্য হতে পারে। রাজনৈতিক দিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্যই এখানে বিরোধের ধারা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ঐক্য বজায় রেখে চলার মতও বহু বিষয় রয়ে গেছে। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে, উভয় দলের মধ্যেই রক্ষণশীল ও উদারতন্ত্রী আছে। প্রেসিডেণ্ট প্রায় সব সময়েই বিরোধী দল থেকে কিছু সমর্থন পেয়ে থাকেন। আমেরিকান রাজনীতির এই সমস্ত বিষয় যুক্তিসিদ্ধ নাও মনে হতে পারে, কিন্তু এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পারস্পরিক বিরোধিতা সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। তার উপর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কংগ্রেসের বেশীর ভাগ নেতাই বাস্তব রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, বোঝাপড়া করে চলার কৌশলে বিচক্ষণতা লাভ করেই তাঁরা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন।

॥ কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি ॥

প্রতি দু'বৎসর অন্তর নতুন কংগ্রেস নির্বাচিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৫০ সালে বিরাশীতম এবং ১৯৫২ সালে তিরাশীতম কংগ্রেস নির্বাচিত হয়েছে। প্রতি নির্বাচনে প্রতিনিধিসভার সমস্ত সদস্য এবং সেনেট সভার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্বাচিত হয়।

অন্ততপক্ষে বৎসরে একবার কংগ্রেসকে সম্মিলিত হতে হয়। নিয়মিতভাবে ৩রা জানুয়ারীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। প্রথম অধিবেশনে নতুন কংগ্রেস নিজেকে "সংগঠিত" করে, সংখ্যাধিক্য দল থেকে কর্মচারী নির্বাচন করে, এবং কমিটির সভ্যপদ ও চেয়ারম্যান পদগুলির বিলি ব্যবস্থা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট সেনেট সভার সভাপতি হন, এবং কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক সমর্থক থাকলে তিনি ভোট দিয়ে সে সমস্যার সমাধান করেন। তাঁর অন্যান্য দায়িত্বগুলি সুনির্দিষ্ট নয়। হোয়াইট হাউস ভাইস-প্রেসিডেণ্টের মাধ্যমে সেনেটারদের সঙ্গে যোগসূত্র রাখতে পারে, অথবা তিনি মন্ত্রণা পরিষদেও বসতে পারেন এবং প্রেসিডেণ্টের পরবর্তী হিসাবে সমস্ত কিছু তদারক করে দেখতে

পারেন। যে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পূর্বে সেনেটার ছিলেন তিনি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রক্তন সহকর্মীদের উপর উল্লেখযোগ্য বকমেব প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন।

সেনেট সভা একজন অস্থায়ী সভাপতিও নির্বাচিত করে। ভাইস-প্রেসিডেণ্টের অনুপস্থিতিব সময় তিনি সেনেট সভাব সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্য নির্বাচিত কর্মচাবীব মধ্যে হচ্ছে, সেনেটেব কর্মসচিব এবং শান্তিবক্ষা কাবী সার্জেণ্ট। তাঁবা সেনেটের গতানুগতিক সমস্ত কাজকর্ম নির্বাহেব ব্যবস্থা কবেন। সেনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ দলগুলিবও সেক্রেটাবী থাকে। আমূল কোন বাজনৈতিক পরিবর্তন না হলে কমিটি সভাপতি পদসহ সেনেটেব সমস্ত সংগঠনই কংগ্রেসেব পর কংগ্রেসে প্রায় অপবিবর্তিত থেকে যায়। সেনেটে একজন যাজককেও নির্বাচিত করা হয়।

সংখ্যাগবিষ্ঠ দলেব নেতৃবৃন্দরা কংগ্রেসের কর্মকর্তা, কমিটিব চেয়াবম্যান এবং অধিকাংশ কমিঠি সদস্যকে মনোনীত করেন। রীতি অনুযায়ী সেনেট সভাব সভ্যরা এঁদের প্রথম ভোটে নির্বাচিত কবেন। দলেব পক্ষ থেকে কমিটিগুলিতে কা'রা প্রতিনিধিত্ব করবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তা ঠিক্ করে। এ বিষয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবীণত্বের বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোন কমিটির চেযাবম্যান নির্বাচিত হন সংখ্যাগবিষ্ঠ দলের কোন সদস্য, যিনি ঐ বিশেষ কমিটিতে সবচেয়ে বেশী সময় রয়েছেন। সেনেটেব কমিটিব কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই প্রাচীনত্বকে অগ্রাধিকার বলে গণ্য কবা হয়।

প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিনিধি সভাব স্পীকাব। প্রতিনিধি সভাব সদস্যরা তাঁকে নির্বাচিত কবেন। তিনি সব সময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে নির্বাচিত হন, প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্টেব মৃত্যু হলে প্রেসিডেণ্ট পদে তাঁরই সর্বাধিকাব। কংগ্রেসে এই পদটির ক্ষমতা সর্বাধিক।

এই পদেব নামটি ইংল্যাণ্ডেব উত্তরাধিকাবসূত্রে এলেও এব ধবন ইংল্যাণ্ডেব মত নয়। ইংল্যাণ্ডে কমন্স সভা পক্ষপাতশূন্য ও সভাব কার্য পরিচালনে সমক্ষ এ'রকম লোককেই স্পীকার হিসাবে নিযুক্ত করে। আমেবিকায় কংগ্রেসের স্পীকাব হন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেব একজন বিশিষ্ট নেতা। দলেব শৃঙ্খলা বক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্ব সমধিক। তিনি কনফাবেন্স কমিটিব সদস্যদেব নিয়োজিত কবেন। এই সমস্ত সদস্যবা সেনেট সভার অনুরূপ কমিটিব সভ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একই বিষয়েব উপব সেনেট ও প্রতিনিধি সভা-বচিত বিল দু'টিতে কোনরূপ বৈষম্য থাকলে তা' দূর কবাব চেষ্টা কবেন। তাঁদেব সম্মিলিত প্রয়াসে বিলটি যে রূপ পরিগ্রহ করে সচরাচর সে ভাবেই সেটা উভয় পবিষদে গৃহীত হয়ে থাকে। কতকগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেব সমাধান তা'ই স্পীকাব কর্তৃক এই কনফাবেন্সেব সদস্য মনোনয়নের উপর নির্ভর করে।

কেনা সভ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং কে বক্তৃতা দেবে, স্পীকার তাঁব ইচ্ছামত সেটা নির্ধারণ করতে পারেন। কোন একটি বিল দুইটি কমিটির মধ্যে কোন্‌টির এক্তিয়ারভুক্ত হওয়া উচিত এ' নিয়ে সংশয় দেখা দিলে, বিলটি কোথায় পাঠানো হবে

স্পীকার তা ঠিক্ করে দিতে পারেন, এর অর্থ বিলটিকে তিনি সেটার অনুকূল বা প্রতিকূল কমিটিতে পাঠাতে পারেন। স্পীকার আর একজনকে সভার কার্য-পরিচালনার ভার দিয়ে বিতর্কে যোগদান করতে পারেন।

১৯১০ সালের পূর্বে মেইনের টমাস বি রিড্ ও ইলিনয়ের "আঙ্কেল জো ক্যাননের" হাতে পড়ে স্পীকারের কাজ কতকগুলি কঠোর আইনে পরিণত হয়েছিল। স্পীকার ক্যানন সমস্ত স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সমস্ত সদস্যদের নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি রুলস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেছিলেন। এই কমিটির যে কোন বিল সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা ছিল। ১৯১০ সালে ডেমোক্র্যাট এবং পশ্চিমাঞ্চলের "বিদ্রোহী', রিপাবলিক্যান সদস্যরা সমবেত-ভাবে চেষ্টা ক'রে স্পীকারকে রুলস্ কমিটির বাইরে রাখতে সমর্থ হয়। পরে তাঁরা স্পীকারের স্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলির সদস্য নিয়োগের ক্ষমতাও কেড়ে নিয়েছিলেন।

সেনেটের মত প্রতিনিধি সভাতেও প্রধান প্রধান পদে কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কমিটির চেয়ারম্যান ও সর্বাধিক ক্ষমতাবান কমিটিগুলির সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবিণত্বের দাবীর খুব গুরুত্ব থাকে। এর ফলে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি সাধারণতঃ প্রাচীনরা অধিকার করে থাকেন। তাঁরা সাধারণতঃ স্ব স্ব দলের এক-চেটিয়া প্রভাবাধীন রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। যে সমস্ত অঞ্চল থেকে সারা জীবন ধ'রে তাঁরা বার বার নির্বাচিত হন।

এই সমস্ত কর্মকর্তা এবং কমিটি ছাড়াও সেনেট ও প্রতিনিধি সভায় দলীয় সংগঠন থাকে। আইন-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে তাঁদের অনেক ক্ষমতা।

সেনেট সভা ও প্রতিনিধি সভা, উভয় ক্ষেত্রে দলীয় সংগঠন থাকে রিপাবলি-ক্যানরা সে সংগঠনকে বলে—'কন্‌ফারেন্স, আর ডেমোক্র্যাটরা বলে—"ককাস্"। এই সমস্ত দলীয় সংগঠন যে কেবল সরকারী পদের জন্য দলের সদস্য মনোনয়ন করে তা নয়, দলের পরিষদীয় নেতা ও সহকারী নেতা বা "হুইপ্" নির্বাচনও করে। পরি-ষদীয় নেতার উপর সাধারণতঃ পরিষদে দলের পক্ষ থেকে কি'ভাবে বক্তব্য পেশ করা হবে, কখন কোন্ সদস্য বক্তৃতা দেবে, তাড়াতাড়ি', না ধীরে ধীরে কাজ চলবে, এ'সব ঠিক্ করার ভার থাকে। হুইপ্ সদস্যদের চাল-চলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে, এবং যখনই প্রয়োজন তাদের এনে ভোট দেবার বন্দোবস্ত করে।

প্রতিনিধিসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি থাকে। পরিষদীয় নেতা তার নেতৃত্ব করেন। দলের সমর্থিত প্রস্তাবের পক্ষ হয়ে এই কমিটি রুলস্ কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করে। সেনেটে উভয় দলের ষ্টিয়ারিং কমিটি থাকে, কিন্তু তাদের ক্ষমতা অল্প, কারণ সেনেট সভার সদস্যদের অত সহজে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্টি-সংগঠনগুলির প্রভাব সমধিক হলেও তারা বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বিশেষ করে যখন সেই বিষয়ে উভয় পার্টিতে মত-দ্বৈধতা থাকে ও সে সম্পর্কে তাদের সুনির্দিষ্ট নীতি বর্তমান। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পার্টি

সংগঠন স্ব স্ব দলের পক্ষে বিতর্ক পরিচালনা করে ও সদস্যদের পরিষদ কক্ষে হাজির রাখে। কিন্তু অনেক সময় এমন বিতর্কমূলক প্রশ্ন উঠে যাতে উভয় দলেই ভাঙ্গন দেখা দেয়। এই সংগঠনগুলি তখন দলের প্রবীণ ও অধিকতর প্রতিপত্তিশালী সদস্যদের মতামত যাতে গৃহীত হয় সেই চেষ্টা করে। উভয় দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের তখন বেসরকারীভাবে উভয় দলের নবীন সদস্যদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে কাজ করতে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এভাবেই ট্রুম্যানের সময় উভয় দলের রক্ষণশীল সদস্যদের অনেক সময় একযোগে প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করতে দেখা গেছে।

ওয়াশিংটন পরিভ্রমণ করতে গিয়ে অনেক বিদেশী পর্যটক গ্যালারি থেকে অধিবেশনকালে সেনেট ও প্রতিনিধি সভার দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। সাধারণতঃ কোন সদস্য বক্তৃতা দেওয়ার সময় দেখা যায়, অধিকাংশ আসনগুলিই খালি আছে, এবং উপস্থিত সদস্যরাও হয় একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, নতুবা কিছু পড়ছেন। মাত্র কিছুসংখ্যক সদস্য সেই বক্তৃতা শোনেন, এবং বক্তাকে প্রায়ই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; কেহ কেহ তাঁকে সমর্থন করার জন্য এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তৃতার বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যেই এই সব প্রশ্ন করা হয়। তার পর ভোট গ্রহণ অথবা 'কোরাম' আছে কিনা নির্ণয় করার জন্য সদস্যদের হাজিরা নেওয়া হয়। বিভিন্ন অফিস ঘরসহ ক্যাপিটল ভবনের সর্বত্র ঘণ্টা বেজে উঠে, সদস্যরা হাজিরা দেবার জন্য যে যেখানে থাকে ছুটে এসে জড়ো হয়। তার পর যে যার কাজে চলে যায় ও পুনর্বার গতানুগতিকভাবে সভার কাজ আরম্ভ হয়।

বেশীর ভাগ সেনেটর ও কংগ্রেস সদস্য দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেন। উৎসাহী নির্বাচকদের প্রশ্নে প্রশ্নে তাঁরা ব্যাতিব্যস্ত হয়ে উঠেন। এই রকম প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে থাকলে যে কোন শান্তিপ্রিয় মানুষের অল্প সময়ের মধ্যেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। পরিষদ কক্ষের অভ্যন্তরে কাজকর্ম দেখে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি যথাযথভাবে বোঝা যায় না। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে, এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক সেখানে হচ্ছে না, যার প্রভাব সারা জাতির উপর পড়তে পারে। এমন কি এই সমস্ত বিতর্কের ফলে খুব কমসংখ্যক কংগ্রেস সদস্যই প্রভাবিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিবেশনকক্ষে সদস্যদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য হ'ল হাজিরা দেওয়া, নিজের কাজের নজীর সৃষ্টির জন্য অথবা অপর বক্তার যুক্তি কাটান দেওয়ার জন্য বক্তৃতা করা, এবং ভবিষ্যত কোন আইন সম্পর্কে যার সহায়তা দরকার এমন কোন কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করা। কংগ্রেসের অধিবেশনকক্ষকে একটি বাজারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু সেই বাজারের পণ্য তৈয়রী হয় বাজারের বাইরে—প্রধানতঃ লবি ও কমিটিকক্ষগুলিতে।

প্রধান প্রধান বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে সেনেট এবং প্রতিনিধি-সভা উভয়েরই স্ট্যাণ্ডিং কমিটি রয়েছে। ১৯৪৬ সালে যখন কংগ্রেস পুনর্গঠিত হয়, সেনেটের স্ট্যাণ্ডিং কমিটি তখন কমিয়ে ৩৩টি থেকে ১৫টি করা হয়, এবং প্রতিনিধি সভায় করা

হয় ৪৮টী থেকে ১৯টী। একটি কাজ যাতে একাধিক কমিটি না করে এবং যা'তে কমিটিসভ্যরা অল্প-সংখ্যক কমিটিতে মনোযোগ সহকারে কাজ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কমিটীর সংখ্যা কমানো হয়েছে। এই সংখ্যা হ্রাসের ব্যাপারটি দেখতে যত ব্যাপক মনে হয়, আসলে কিন্তু ততটা হয় নি, কারণ এই সমস্ত কমিটিগুলি অল্পাদিনের মধ্যেই অনেকগুলি সাব-কমিটি সৃষ্টি করেছে।

উভয় পরিষদ থেকে সদস্য নিয়ে কতকগুলি যুক্ত কমিটিও থাকে। এই সমস্ত কমিটি মুদ্রণ বা অর্থনৈতিক রিপোর্ট ইত্যাদির মত অপেক্ষাকৃত উৎসাহ অনুদ্দীপক বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। রাজস্ব বা সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর মত রাজনৈতিক উৎসাহ উদ্দীপক বিষয় এই কমিটি বিবেচ্য হয় না। এই যুক্ত কমিটিগুলি বিবেচ্য বিষয়কে দুই পরিষদে আলোচনার হাত থেকে রেহাই দেয়। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় রাজনৈতিক বিতর্কমূলক, সেগুলিকে উভয় সভাতে পেশ করা হয়। কংগ্রেসে দুইটি পরিষদ থাকার পক্ষে যে যুক্তি এখানেও সেই যুক্তিই খাটে।

১৯৪৬ সালের পুনর্গঠনের সময় কংগ্রেসে স্থির হয়েছিল যে, তারা 'বিশেষ কমিটি' গঠনের পাট তুলে দেবে। ইতিপূর্বে এই ধরনের কমিটি খুব কাজে লাগানো হয়েছিল, বিশেষতঃ তদন্তের কাজে। এই ধরনের কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা ছিল। যে সদস্য কোন বিষয়ে তদন্ত করানোর জন্য সরকারকে রাজী করাতে পারতেন, তিনিই সেই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হতেন, এবং তাঁকে দিয়ে ভাল কাজ হবে আশা করা যেত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সেনেটর ট্রুম্যান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিচালনা-বিষয়ক তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি অযোগ্যতা দূরীকরণে অথবা অসাধু উপায়ে অর্থ আত্মসাৎ বন্ধ করার কাজে বহু ক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন। এই সার্থকতার ফলেই প্রথমে তিনি ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হতে পেরেছিলেন এবং পরে হোয়াইট হাউস অধিকারেও সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৪৬ সালের পরে খুব অল্প সংখ্যক বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছে। তবে, অনেকক্ষেত্রে অনুরূপ কাজের জন্য সময় সময় বিশেষ বা স্থায়ী সাব-কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছে।

সাধারণ পদ্ধতিতে কোন বিধান রচনার বিষয়ে কমিটিগুলিকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রেসিডেণ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিধান রচনার প্রস্তাব করেন এবং সেই আইনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সম্পর্কযুক্ত সরকারী দপ্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনের একটি প্রাথমিক খসড়া রচনা করে পাঠায়। কিন্তু প্রস্তাবের খসড়া রচনা করলেই শুধু হয় না, সংশ্লিষ্ট কমিটি সমস্ত প্রস্তাবটি বিচার-বিবেচনা করার পর সেটা মনঃপূত হ'লে তবেই কংগ্রেসে প্রস্তাবের চূড়ান্ত পেশ করে। প্রস্তাবের প্রত্যেকটি শব্দের জন্যও কমিটির দায়িত্ব থাকে।

কমিটিগুলি সাধারণতঃ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কতকগুলি কমিটি আবার কতক বিষয়ে গোপনে বৈঠক করে। এই সমস্ত বৈঠকে শাসন

বিভাগীয় দপ্তরগুলির বড়কর্তা ও বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে, এই পদ্ধতিতে সব সময় সর্বরকমের তথ্যাদি প্রকাশ পায় না। কারণ, বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি যত বোঝেন, কংগ্রেস সদস্যবা সাধারণতঃ ততটা বোঝেন না। আলোচ্য বিষয়ে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবাও অর্থ ব্যয় করে সে বৈঠকে তাঁদের পক্ষ হয়ে বলার জন্য লোক নিয়োগ করে থাকেন। এই সমস্ত লবী মহলেব লোকজনদেরও সে বৈঠকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। এক্ষেত্রেও অবস্থা পূর্বের মত হয়। প্রকাশ্য কাজকর্মের মধ্যে এঁবা বেশীব ভাগ ক্ষেত্রেই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট স্বার্থের পক্ষ হয়ে যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে এরা বেশ সক্রিয়। এদিক দিয়ে কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে তাঁদেব বাইবেও আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভাবপ্রাপ্ত কর্মচারী ও লবী মহলের লোকজনদের কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়, কিন্তু তাদের উত্তব প্রত্যুত্তর থেকে অনেক প্রয়োজনীয় ও যথার্থ সংগ্রহ কবা যায়, এবং বৈঠকের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাদের প্রয়োগ করা হয়। কা'রা প্রস্তাব পাশ করাতে চায়, এবং কারা এ প্রস্তাবেব বিবোধিতা করবে, এবং কোন্ মত বেশী কার্যকবী হবে—এই সমস্ত নিছক রাজনৈতিক তথ্যও এই সমস্ত বৈঠক থেকে সংগ্রহ করা যায়।

একমাত্র রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বিশেজ্ঞ হয়ে উঠার মত সময় কংগ্রেসের খুব কম সংখ্যক সদস্যেবই থাকে। সরকারের কাজ-কর্ম জটীল হয়ে উঠাতে কংগ্রেস বিশেষজ্ঞদের মতামতেব উপর বর্তমানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রায় কমিটির অধীনে একজন বা একাধিক বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য কর্ম-কর্তা রয়েছে। উভয় পরিষদে বিধান সম্পর্কিত উপদেষ্টা-দপ্তর আছে। এই দপ্তর চলতি আইনগুলিব সঙ্গে যথার্থরূপে খাপ খাইয়ে বিভিন্ন কমিটি ও স্বতন্ত্রভাবে সদস্যদের জন্য বিলের খসড়া বচনা কবে।

সম্প্রতি কংগ্রেস লাইব্রেবী অব কংগ্রেসেব "লেজিস্‌লেটিভ রেফারেন্স সার্ভিসকে" আরও সম্প্রসারিত কবেছে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কোন প্রকার রাজনৈতিক মনোভাবের বশবর্তী না হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ও তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট পেশ করেন। কংগ্রেসের অনেক সদস্য এই ব্যবস্থাব সুযোগ গ্রহণ করেন। নিজেদের বক্তৃতাকে তথ্যসমৃদ্ধ কবে তোলাব জন্য অথবা কমিটির কাজে ব্যবহারের জন্য তাঁরা এখান হ'তে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতিব বর্ণনা যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন, মনে হ'বে এ'তে সন্তোষজনকভাবে কাজ চলতে পারে না। কিন্তু তাহলেও যে সময়ে যা প্রয়োজন এবং জনসাধারণ যা চায়, সে অনুযায়ীই এখান থেকে সব হয়ে যায়। ১৯৩৩ সাল থেকে কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনই বিশ্বের ভাগ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কংগ্রেসের বিচক্ষণ ও দেশপ্রেমিক সদস্যরা নানা কাজে ভারাক্রান্ত থাকেন। এইজন্য মনে হতে পারে যে, তাঁদের পক্ষে এই সমস্ত বড় বড় সমস্যাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু দেখা

গেছে নিউ ডিল থেকে মার্শাল পরিকল্পনা এবং নতুন প্রতিরক্ষা কর্মসূচী ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁরা বেশ সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে উভয় দলই সে সমস্ত সমাধান স্বীকার করে নিয়েছে। কোন একটা শক্তি কংগ্রেসকে পরিচালিত করে। আমেরিকার রাজনৈতিক পদ্ধতিই তার প্রধান পরিচালক শক্তি। এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই আমেরিকার জনসাধারণ তাদের প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্খা ও মতামত প্রকাশ করে। কংগ্রেসী কার্যপদ্ধতির গোলক-ধাঁধার মধ্যেও কংগ্রেস জনসাধারণের অভিপ্রায় নিরূপণ করে তাকে সরকারী বিধানে রূপান্তরিত করে থাকে।

কিন্তু কংগ্রেসের ত্রুটি-বিচ্যুতির সব সময়েই আলোচনা চলে, এবং বেশ কিছুদিন পর পর কংগ্রেস নিজেই তার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের সর্বশেষ সংস্কার হয়েছে। আমেরিকার রাজনীতি বিজ্ঞান-পরিষদের তদন্তের পর সেনেটার লাফোলেট ও কংগ্রেস সদস্য মনরোনীর নেতৃত্বে একটি বিশেষ যুক্ত-কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী এই সংশোধন হয়। কংগ্রেসের এই পুনর্গঠনে কেবল কমিটির সংখ্যা কমে নি, বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও বেড়েছে, সভ্যদের বেতনও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এতে কংগ্রেস ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রস্তাব পাশ করে সরকারের কাছে পাপ্য ছোট-খাট পাওনা মিটানোর ঝামেলা থেকেও রেহাই পেয়েছে। কিন্তু এই পুনর্গঠনের বিরুদ্ধেও সমালোচনা হয়েছে, কারণ সমালোচকদের মতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পুনর্গঠন এই সময়ে হয়নি, এবং পুনর্গঠনের যে সুযোগ অবহেলা করা হয়েছে, শীঘ্র তা আর নাও আসতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে প্রবীণত্বের অগ্রাধিকারের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ উদারতন্ত্রীরা তীব্র প্রতি-বাদ জানিয়ে থাকেন, কারণ উভয় দলের প্রবীনরা প্রায়শঃই রক্ষণশীল হয়ে থাকে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগে এঁরাই ক্ষমতাসীন থাকেন। সময় সময় দেখা গেছে গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলির শীর্ষস্থানীয়রা নিতান্ত আযোগ্য ব্যক্তি।

এই অগ্রাধিকার প্রথা চালু রাখার সপক্ষে প্রধান যুক্তি হচ্ছে,—নির্বাচনের পর নিজেকে সংগঠিত করার সময় কংগ্রেস এতে কর্মকর্তা নির্বাচনের সমস্যা থেকে অব্যাহতি পায়। কংগ্রেসকে সংগঠিত করার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়, কারণ কংগ্রেসে অনেক সময় অত্যন্ত অল্প কয়েকজন সদস্য নিয়েও শাসকদল সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে। "ওয়েস্ ও মিনস্" কমিটির মত গুরুত্ব-পূর্ণ কমিটিগুলির চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে কার্যতঃ সংখ্যালঘু দলেরই তখন মনোমত প্রার্থী নির্বাচিত করার সুবিধা হয়। যে সমস্ত বাস্তবধর্মী রাজনীতিজ্ঞরা সেনেট ও প্রতিনিধিসভার রীতি-নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা এই অগ্রাধিকার প্রথার পরিবর্তন করবেন বলে মনে হয় না।

সেনেটে কোন প্রস্তাব নিয়ে অযথা কালক্ষেপ করার বিরুদ্ধেও সমালোচনা করা হয়। কয়েকজন দৃঢ়মন, সেনেটার কোন অমনঃপুত প্রস্তাব নিয়ে পালা করে

আবহমানকাল বিতর্ক করে সেটাকে শেষ করে দিতে পারেন। প্রস্তাবের বিষয় নিয়ে তাদের বলতে হবে এমন কোন কথা নেই। সেনেটসভার নিয়ম অনুযায়ী তারা যে কোন বিষয়,—সেক্সপীয়ারের রচনা থেকে পাক প্রণালী পর্যন্ত চিৎকার ক'রে পড়তে পারেন।

বিতর্ক সীমাবদ্ধ করার জন্য সেনেটের আইন আছে। দুই তৃতীয়াংশ সদস্য চাইলে বিতর্কের সময় সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু এই আইন এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে, যার ফল এ দিয়ে কোন কাজ হয় না বললেই চলে। কারণ প্রকৃতপক্ষে কোন দলই এই অযথা সময়ক্ষেপ করার অধিকার ছাড়তে চায় না।

এই সময়ক্ষেপ করার বিরুদ্ধে অভিযোগ—এতে সংখ্যাধিক্য শাসনের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য, কোন প্রস্তাব সংখ্যাধিক সদস্যের সমর্থন পাবার সম্ভাবনা দেখা যাবার পূর্বে কেউ অযথা সময়ক্ষেপ করার চেষ্টা করে না। অপরপক্ষে, সেনেটে এই ধারণাও বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শ অনুযায়ী কম সংখ্যক রাজ্যের অমনঃপূত হতে পারে এমন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন যথাযথ নয়। আমেরিকার জনসাধারণও সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের সসীমতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তাদের ধারণা, সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি যে রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় সেখানে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করার অধিকার তাদের নেই। দক্ষিণ ক্যারোলাইনাবাসীরা নিউইয়র্কের সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা শাসিত হতে চায় না। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, সেনেট-সভাকে গড়া হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের আদর্শের একটা বিচ্যুতি হিসাবে। ভোটার সংখ্যা যাই হোক্ না কেন, প্রত্যেক রাজ্যেরই সেনেটে দু'টো ভোট থাকে। ছোট রাজ্যগুলোকে বড় রাজ্যগুলোর সংখ্যাধিক্য ভোটের দাপট হতে রক্ষা করার জন্যই এই রীতির সৃষ্টি হয়েছিল! তাই সেনেট সভার ঐতিহ্য অনুযায়ী এখানে সংখ্যালঘুরা যখন কোন প্রস্তাবিত বিধিকে পীড়নমূলক মনে ক'রে তাকে এড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার সংকল্প গ্রহণ করে, তখন সংখ্যাকে অগ্রাহ্য করেই তাদের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এ কারণ, প্রতিনিধি সভায় যে জটিলতাহীন ও সহজ পদ্ধতিতে বিতর্ককে সীমাবদ্ধ করা হয়ে থাকে, অনুরূপ কোন পন্থায় সেনেটে বিতর্ক সীমাবদ্ধ রাখতে কংগ্রেসের উচ্চ পরিষদের রাজী লওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

পরিচালনা ব্যবস্থার যে কোন সাধারণ মানদণ্ডে সেনেট ও প্রতিনিধিসভার কার্যপ্রণালীর দক্ষতা নিম্নস্তরের। সেনেট ও প্রতিনিধিসভার কার্যপ্রণালীকে উন্নত করার জন্য অনেকগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি প্রস্তাব হচ্ছে, উভয় পরিষদে বিদ্যুতিক ভোট-বোর্ড প্রবর্তন করা সম্পর্কে। কয়েকটি রাজ্যের আইনসভায় এ'রকম ব্যবস্থা রয়েছে। সভ্যদের হাজিরা নেওয়ার প্রথায়, বিশেষত: প্রতিনিধি সভাতে অযথা অনেক সময় নষ্ট হয়, এবং হাজিরা দেওয়ার সময় সদস্যদের প্রাসঙ্গিক আলাপআলোচনার কাজ যথাযথভাবে হতে পারে না। বৈদ্যুতিক প্রণালীতে ভোট দেবার ব্যবস্থা হলে সদস্যরা সকলেই এক সঙ্গে ভোট দিতে পারবে এবং তার ফলাফলও

তখন তখন জানতে পারা যাবে; এতে ভোটের হিসাব রক্ষার কাজও সহজ হয়ে পড়বে।

আর একটি প্রস্তাবে কলম্বিয়া জেলাকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে কংগ্রেস হচ্ছে এই জেলার অন্তাবস্যানদের বোর্ড-এর কাউন্টি-সরকার ও রাজ্য আইনসভা, তদুপরি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা। জেলার বাইরে বাসগৃহ ও ভোট না থাকলে ওয়াশিংটনবাসীরা সেখানে ভোট দিতে পারে না।

সেনেট এবং প্রতিনিধি-সভায় উভয় পরিষদেরই জেলা কমিটি রয়েছে। কংগ্রেস স্থানীয় কর বিষয়ক আইনগুলো পাশ করে, টুয়েন্টিয়েথ ষ্ট্রীটকে বিস্তৃত করা হবে কিনা এবং ক্ষৌরকারের দোকানগুলো কিভাবে পরিদর্শন করা হবে তাও ঠিক্ করে দেয়। যে আইন-সভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে আমেরিকার সহযোগিতা বা উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি পরিষদের মত বিষয় বিবেচিত হয়—সেখানে এই সব বিষয় আলোচনার অযোগ্য মনে হয়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই জেলাগুলির স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারের অবসান করা হয়েছিল। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের নগর-সরকার-গুলো দুর্নীতির অতল গহ্বরে নেমে গিয়েছিল। বর্তমানে কোন সহরে সেরকম দুর্নীতি বড় একটা দেখা যায় না। কংগ্রেস সদস্যদের যাঁরা সাধারণ জেলা পরিচালনার ভার থেকে মুক্ত করার কথা বলেন, তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে—আধুনিক উপায়ে নগরগুলি তাদের নিজস্ব সরকারের দ্বারা ভালভাবে পরিচালিত হতে পারে।

কংগ্রেস প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার ও গোলমাল সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ হচ্ছে দেশের দূরাঞ্চলের ভ্রমণেচ্ছু জনসাধারণ। তারা দেশের নানাস্থান থেকে রাজধানী দেখতে আসে, এবং প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চল থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের খাবার কি'নে দেওয়া, থিয়েটারের টিকিটের ব্যবস্থা করা এবং হোটেল ঠিক্ করে দেওয়া ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত রাখে। উচ্চ-বিদ্যালয়ের বাস্কেট-বলের টিম প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে একটি ফটো তুলতে চায়—কংগ্রেস সদস্যকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। একবার একজন সেনেটার ছেলেদের এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, প্রেসিডেণ্ট যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে বড় ব্যস্ত আছেন, তাঁকে এখন এই ব্যাপারে বিরক্ত করা যাবে না। কিন্তু অন্য আর একজন সেনেটার অমনি তার সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাড়াতাড়ি প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা করে তাঁর সহকর্মীকে ডিঙিয়ে ছেলেদের প্রিয় হয়ে উঠার চেষ্টা করে।

কোন সদস্যই তাদের অনুরোধ উপক্ষা করতে সাহস করেন না, কারণ তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে তারও উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সদস্যরা তাঁদের নির্বাচনী এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ককে এতই মূল্যবান মনে করেন যে, কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ হলেই তাঁরা নিজের নিজের এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ়তর করতে যান। ক্রমবর্ধমান ভ্রমণেচ্ছু জনসাধা-

রণের সমস্যা নিবারণের বাস্তব উপায় হচ্ছে আরও অধিকতর কর্মচারীকে দৈনন্দিন কাজের তদারক করার জন্য নিয়োগ করা, যাতে কংগ্রেসের সদস্যরা অধিকতর ফুরসৎ পায়। যে কংগ্রেস সদস্য টানেলের মধ্য দিয়ে তাঁর অফিস থেকে প্রতিনিধি-সভায় হেঁটে যেতে যেতে দুধারে দুজন নির্বাচকের আজেবাজে কথা শুনতে শুনতেই কিভাবে ভোট দেবে ঠিক করে নিতে না পাবেন, সে সদস্য হয় শেষ হয়ে যাবেন, নতুবা তাঁকে কংগ্রেসের সদস্য পদে ইস্তফা দিয়ে আরও শক্ত-স্নায়ুসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য স্থান করে দিতে হবে।

আমেরিকান কংগ্রেসে খুব হৈ চৈ হয়, আবার জনসাধারনের ইচ্ছানুযায়ী কাজও হয়। এই রাজনীতিকদের স্বাভাবিক কর্মধারা। রাজনীতিকরা জনসাধারণেরই প্রতিনিধি, স্ব স্ব অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বই এর প্রমাণ। জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে তাদের হাতে ক্ষমতা তুগ রূপ পরিগ্রহ করে। কংগ্রেসের হৈহুল্লোর আমেরিকার জনসাধারণেরই হৈ-হুল্লোর। বিদেশীদের কাছে সেই হৈ-হুল্লোর অস্বস্তিকর মনে হতে পারে, এবং তা স্বাভাবিক; কারণ সেটা তাঁদের দেশের হৈ-হুল্লোরের মত নয়। এ সমস্ত মিলেই আমেরিকাবাসী; শাসনতন্ত্র রচয়িতারা যে সমস্ত বিপদ ও সমস্যার কথা চিন্তা করতে পারেন নি, সেই রকম বিপদ এবং সমস্যা এভাবেই তারা পারদর্শিতার সঙ্গে সমাধান করছে। আশা করা যায় আমেরিকা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে, এবং সে সাফল্য কেবল আমেরিকানদের পক্ষে আনন্দের বিষয় হবে না, অন্যান্য স্বাধীন জাতির পক্ষেও তা সহায়ক হবে। আমেরিকার জনসাধারণের ভাল-মন্দ দুই আমেরিকান কংগ্রেসের মধ্যে রয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসেও অনুরূপ সার্থকতার সঙ্গেই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

॥ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ॥

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং কিয়দংশে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোও (রেগুলেটিং এজেন্সিস) আদালতের কাজ করে; তারা আইন প্রয়োগ করে বিভিন্ন বিষয়ের বিচার করে। কিন্তু এই চৌহদ্দির বাইরেও তাদের অনেক কিছু করতে হয়। কারণ, লিখিত ধারাগুলিই আইনের সবটুকু হয়ে উঠতে পারে না। নিয়ত নতুন নতুন ঘটনা ঘটে, এবং আইনকে সে সব বিষয়েরও বিচার করতে হয়। সময় সময় নতুন নতুন বিষয়ের বিচারের জন্য কংগ্রেসকে নতুন নতুন আইনও প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু কখনও আদালতগুলি আবার পুরানো আইনের মধ্যে নতন অর্থ খুঁজে পায়, এবং তাকেই তারা পুরানো আইনের সত্যিকার তাৎপর্য বলে ব্যাখ্যা দেয়। পুরানো আইন দিয়ে নতুন অবস্থার সঙ্গে কি ধরনের সামঞ্জস্য করা হবে সেটা একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন, এবং তা প্রধানতঃ নির্ভর করে বিচারকদের এবং বিশেষ করে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের ব্যক্তিগত মনোভাবের উপর। এই সব ব্যক্তিরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন নন, কেননা যিনি নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের পদ-

জয় করেন তিনিই তাঁদেব নিয়োগ কবে থাকেন। তাছাড়া এমনকি উচ্চতম আদালতের নিরালায় বসেও দেশবাসীর নৈতিক মান ও বাজনৈতিক বিচারবোধ তাঁদের উপলব্ধি কবতে হয়।

সবকার শাসনতন্ত্রকে অগ্রাহ্য কবলে তখন কি করা উচিত, সাধারণতন্ত্রেব প্রথম যুগে এ সমস্যার উদ্ভব হয়নি। শাসনতন্ত্র তখন "দেশেব সর্বোচ্চ আইন" রূপে গৃহীত হয়েছিল। কংগ্রেস বা প্রেসিডেণ্টেব কোন কোন বিধান দ্বারা শাসনতন্ত্র লঙ্ঘিত হলে তা তত্ত্বগত দিক্ থেকে আইন হতে পাবত না। ১৮১৬ সালে জেমস্ ব্রাইস যেমন বলেছিলেন, "ক্ষমতার মাত্রা ছাড়িয়ে যেসব বিধি কবা হয় সেগুলি বাতিল হবে। দীনতম নাগবিকেরও সেবকম বিধিকে বাতিল বলে হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই মনে কবা উচিত।" ব্রাইস মনে করেছিলেন যে, কোন আইনকে শাসনতন্ত্র-বিবোধী বলে ঘোষণা করার পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের যে অধিকাব আছে তা যুক্তিপূর্ণ এবং দুরাক্রম্য। তবে, ইতিহাসে দেখা যায় যে, এব্রাহাম লিঙ্কন ও অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন প্রমুখ বিচক্ষণ ব্যক্তিবা সে অধিকাব অস্বীকাব কবেছেন।

১৯৩৭ সালে "কোর্ট-প্যাকিং"-এব বিষয়ে বিতর্কেব সময় এ নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনের সময় যখন মূল আইন ছিল একটি বাজদত্ত সনদ, তখন কখনো কখনো আদালতগুলি কোনো কোনো আইনকে সনদবিরুদ্ধ ব'লে রায় দিত। বাজ্যগুলি সেই ঐতিহ্য বজায় বেখে চলছিল। ১৭৮৬ সালে রোড্ আইল্যাণ্ডের আইনসভা একটি আইন পাশ করলে বাজ্যেব সুপ্রীম কোর্ট রাজ্য-শাসনতন্ত্রের বিরোধী হিসাবে ঐ আইনকে বাতিল ব'লে বায় দিয়েছিল।

এইভাবে প্রাচীন যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি বিবেচনা কবে ১৮০৩ সালে সুপ্রীম কোর্টেব প্রধান বিচাবপতি জন মার্শালই সর্বপ্রথম কংসের একটি বিধানকে বাতিল ক'রে বায় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শাসনতন্ত্রেব বিরোধী আইনকে বাতিল করার নীতি "লিখিত শাসনতন্ত্রের সঙ্গে মূলগতভাবে জড়িত, এবং সেজন্য এই আদালত সেই নীতিকে আমাদের সমাজেব অন্যতম মৌলিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ কববে।"

শাসনতান্ত্রিক বিধিবহির্ভূত বিষয়েব সমস্যা সমাধানের জন্য পববর্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আব একটি মতবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। এই মতবাদের বক্তব্য হচ্ছে, শাসনতন্ত্র-বিরুদ্ধ বা গ্রহণেব অযোগ্য মনে হলে রাজ্যগুলিব নিজস্ব এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রিয় আইনকে বাতিল করে দিবার অধিকার থাকা উচিত। ১৮২৮ সালে জন সি, ক্যালহুন দক্ষিণ কারোলাইনার আইনসভার জন্য একটি সনদ তৈরী করেছিলেন। পরবর্তীকালে একেই "দক্ষিণ ক্যারোলাইনার বক্তব্য" ব'লে অভিহিত করা হয়। এতে তিনি বলেছিলেন, শাসনতান্ত্রিক দিক্ থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারগুলিরই প্রতিনিধি মাত্র। তিনি আরও বলেছিলেন, কংগ্রেসের কাজে অসন্তুষ্ট হলে যে কোন রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রিয় আইন বাতিল করতে পারে, এবং

তারপর নিজ রাজ্যের অভ্যন্তরে সেই আইনের প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে পারে। এই অবস্থায়, তাঁর মতে, সেই আইন শাসনতন্ত্র বহির্ভূত ব'লে গণ্য করা উচিত, এবং তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের ভোটে সেই শাসনতন্ত্র সংশোধন করেই তবে অনিচ্ছুক রাজ্যকে সেই আইন অনুযায়ী চলতে বাধ্য করা যেতে পারে।

ক্যালহুনর যুক্তির ভিত্তিতে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার উগ্রপন্থীরা সেদিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শুল্ক বিষয়ক একটি আইন বাতিল করে দেবার আয়োজন করেছিল। এই প্রয়াসের প্রত্যুত্তরে প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন্ বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করতেই হবে, এবং প্রয়োজন হলে তিনি সৈন্যদল পাঠিয়ে সেই আইন বলবৎ করবেন। কংগ্রেস সেই শুল্ক আইনকে নমনীয় করার জন্য একটি বিধান পাশ করার পর এই ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি হয়।

এর বিশ বৎসর পরে উইসকনসিনের আইনসভা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে মেনে নিতে চায়নি। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এই আইনকে মেনে নিতে চায়নি। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এই আইন অনুযায়ী উত্তরাঞ্চলের একটি রাজ্যকে সেই রাজ্যে পালিয়ে এসেছে এরকম পলাতক ক্রীতদাসকে ফেরৎ পাঠাতে হোত। কোন রাজ্যের কাছে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন উৎপীড়ক মনে হলে সেই আইন বাতিল করার রীতি পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে, এবং ১৮৬১-৬৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের ফলে সে রীতিকে চিরতরে অবলুপ্ত করে দেয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে বাতিল না করলেও সুপ্রীম কোর্ট ইতিমধ্যে সে আইনগুলি শাসনতন্ত্র সম্মত হয়েছে কিনা তার বিচার সুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গৃহযুদ্ধের পর থেকে অধিকতর পরিমানে অস্তিমূলক আইন পাশ হতে থাকে, এবং সুপ্রীম কোর্টকেও অধিকতর পরিমাণে তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

কালক্রমে জনসাধারণ এই অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। সুপ্রীম কোর্ট কোন জনপ্রিয় আইন বাতিল করে দিলে জনসাধারণ মনে করে যে, তারা ভ্রান্ত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে বলে কোর্ট এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। কোর্টের বক্তব্য হচ্ছে, "১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আপনারা কংগ্রেসকে আয়-কর ধার্য্য করবার অধিকার দেননি। এখন (১৮৯৫ সালে) আপনারা আয়-কর ধার্য করতে চাইলে কংগ্রেসকে বলে কিছু হবে না। কংগ্রেসের পরিবর্তে আপনারা আপনাদের কাছে সেই প্রশ্ন রাখুন এবং শাসনতন্ত্রের সংশোধন করে সেটা করুন।" জনসাধারণ তখন ভাবতে আরম্ভ করে—শাসনতন্ত্রের সংশোধন করে আয়-কর ধার্য করা প্রয়োজনীয় কি না। ১৯১৩ সালে তারা এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং শাসনতন্ত্রের ষোড়শ সংশোধনের মধ্যে দিয়ে আয়-কর ধার্য করার নীতি গ্রহণ করে। দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ধৈর্য ও তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত বাতিল করা যায় এ'কথা সকলেই জানে, কিন্তু জনসাধারণ অধৈর্য হয়ে পড়লে এই ব্যবস্থা তাদের সন্তুষ্ট রাখতে পারে না।

অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞদের নিয়েই সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়। বিচারক

বা আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে তাঁদের নিযুক্ত করতে হবে এমন কোন কথা নেই। সেনেটার, এটর্নি-জেনারেল, আইন কলেজের অধ্যাপক বা এমন কি, আদালতের মত কাজ করে এমন সব সংস্থার পরিচালকও সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হতে পারেন। বিচারপতিরা সম্ভবতঃ পঞ্চাশের মত বয়সে নিযুক্ত হন এবং বিশ থেকে চল্লিশ বৎসর তাঁরা বিচারকার্য পরিচালনা করেন। তাই স্বভাবতই তাঁরা বয়স্ক হয়ে থাকেন এবং বিগত দিনের রাজনৈতিক ধ্যানধারনার সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ট পরিচয় থাকে। কোর্টের মতামত প্রায়ই রক্ষণশীল হয়ে থাকে। ফলে যারা দ্রুত উন্নতি চায়, কোর্টের সিদ্ধান্ত তাদের বিপক্ষে যায়। ক্ষমতাশীল পার্টির সঙ্গে কোর্ট দ্রুত তালে চলতে না পারায় ১৯৩৭ সালে প্রসিদ্ধ "কোর্ট প্যাকিং" পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই সময় আদালতের বিচারপতিরা অতি বৃদ্ধ ছিলেন।

১৯৩৫ ও ১৯৩৭ সালের মধ্যে 'নিউ ডিল' নামে পরিচিত আইনগুলির বহু আইন কোর্টে আসে এবং কোর্ট সেগুলোকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী হিসাবে বাতিল করে দেয়। তখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসে প্রস্তাব করেন যে, বিচারপতিরা বড় সেকেলে হয়ে পড়েছেন, আরও ছয়জন বিচারপতি নিয়োগ করে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সংখ্যা পনেরজন করা প্রয়োজন। এই "প্যাকিং" প্রস্তাবে এত অধিক সংখ্যক লোক ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে যে কংগ্রেসকে এই প্রস্তাব নাকচ করে দিতে হয়। এদিকে প্রেসিডেণ্ট অন্যভাবে অগ্রসর হবার পূর্বেই সুপ্রীম কোর্ট নিজেকে যথেষ্ট পরিমানে শুধরিয়ে আনে। ১৯৩৭ সালের পর পদত্যাগ ও মৃত্যুর ফলে বিচারপতিদের অনেকগুলি আসন শুন্য হলেই তবে রুজভেল্ট আটজন নতুন বিচারপতি নিয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ডেমোক্র্যাট দলের পরবর্তী বিশ বৎসর যাবত শাসনের সময়ে এই কোর্ট সরকারী কার্যক্রমের বিরোধিতা আর একরকম করেনি বললেই চলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীন নিম্ন আদালতগুলির কাজ হল শাসনতান্ত্রিক জটিলতাহীন দৈনন্দিন বিচারকার্য নিষ্পন্ন করা। কাজেই এই সমস্ত আদালতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের মত রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্নে রয়েছে জেলা আদালত। সমগ্র আমেরিকায় এ'রকম দু'শ জেলা-বিচারক ছড়িয়ে আছে। যে সমস্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় পড়ে সেই সমস্ত আদালতেই সেগুলির বিচার হয়। যে সমস্ত দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত বিষয় বিশ ডলারের বেশী নয়, সেগুলো ব্যতীত বাকী সব মামলাতেই শাসনতন্ত্র অনুসারে জুরির সাহায্যে বিচার করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের আওতাধীন দেওয়ানী মামলাগুলির বিচার জেলা আদালতে হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আন্তঃরাজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কোন কর্মচারী যদি কর্মব্যবস্থায় আহত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের "এমপ্লয়ারস্ লাইবিলিটি এ্যাক্ট" অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করে তাহলে সে মামলার বিচার হবে এই জেলা আদালতে। নৌসংক্রান্ত আইনগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্ত থাকায় দূর সমুদ্রবক্ষের ঘটনা সংক্রান্ত মামলাগুলিরও জেলা আদালতে বিচার হয়। বিভিন্ন রাজ্যের

নাগরিকদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে সংঘাত দেখা দিলে তারও বিচার হয় এই সমস্ত আদালতে। যে কোন ব্যবসা সংক্রান্ত মামলাই এর মধ্যে পরতে পারে কারণ, এক রাজ্যের সনদদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সেই রাজ্যের নাগরিক হিসাবে গণ্য হয় এবং অন্য রাজ্যেও তারা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে, এবং সেখানে সেই প্রতিষ্ঠান আইনতঃ বিদেশী ব্যবসায় হয়ে পড়ে।

ট্রাষ্ট-বিরোধী আইন, যুদ্ধকালীন মূল্য-নিয়ন্ত্রন আইন, বা অপহরণ ও বে-আইনী দ্রব্য সরবরাহ-বিরোধী আইনগুলির মত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনভঙ্গের অভিযোগগুলির বিচার ফৌজদারী মামলা হিসাবে জেলা আদালতে হয়ে থাকে। কর সংক্রান্ত মামলাগুলিতে সরকার যেমন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি দেবার অভিযোগ আনতে পারে, ব্যক্তিবিশেষও অনুরূপভাবে সরকারের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কর আদায়ের অভিযোগ আনতে পারে।

প্রায় সমস্ত মামলাই প্রথমতঃ জেলা আদালতের প্রাথমিক বিচারের আয়ত্বাধীনে থাকে। অর্থাৎ জেলা আদালতগুলি প্রথমেই সাধারণতঃ জুরির সাহায্য নিয়ে মামলা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে। বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে আদালতের ভুল বা বিচার সংক্রান্ত আইনগুলি শাসনতন্ত্র-বিরোধী হয়েছে এই অভিযোগে বাদী ও বিবাদী আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন জানাতে পারে, এবং আপীলের মামলার জন্য নিয়োজিত মধ্যবর্তী ভ্রাম্যমান যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতগুলিতে সে আবেদনের শুনানী হয়।

আপীল-আদালতগুলি নিম্নতম আদালতের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করে। সেইজন্য এখানে তাদের জুরী বসাতে হয় না। তারা কেবল আইনের প্রশ্ন নিয়েই বিচার করে। তিনজন বিচারক নিয়েই এই আদালতের বেঞ্চ বসে। রাজনৈতিক গুরুত্বহীন দৈনন্দিন মামলাগুলির বিচার করে সুপ্রীম কোর্টের কাজের বোঝা কমানোই এই আদালতগুলির প্রধান কাজ। এমন কি আবেদনকারী যখন কোন আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলে আপীল করে, তখনও সে সম্পর্কে এই আদালতে শুনানী হতে পারে। এবং আদালত সংশ্লিষ্ট বিতর্কমূলক বিষয়গুলি পরিষ্কার করে দিতে পারে। সময় সময় এই আদালতের সিদ্ধান্ত এমন সুস্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ হয় যে সুপ্রীম কোর্ট আর সেই বিচার নিয়ে বিবেচনা করতে অস্বীকার করে। অন্ততঃ এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপীল আদালত কর্তৃক দেশের উচ্চতম বিধানের যথাযথ ব্যাখ্যা সম্পন্ন হয়।

কিন্তু যদি প্রায় একই ধরনের আপীলের মামলায় দু'টি আদালত দু'রকমের রায় দেয়, বা সুপ্রীম কোর্ট নিজেই আদালতের রায় অগ্রাহ্য করে বা তার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত মনে করে, সেক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট আরও কতকগুলি ব্যবসাসংক্রান্ত আইন কানুন, বিশেষতঃ ট্রাষ্ট-বিরোধী ও নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়ের বিচারে যাতে অনর্থক সময় নষ্ট না হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতগুলির মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস সে ব্যবস্থা করেছে। তিনজন

জেলা-বিচারক নিয়ে গঠিত কোন নিম্ন আদালতে এই সমস্ত মামলার বিচার আবম্ভ হতে পাবে। বিচার্য মামলা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ কবে এই আদালত যে রায় দেয়, আপীল কোর্টের কাছে না গিয়ে সেই সম্বন্ধে সবাসবি সুপ্রীম কোর্টের কাছে আবেদন কবা চলে।

যুক্তবাষ্ট্রীয় আদালত ব্যবস্থাব এই তিনটি স্তর বয়েছে। কিন্তু এব বাইবে "ক্লেমস্ কোর্ট", "ট্যাক্স কোর্ট", এবং "কাষ্টমস্ ও পেটেণ্ট আপীল" আদালতের মত কতকগুলো বিশেষ আদালত বয়েছে। যে সমস্ত বিষয়েব বিচারে বিচারককে তাঁর সমস্ত সময় নিয়োগ কবে তবে সমস্যাটিব সমাধান কবতে হয়, সেই সব বিষয়েব বিচাবেব উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত বিশেষ আদালতগুলিব সৃষ্টি হয়েছে। নিছক বিচার-ব্যবস্থা ও কার্যক্ষেত্রে কিছুটা বিভাগীয় ক্ষমতাসম্পন্ন শাসন-সংস্থাগুলির মধ্যবর্তী হোল এই সমস্ত আদালত। এদেব মধ্য দিয়ে সবকাব বিভিন্ন ধবনের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ কবে থাকে।

"বিভিন্ন বাজ্যের মধ্যে এবং পরবাষ্ট্র ও বেড ইণ্ডিয়ানদেব সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণেব ক্ষমতা" শাসনতন্ত্রেব ব্যবসা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে কংগ্রেসকে দেওয়া হলেও ব্যবসা বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে আজ আমবা যে বকম সবকাবী নিয়ন্ত্রণ দেখতে পাই, মূল শাসনতন্ত্র বচনাকালে কিন্তু সেবকম কোন অভিপ্রায় ছিল না। বাণিজ্য শুল্ক এবং বন্দবে জাহাজ যাতায়াতের প্রশ্ন ও বিশেষ ক'বে বাজ্যগুলির বাণিজ্য শুল্ক এবং জাহাজ আটকানো নিষেধ নিয়েই এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকতব জটিল হয়ে পড়ায় কংগ্রেসকে বেলেব ভাড়া, ভ্রমণেব নিবাপত্তা, ঔষধ ও খাদ্যে ভেজাল মেশানো বন্ধ কবা এবং বেতাব পবিচালনা ইত্যাদি বিষয়েও নিয়ন্ত্রণেব ব্যবস্থা কবতে হয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাব বিশেষত্ব হচ্ছে, কংগ্রেস এই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত বিষয়েব প্রত্যেকটিব তথ্য জানতে পাবে না এবং জানাব উপায়ও নেই। 'ফ্লোরিডাব সিলভাব স্প্রিংস্ থেকে নিউইয়র্কেব সিরাকিউসে ঝাঁকায ক'বে কমলা লেবু নিয়ে যাবাব ভাড়া নির্ধাবণ কবে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন কবতে পারে 'না। কিন্তু তাহলেও ন্যায্য ভাড়া সম্পর্কে মোটামুটি যে মান নির্ধাবিত আছে এবং বিভিন্ন ধবনেব ভাড়ার মধ্যে সুসামঞ্জস্য কবা আছে, তা ঠিকমত প্রতিপালিত হচ্ছে কি'না কংগ্রেস তা দেখে থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে কংগ্রেস সাধারণভাবে নীতি ঘোষণা ক'রে আইন পাশ কবতে পাবে। তাবপব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে গৃহীত আইনেব ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত কার্যকবী করতে পাবে এমন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাব কাছে এই সমস্ত আইন প্রতিপালনের ভার দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রধান নিযন্ত্রণকাবী সংস্থাগুলোব মধ্যে ইণ্টাবষ্টেট্ কমার্শ কমিশন (বিভিন্ন বাজ্যের মধ্যে মাল চলাচলেব ভাড়ার তদারক করে, ফেডারেল ট্রেড কমিশন ট্রাষ্ট-বিরোধী আইন লঙ্ঘন এবং অসাধু বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি রাখে), ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন, ফেডারেল পাওয়ার কমিশন এবং সিকিউরিটিস এণ্ড্ একচেঞ্জ কমিশন প্রভৃতি সংস্থা রয়েছে।

কমিশন সমস্ত বিষয় অনুধাবন করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে জানাতে পারে তারা তাদের কাজেব জন্য কি রকম মজুরী আদায করতে পারে, অথবা আইন মেনে চলবার জন্য তাদের ব্যবসায়িক আচরণ কি রকম হওয়া উচিত। এইটাই হল প্রচলিত প্রথা। কাউকে জরিমানা বা কারাগারে পাঠানোর ক্ষমতা এই নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থানগুলোর নেই। কিন্তু তাদেব আদেশকে বলবৎ করাব জন্য তারা ব্যবসায়ীকে আদালতে আইন লঙ্ঘনেব অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পাবে। অর্থাৎ এই সংস্থানগুলো এক একটি নজীরের পরিপ্রেক্ষিতে আইন সৃষ্টি কবে, এবং এইভাবে তাবা একমাত্র সুপ্রীম কোর্ট ছাডা অন্য সব যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থেকে অনেক বেশী আইন সৃষ্টি করে থাকে।

শাসনতান্ত্রিক সংস্থাগুলির আইন প্রণয়নেব ক্ষমতা আদালতগুলি স্বীকার করতে চায় না, কাবণ, তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগ নিয়ে গঠিত সবকারের যে প্রচলিত রূপ আছে, এই সংস্থাগুলি তার সঙ্গে পুরাপুরি মিল খায় না। শাসনতান্ত্রিক সংস্থাগুলো শাসন বিভাগ ও বিচার-বিভাগের সংমিশ্রন, আইন প্রণয়নের বিভাগের সঙ্গে এর বিশেষ মিল বয়েছে। প্রেসিডেন্ট এই সংস্থাগুলি মনোনীত করেন এবং সেনেট সভা সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার কবে দেখে। এই কমিশানগুলো তা'ই রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। যে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার তারা প্রায়ই পার্টি তহবিলে টাকা দিয়ে এই নিয়ন্ত্রণকে নিজেদের অনুকূল করতে চায়। একাধিক কমিশনারের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে জনস্বার্থে শক্তিশালী শিল্পজোটের বিরোধিতা করতে গিয়ে সেনেট কর্তৃক তাদের নাম খারিজ হয়ে গিয়েছে।

চৌকিদারকে চৌকি দেবে কে—এই প্রাচীন প্রবাদটির একটি রাজনীতিসিদ্ধ সমাধান প্রায়শঃই পাওয়া যায়, কিন্তু সে সমাধান আবার আদালতের মনঃপূত হয় না।

অবশ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর উপব দৃষ্টি রাখাব কতকগুলি ক্ষমতা যে আদালতগুলির নেই তা নয়। আদালতগুলি এই সংস্থাগুলোর সংগৃহীত তথ্যের উপর বড় একটা দৃষ্টি দেয় না, যতটা তাদের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণালীর উপর দৃষ্টি রাখে। সীমা যদি ছাড়িয়ে না যায়, তাহলে আদালত নিয়ন্ত্রণকাবী সংস্থাকে জোর করতে দিতে অরাজী নয়, বরং এক্ষেত্রে পুলিশের চেয়ে তাদেব বেশী ক্ষমতাই দিয়ে থাকে। ১৯৫০ সালে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে, মর্টন সল্ট কোম্পানী যথাবিহিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি'না দেখার জন্য ফেডারেল ট্রেড্ কমিশান তার সমস্ত খাতাপত্র পরিদর্শন করতে পারবে। এই রকম "ছেঁকে তোলা অভিযান" কোর্ট বা সাধারণ পুলিশের পক্ষে যথাবিহিত কাজ নয়। এখানে ধীরে ধীরে সরকারী নিয়ন্ত্রণেব বিশেষ প্রয়োজনেব সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে নেওয়া হচ্ছে, "আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির" সংস্কাব হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কাজকর্মে সরকার প্রায়ই অংশ গ্রহণ করে থাকে। সুপ্রীম কোর্টে সরকারী মামলার সওয়াল জবাব করার জন্য ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম এটর্নী

জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিল। বর্তমান বিচাব বিভাগের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল ঐ সমস্ত কাজ করেন। সরকারী আইনজ্ঞ হিসাবে সরকাবেব স্বার্থ সংরক্ষণ করাই এই বিভাগেব কাজ। কেউ আয়-কব ফাঁকি দিয়েছে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'লে ইণ্টার্নাল বেভিনিউ ব্যুরো বিষয়টী এই বিভাগের কাছে মামলা দায়েব করার জন্ম পাঠিয়ে দেয়। যদি কোন সেনেট কমিটি কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে উত্তব আদায় করতে না পাবে' কিংবা সেনেট কমিটি যদি মনে করে যে কেউ মিথ্যা কথা বলছে, তখন জুরিব বিচারে সেই অবমাননাকাবী বা মিথ্যাবাদীব শাস্তিব বন্দোবস্ত করার জন্য বিষয়টি বিচার বিভাগে পাঠিয়ে দেয়।

যুক্তবাষ্ট্রের ডিটেক্টিভ্ কাজকর্মের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ—ফেডারেল ব্যুরো অফ্ ইনিভেষ্টিগেশন্ও এই বিচাব বিভাগেব অন্তর্ভূক্ত। মানুষ অপহরণকারী, ব্যাঙ্ক লুণ্ঠনকারী এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন বিবোধী অপকর্মের উপর এই এফ, বি, আই, সজাগ দৃষ্টি বাখে। গুপ্তচবদেব উপব গোয়েন্দাগিরিও এর কাজের মধ্যে পড়ে। সবকাবী কর্মচাবীদের আনুগত্য অনুসন্ধান করে দেখাও এর কাজ। অন্যান্য সমস্ত গুপ্ত কাজকর্ম, যথা—সরকাবী অর্থভাণ্ডার তদারক কবা, অর্থ জালিয়তি, বিনা শুল্কে আমদানী-বপ্তানী-কবা, অহিফেনাদি মাদকদ্রব্যের ব্যবসায়ী, আয়-কর ফাঁকিদার এবং প্রেসিডেণ্টের জীবননাশেব চেষ্টা বত মানুষ খুঁজে বার করা', এই সবই এফ, বি, আই এর কাজ। এই সমস্ত লোক ধবা পডলে বিচাব বিভাগ অথবা আঞ্চলিক সবকাবী এটর্নী বিভাগীয় তদারকীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ হলেই বিচাব বিভাগ মামলা দায়ের করতে পারে না, বিশেষতঃ যে সমস্ত ক্ষেত্রে অনেকদিন মামলা চালানোব পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আদৌ আইনভঙ্গ কবেছে কিনা তা স্থিব করতে হয়। কোন্ ক্ষেত্রে অভিযোগ কবলে আইনের সওয়াল জবাবগুলি তাঁব অভিরুচি মত রায় নির্ধারণে সহায়ক হ'বে তা এটর্নি জেনাবেলকেই ঠিক কবতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ট্রাষ্ট-বিরোধী আইনের কথা বলা চলে। এখানে সবাসবি আইনভঙ্গেব মামলা বড একটা পাওয়া যায় না; এই আইনের অধিকাংশ মামলাব ক্ষেত্রেই বিচক্ষণ আইনজ্ঞদের মধ্যে ভিন্ন মত পোষণ করতে দেখা যায়।

তা'ই কোথায় কোন আইন প্রয়োগ কবতে হবে এবং কোন্ কাজে আইন খেলাপ হয়েছে, তা নির্ধাবণের ক্ষেত্রে এটর্নি জেনারেলের নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসাবে কাজ করাব অনেকখানি স্বাধীনতা থাকে। প্রেসিডেণ্টের নীতিব বিরোধী সিদ্ধান্ত তিনি করেন না, এবং অপবদিকে উল্লেখিত নীতির উপর রাজনীতির বিশেষ প্রভাব থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ট্রুম্যানের শাসনকাল অন্তে শাসনভারেব সঙ্গে সঙ্গে বিচার বিভাগও যখন প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারেব হাতে এসে পড়ল, সে সময় আদালতে কতকগুলো বড বড় ট্রাষ্ট-বিরোধী মামলা চলছিল। ইউ, এস, ষ্টীলের বিরুদ্ধে আনীত

একটি মামলায় কাঁচামাল উৎপাদনকারী বড় কোম্পানীগুলি কি কি ধরণের অধস্তন (সাবসিডিয়ারী) কোম্পানীকে আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে বিষয়ে একটি আইনগত মৌলিক প্রশ্ন উঠেছিল। এটর্নি জেনারেল আদালতে এই মামলা চালিয়ে যাবেন, না তুলে নেবেন, এই সিদ্ধান্ত সেদিন আইজেনহাওয়ারকেই করতে হয়েছিল।

এটর্নি জেনারেলের মনোনয়ন থেকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নির্ধারণ পর্যন্ত সবই বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিব প্রভাবের মধ্য দিয়ে শাসনতন্ত্র ও আইনের ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। তা'ই সাধারণ মানুষ যে রকম মনে করে, আইনগুলি কিন্তু সে ধরণের আটসাট ও অনড় কিছু নয়। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আইনকে যে ভাবে অবিচল মনে করা হয়েছিল, আজকে কিন্তু আইনগুলির ততটা নিশ্চিত ভিত্তি নেই। তখন লোকে মনে করত যে, মানুষের আইনের পেছনে ভগবানের আদিষ্ট "প্রাকৃতিক নিয়ম" রয়েছে এবং সুবিজ্ঞ বিচাবকরা সে নিয়ম আবিষ্কার ক'রে তার ভিত্তিতে বিচার করেন। ব্ল্যাকষ্টোনের বিখ্যাত ভাষ্যগুলি এই মতবাদেব ভিত্তিতে রচিত। প্রজাতন্ত্রের যুগের প্রথম দিকে আমেরিকার আইনজ্ঞ ও বিচারকদের এই মতবাদ বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। জেরেমী বেন্থাম অক্সফোর্ডে ব্ল্যাকষ্টোনের কাছে শিক্ষা গ্রহণ কবেছিলেন। কিন্তু তিনি ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্ল্যাকষ্টোনের মতবাদেব বিরোধিতা করেন। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডেব বস্তি অঞ্চলের দিকে দৃকপাত করে তিনি বলেছিলেন, ভগবানের বিধান অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের আইন চলছে ব লে তাঁর মনে হয় না। তিনি বলেছিলেন কল্যাণকব উদ্দেশ্য সাধন, যথা বস্তির অবলুপ্তি ঘটান প্রভৃতির মত আইন প্রণয়নেব অধিকার মানুষের আছে। তাঁর এই মতবাদ "হিতবাদ" নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এই মতবাদ থেকেই আমেরিকায় প্রেগ্‌মেটিজমেব উদ্ভব হয়। এই শেষোক্ত মতবাদের বক্তব্য হচ্ছে, যা দিয়ে কাজ চ'লে তা'ই যথার্থ। এই মতবাদ আইন সম্বন্ধে আমেরিকান জনসাধারণের বাজনৈতিক ধ্যানধারনায় ব্যাপক পরিবর্তন এনে দেয়, এবং ক্রমে আইনজ্ঞ ও বিচারকদের মনোভাবেও এই পরিবর্তন দেখা দেয়।

যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণ আইনকে ভগবানের ইচ্ছা মনে করত, এবং একমাত্র বাইবেল ও বিচক্ষণ বিচারকদেব ভাষ্যেব মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করত, ততদিন তারা আইনকে তাদের ভাবনা চিন্তার বাইরে সু-উচ্চ পর্বতের অস্পষ্ট শৃঙ্গে মোসেসের নির্দেশিত অনড় ও সোজাসুজি কতকগুলি বিধান মনে করত। কিন্তু এখন আইনকে শান্তিশৃঙ্খলা ও বিচার, এমন কি সমৃদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহারের জন্য মনুষ্য রচিত বিধান মনে করা হয়ে থাকে। এখনকার অবস্থা পূর্বের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মেঘে-ঢাকা পর্বত-শৃঙ্গের পরিবর্তে আজ আমরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে শক্তিধর বাষ্পীয় বেলচার আঘাতে প্রায়ই কোন না কোন পাহাড় ধ্বসে পড়ছে কিন্তু সবগুলোকে অবলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে না। কোন্ আইনকে পরিবর্তন করতে হবে, কোন্‌টিকে রক্ষা করতে হবে,

সেকথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। দেড়শত বৎসর পূর্বে আইনবিশেষজ্ঞরা যাকে অনড় বলে মনে করতেন, সেই সমস্ত সাদাসিধে আইনগুলি (এগুলি প্রায়শঃই নির্মম ও কঠোর ছিল) আজ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, এবং তার পরিবর্তে জটিল অথচ বাস্তবপন্থী আইনের সৃষ্টি হচ্ছে, যা'তে আমাদের মনোমত জগতসৃষ্টি হতে পারে। আর, সার্বভৌম জনসাধারণের উপযোগী করে পৃথিবী গড়ে তোলার কাজটা বহুলাংশে রাজনৈতিক। ডেমোক্র্যাটদের প্রতিষ্ঠিত সুপ্রীম কোর্ট ১৯৩৭ সালের পর থেকে আধুনিক "বাস্তববাদী" রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানের নিশ্চিত ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছে না। প্রাচীন আইনের মতবাদে নতুন উদ্ভাবিত সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান হতে পারছেন। যেখানে আইনের মধ্যে নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে বিচারের মান্ থাকে কোথায় ?

সুবিজ্ঞ বিচারকরা একটা বিশেষ অনুভূতির মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার ও শালীনতা, ন্যায় বিচার এবং শুভেচ্ছার আদর্শ উপলব্ধি করতে পারেন একথা আজ আর আমরা মানি না। তবুও, ঐ সমস্ত আদর্শ আজও কার্যকরী রয়েছে। মানুষের মধ্যে এখনও ন্যায়পরায়ণতার নীতি বিদ্যমান রয়েছে, এবং সেই নীতি-ব্যাখ্যা করার জন্য লোকে বিচারকের দ্বারস্থ হয়, কিন্তু বিচারকরাও মানুষ ; ফলে, প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন বিচারক একটি বিষয়ে বিভিন্নরূপে অভিমত প্রকাশ করছেন, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁরা মতদ্বৈধতা অথবা ভিন্নমত পোষণের পক্ষে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা য়েছেন। এই সমস্ত বাদানুবাদের মধ্যে থেকে সত্য নিরূপণের পদ্ধতির কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি।

।। রাজ্য ।।

সাধারণতঃ স্বাধীন রাষ্ট্রের যে সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা থাকে, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির সে সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার আছে। তবে, তাদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি দেওয়া হয়নি :

১) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে সমস্ত অধিকার রাজ্যগুলিকে দেওয়া বিধি বহির্ভূত ;

২) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য সরকারকে প্রদত্ত একই ক্ষমতা উভয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগের ফলে যে ক্ষেত্রে পরস্পরে বিরোধ বাধার সম্ভাবনা সে ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ;

৩) যুক্তরাষ্ট্র হতে বিযুক্ত হওয়া, অথবা ইউনিয়ন পরিত্যাগ করা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কোন রাজ্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে পারে না। এক রাজ্য অপর রাজ্যের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে পারে ; কিন্তু, রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলে (যাকে বলা হয় "আন্তঃরাজ্য চুক্তি") কংগ্রেসের অনুমোদন লাভের পর তা কার্যকরী হয়।

রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার উভয়েই একাধিক রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যবসা ও শ্রম-বিষয়ক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্য-সরকারের অধিকার নির্ণয়ের মামলা লেগেই থাকে।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি স্বাধীন। এমন কি আয়কর এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মত আইন নিয়ে যেখানে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা চ'লে এবং অপর রাজ্যকেও প্রভাবিত করতে পারে, সেখানেও তারা স্বাধীন। রাজ্যগুলি ইচ্ছামত এ'কে অপরের ক্ষতিকর নীতিও গ্রহণ করতে পারে। শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা শাসনতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে তাদের এই ধরণের কাজ বন্ধ করার জন্য বাধ্য করা যায় না।

"প্রজাতন্ত্র সরকার" গঠনের ভিত্তিতে রচিত কারও প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করবার পরই তবে তাকে নূতন রাজ্য হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু একবার অন্তর্ভুক্ত হতে পারলে প্রথম সংযুক্তিভুক্ত তেরটি রাজ্যের মতই সমস্ত সার্বভৌম অধিকার এরা ভোগ করে। এর পর কংগ্রেস পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন না ক'রে সেই রাজ্যের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে পারে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মূল শাসনতন্ত্রে ভোটাধিকার দেওয়ার বিষয়টি নির্ধারণের ভার রয়ে গিয়েছিল রাজ্যগুলির হাতে। কংগ্রেস সদস্যদের নির্বাচিত করার অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নে রাজ্যগুলি কংগ্রেসের নিম্নপরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার লাভের যে যোগ্যতা নিধারণ করে দিয়েছিল, শাসনতন্ত্রে সেটাই স্বীকৃত হয়েছিল।

রাজ্য শাসনতন্ত্র ও রাজ্য বিধান-সম্মত আইন-কানুনগুলি পরিবর্তন করার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের নেই। কিন্তু কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের এমন সংশোধনের প্রস্তাব আনতে পারে যাতে ক'রে চার ভাগের তিনভাগ রাজ্য ইচ্ছা করলে অবশিষ্ট রাজ্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ'রকম সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে দিয়েই নারীদের ভোটাধিকার দানে অনিচ্ছুক ও সেনেটারদের গণভোটে নির্বাচিত করার বিরোধী রাজ্যগুলিকে নারীদের ভোটাধিকার দিতে ও সেনেটারদের গণভোটে নির্বাচিত করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গৃহীত শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধন ব'লে উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিগ্রোদের ভোটাধিকার দিতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এই সংশোধনী প্রস্তাবকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়নি, কারণ, রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হয়ে কংগ্রেস সংশোধন প্রস্তাব অনুযায়ী সে সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারেনি, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের সামাজিক ও বৈষয়িক প্রগতি ও সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তগুলি (যেগুলির বিরোধিতা করা হয়নি অথবা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা হয়নি) মিলে দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ রাজ্যগুলিতে ধীরে ধীরে নিগ্রোরা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাথমিক নির্বাচনীগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকার

পেয়েছে। আসল সমস্যা হল এইখানে। বলা যেতে পারে যে; শাসনতন্ত্রে পার্টির নাম উল্লেখ না থাকায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মাত্র, এবং সেজন্য আপন দলে ইচ্ছামত সভ্য সংগ্রহের অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু তাহলেও নির্বাচনের জন্য দলের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষমতা দলের প্রাথমিক নির্বাচনীগুলিরই রয়েছে। আইন করে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য অনুকূল জনমত সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। দক্ষিণের জনসাধারণ নিগ্রোদের ভোটের অধিকার দিতে স্বীকৃত হলেই তবে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব হবে।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে যেমন লণ্ডনের স্থানীয় শাসনাধিকার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইচ্ছামত সংগঠিত করার, এমন কি অবলুপ্ত করার অধিকার রয়েছে, আমেরিকার রাজ্য-সরকারগুলিরও অনুরূপভাবে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংগঠিত করার অধিকার আছে। নিউ ইয়র্ক বা শিকাগোর মত বড় বড় সহরগুলির সঙ্গে রাজ্য-গুলির প্রায়ই সংঘর্ষ দেখা যায়। এই সমস্ত সহরের আয়-ব্যয় তাদের স্ব স্ব রাজ্য-সরকারের চেয়েও বেশী হয়ে থাকে। সহরগুলো ইচ্ছামত তাদের শাসনধারা বদলাতে পারে না। রাজ্য বিধানসভার অনুমতি ছাড়া তারা ইচ্ছামত মাটির তলায় যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থাও করতে পারে না।

আইনসভায় রাজ্যগুলিকে এসেম্বলী-জেলাতে বিভক্ত করার একটি প্রবণতা দেখা যায়, সহরবাসীদের অপেক্ষা কৃষকরা যাতে অধিকতর সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাতে পারে সে দিক থেকে রাজ্যগুলিকে বিভক্ত করতে চায়। তাছাড়া, যে সমস্ত রাজ্যে পার্টিগুলির জয়-পরাজয় অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে, সেখানে এমনও দেখা যায়,—সহরে শাসনব্যবস্থাগুলিতে যখন ডেমোক্র্যাটরা আধিপত্য করছে সে সময় হয়তো রাজ্যসভায় রিপাবলিকানরাই সংখ্যাধিক্য হয়েছে।

রাজ্যের গভর্ণর রাজ্যের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক থাকেন। এই সমস্ত শক্তি তিনি অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারেন না। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার কাজে তিনি তাদের ব্যবহার করতে পারেন। রাজ্যের সৈন্যবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে; অপরপক্ষে আভ্যন্তরীণ অশান্তি নিবারণে অসমর্থ হলে রাজ্যও যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিতে পারে। গভর্ণর সমগ্র বিধানগুলি কার্যকরী করতে পারেন না। তিনি মাত্র কতকগুলি আইন প্রয়োগের অধিকারী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের পক্ষ হয়ে সমস্ত কিছু করে থাকেন। তিনি গভর্ণরদের সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন এবং সেখানে তিনি তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি অভি-যুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে পারেন। সময় সময় তাঁকে এই বিষয়ে পেরোল বা পার্ডনবোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়।

গভর্ণরের অবস্থা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের মত নয়। সাধারণতঃ তিনি অধঃস্তন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকেন। এই সমস্ত

কর্মকর্তা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, এবং সরকারী পদের জন্য রাজ্যপালের উপর তারা নির্ভরশীল নয়। গভর্ণরেব উত্তরাধিকারী হলেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর। গভর্ণরের সঙ্গে তাঁর মনকষাকষি দেখা দিতে পারে, এবং তখন রাজ্যশাসনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমেরিকার রাজ্যগুলিতে এইরকম অচল অবস্থা অজানা কিছু নয়।

কতকগুলি রাজ্যে কিন্তু আবার "রিকল"-প্রথা বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা রয়েছে। গভর্ণর বা অন্য কোন ক্ষমতাবান কর্মচারীকে শাসন ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত করার জন্য জনসাধারণ আবেদন করে পদ-বিশেষের জন্য নতুনভাবে নির্বাচনেব ব্যবস্থা কবাতে পারে। নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে তত্ত্বগতভাবে ভোটাররা এই প্রথার মাধ্যমে সেই সঙ্কটেব সমাধান করতে পারে; কিন্তু রাজ্যদপ্তরে বিবাদ একবার আরম্ভ হয়ে গেলে এই প্রথার মধ্যে দিয়ে সম্ভবতঃ শান্তি স্থাপনের চেয়েও বিবাদের পরিণাম সম্পর্কে হুসিয়াবীর কাজই বেশী হয়ে থাকে।

গভর্ণবেব সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের আর একটি পার্থক্য হচ্ছে, গভর্ণররা উচ্চতব পদলাভের আকাক্সা করতে পাবেন এবং প্রায়শঃ কবেও থাকেন। কোন সেনেটারের মৃত্যু হলে তিনি গভর্ণবের পদে ইস্তফা দিয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণবকে নিজের স্থলাভিষিক্ত কবতে পারেন এবং অতঃপব তাঁবই মাধ্যমে সেনেট সভায় নিজের মনোনয়নের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি এই পদে তাঁর কোন বন্ধু বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিযুক্ত কবে থাকেন। সব সময় অকপটে এই নিযুক্তি হয় না। পরবর্তী নির্বাচনে কে সেই সেনেটেব পদের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, গভর্ণর সেনেটার হবার এই সুযোগ গ্রহণ করবেন, না কিছুদিনের জন্য গভর্ণব পদে পুনর্নির্বাচিত হতে চান, এই সমস্ত প্রশ্নেব উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। নিউ ইয়র্ক ও ওহায়োর মত রাজ্যগুলিতে, যেখানে কোন পার্টি জয়লাভ কববে নিশ্চিত করে বলা কঠিন, সেখানে প্রায়শঃই গভর্ণরের নজর থাকে হোয়াইট হাউসের উপর। গভর্ণর হিসাবে সেনেট সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর কার্যকলাপ পার্টির ভবিষ্যৎ জাতীয় সম্মেলনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র উন্মুক্ত কবে দিতে পারে।

আমেরিকান রাজনীতিতে রাজ্য আইনসভাগুলো অনেকটা অনাথের মত। কংগ্রেসের মত জনসাধাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জৌলুস যেমন তাদের নেই, তেমনি আবার নগর-সরকারগুলির মত জনসাধারণের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকায় স্থানীয় সংস্কারমূলক আন্দোলনও তারা করতে পারে না। নগর-সরকারের তরফে অনেক সময় এরকম সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

রাজ্যের জনসাধারণ রাজ্য আইনসভাগুলিকে পার্ট-টাইম সম্মেলন মনে করে থাকে। প্রভাবশীল বেসরকারী ব্যক্তিরা এর সদস্য হয়ে থাকেন এবং প্রতি এক বৎসর বা দু'বৎসর অন্তর তারা কয়েক সপ্তাহের জন্য সম্মিলিত হয়ে রাজ্যের সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করেন। এই কারণে এ কাজের জন্য প্রদত্ত

বেতনকে তাদের ব্যয়িত সময়ের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধরা হয়, পুরা সময়ের পারিশ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হয় না। এইজন্য রাজ্যের বহু প্রতিনিধি ব্যক্তিগত ব্যবসা বা নিজের জেলা-সহরে ওকালতি করে থাকেন। সময় সময় তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম তাঁদের জনস্বার্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করে থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এক রাজ্যের সেনেটারদের বাৎসরিক ১০০ ডলারেরও কম বেতন দেওয়া হত। সেই সময় কোন এক খনিজদ্রব্য ব্যবসায়ী বহিরাগত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নাকি বড়াই করে বলেছিলেন, তাঁর কোম্পানীর উপর কেউ কোন "পার্থক্যমূলক কর" বসাতে পারবে না, কারণ রাজ্য আইনসভার প্রতিনিধিদের বেশীর ভাগই তাঁদের স্ব স্ব জেলাতে সেই কোম্পানীর আইনব্যবসায়ী হিসাবে বাৎসরিক পাঁচ হাজার ডলার করে পেয়ে থাকেন।

অনেক রাজ্যেরই দায়িত্বশীল পদে এক বা একাধিক কর্মকর্তা থাকেন, যারা প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রতিনিধি। অনেক ধরনের ব্যবসায়ীর কাছে রাজ্যবিধান-সভা প্রণীত আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী কাজকর্মের ঠিকাদার এবং ফটকাবাজার, যারা বাইরের নিয়ন্ত্রণ অথবা কারবার গুটানোর হাত থেকে রক্ষা পেতে চায় তাদের কাছে এই ধরণের আইন বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ। আইন সভার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে কর্মকর্তা মহাশয় তাঁর এই সমস্ত মক্কেলদের তুষ্টিবিধান করতে পারেন। প্রচলিত ধারণা আছে যে, তাঁর পরামর্শ মত চলতে অস্বীকৃত হলে কর্মকর্তা মহাশয় আইন সভার যে কোন সদস্যের পরাজয় ঘটিয়ে দিতে পারেন, এবং এই ধারণা অমূলকও নয়। কর্মকর্তার ক্ষমতার ভিত্তিমূল হোল এই ধারণা।

অপর পক্ষে, "শেকডাইন বিল" বা নিজ উদ্দেশ্য-সাধক প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করে কোন কোন সদস্য আবার বেশ কিছু কামিয়ে নেন। যেমন, কোন প্রতিনিধি হয়ত রঙ্গালয়ে ব্যয়বহুল অগ্নি-নিবারক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব আনায়ন করতে পারেন, বা সুদখোরদের সম্বন্ধে একটি আইন প্রণয়ণের প্রস্তাব করতে পারেন। (হয়ত এই রকম আইন পাশ করানোর ইচ্ছা তাঁর থাকলে ভালই হত) তখন রঙ্গালয়ের মালিক ও সুদখোরকে পরামর্শ দেওয়া হয়, অমুক উকিলকে নিয়োগ ক'রে তার মাধ্যমে টাকা-পয়সা খরচ করে আইনসভার সদস্যের সঙ্গে যেন একটা বোঝাপড়ায় আসে। তারপর ন্যায়সঙ্গত ফী-এর নামে ঘুষ দিয়া প্রস্তাবটি যাতে আর আইনে পরিণত না হয় তারই ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

ভোটারদের মধ্যে রাজনৈতিক. বিষয়ে আগ্রহের অভাবই সম্ভবত রাজ্য-সরকারের অপেক্ষাকৃত নীতিজ্ঞানহীনতার কারণ। রাজ্যের আইনকানুনের জটিলতা এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ী স্বার্থের সম্পর্ক সম্বন্ধে জনসাধারণ কিছুই জানে না, বা জানতেও চায় না। ব্যক্তিগত ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সৎ লোকেরা যাতে রাজ্যের সেবা করতে পারে এ'রকম পর্যাপ্ত অর্থ তারা দিতে অনিচ্ছুক। রাজ্যের রাজনীতির প্রতিও তারা যথেষ্ট দৃষ্টি দেয় না যাতে ক'রে সুসংগঠিত দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

কোন সৎ লোক রাজ্য-ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। কিন্তু সময় সময় কোন কেলেঙ্কারী প্রকাশ হয়ে পড়লে জনসাধারণ রাজ্য-সরকারের সংস্কার সাধনের দাবী করে থাকে।

রাজ্য আইন-সভার উপর এই অবিশ্বাস থেকে ১৯০০ সাল নাগাদ আমেরিকায় প্রায় বিশটি রাজ্যে "ইনিশিয়েটিভ্" ও "রেফারেণ্ডাম্" প্রথা প্রবর্তন করা হয়। "ইনিশিয়েটিভ্" প্রথার মধ্য দিয়ে শতকরা দশভাগ ভোটারের সহি সংগ্রহ করে জনসাধারণ প্রয়োজনবোধে আইন সভায় তাদের মনোমত আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে পারে, অথবা রেফারেণ্ডামের মধ্যে দিয়ে তারা আইন সভার উপস্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। জনসাধারণের এই আবেদনের ফলে বিশেষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়, এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আইন গ্রহণ অথবা বর্জনের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। এই রকম সরাসরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এত জটিল যে, ১৯০০ সালে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রবর্তকেরা এর যতটা প্রয়োগ হবে আশা করেছিলেন বাস্তবক্ষেত্রে ততটা প্রয়োগ হয় নি। কিন্তু জন-জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি হতে পাবে এমন কেলেঙ্কারিতে লিপ্ত হয়ে পরবাব সময় আইন-সভা এই পদ্ধতিতে শাসনদণ্ড জ্ঞান করে সংযত হয়।

রাজ্য আইনসভার প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাসের আর একটি ফল হচ্ছে রাজ্য আইনসভায় গৃহীত বিধানগুলি রাজ্যের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা। ফলে কয়েকটি রাজ্যের শাসনতন্ত্র অত্যধিক দীর্ঘ হয়ে পরেছে, এবং তাতে রাজ্যের সর্বপ্রধান বিধান হিসাবে তার মর্যাদাও হ্রাস পেয়েছে।

জনসাধারণের আগ্রহের অভাব ও রাজ্য-শাসনতন্ত্রের যথাযথ মর্যদা না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে কিন্তু দেখা যাবে যে, রাজ্য সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই আমেরিকান জনসাধারণের রাজনৈতিক প্রগতি অনেকখানি এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। জনসাধারণ সজাগ হয়ে উঠলে অথবা তারা কি চায় তৎপ্রতি বিচক্ষণ গভর্ণর সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সে সমস্ত ক্ষেত্রে জনমতেরই জয় হয়।

রেলপথ, জন-প্রয়োজনমূলক ব্যবস্থা, এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রগতিমূলক কাজে রাজ্য সরকারগুলিই পথ দেখিয়েছেন। নারী ও শিশুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারাই সর্বপ্রথম অমেরিকায় শ্রমিক আইন প্রণয়ন করেছে। নূতন ধরনের নগর-শাসন-ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তারাই সহরগুলোকে ক্ষমতা দিয়েছে। অধুনা আইনসভাগুলি নিজেদের সংস্কারসাধনেও মনোনিবেশ করেছে। আইনসভায় গবেষণা বিভাগ, প্রস্তাব রচনা বিভাগ এবং বিধান সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার জন্য আন্তঃরাজ্য সংগঠন গড়ে তুলেছে।

প্রকৃতপক্ষে, রাজ্যগুলির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের সোরগোল থেকে যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ব্যবসাসংক্রান্ত মূল অনুচ্ছেদটি সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাধারণ জনকল্যাণমূলক বিধানগুলি রাজ্য সরকারের বিধান থেকেই গড়ে উঠেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইনগুলির উৎপত্তি হয়েছে রাজ্য-বিধান থেকেই। অসংখ্য আমেরিকাবাসী নিয়ত এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে বসবাস করে থাকে। তারা প্রত্যেকে যাতে সুনির্দিষ্টভাবে কতকগুলি অধিকার ভোগ করতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তনের এ'ও অন্যতম প্রধান কারণ। রাজ্যগুলিকে নতুন আইন নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষার ক্ষেত্র মনে করা হয়ে থাকে। পরীক্ষায় আইনগুলো উৎরে গেলে তবে রাজ্যের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণ সেই আইন রাখবে, না বর্জন করবে, রাজ্যগুলিতে প্রবর্তন করবে, না যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাকে প্রয়োগ করবে, সবই ঠিক করে।

রাজ্যের আদালত ব্যবস্থা দেখতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের মতই মনে হয়। রাজ্যের আদালতগুলির উপরে থাকে সুপ্রীম কোর্ট। রাজ্য সরকারের আইন শাসনতন্ত্রীবিরোধী কিনা তা বিচার করে দেখার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। রাজ্য-আদালতগুলির সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ অধিকতর ঘনিষ্ঠ। ভিন্ন রকমের আইন-কানুন নিয়ে এগুলির কাজ কারবার করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতগুলি প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের বিষয়ভুক্ত বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু, যে সমস্ত আইনের মর্যাদা রক্ষার দায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারে সমর্পিত হয়েছে, সেগুলি ব্যতীত অন্য সমস্ত আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য-আদালতগুলিকে বিচার করতে হয়। রাজ্যের কতকগুলি আইনকানুন রাজ্যের শাসনতন্ত্র ও আইনসভায় গৃহীত বিধানের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ আইন-কানুন ইংল্যাণ্ডের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। আমেরিকার অবস্থা ও জনসাধারণের নৈতিক বিচারবোধের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতগুলি সে সমস্ত আইনকে দেশোপযোগী করে তুলেছে। লুইজিয়ানাতে কিন্তু বেশীরভাগ আইনই ফরাসী দেশের "কোড্ নেপোলিয়ান" থেকে গৃহীত।

বৃটিশ বিচারালয়সহ অতীতে বিভিন্ন আদালতগুলির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই রাজ্যের সাধারণ বিধানগুলি গড়ে উঠেছে। সমস্ত সাধারণ অপরাধ, নাগরিকে নাগরিকে ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে যেখানে আইন সভার স্বতন্ত্র কোন আইন গৃহীত হয়নি সেখানে এই সাধারণ বিধান অনুযায়ীই বিচার হয়। শাসনতন্ত্রে আমেরিকান নাগরিকদের "যথাবিহিত প্রয়োগ পদ্ধতি" সম্পর্কে যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, সেটা অনেকটা "যথাবিহিতভাবে সাধারণ বিধানগুলি প্রতিপালিত হওয়ার" অনুরূপ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইলিনয় রাজ্যের গুদামঘর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধানটির উল্লেখ করা চলে। ইলিনয়ের বিচারালয়ে এই নিয়ন্ত্রণ বিধানটি বৈধ বলে ঘোষিত হয়েছিল, কিন্তু "যথাবিহিত প্রয়োগপদ্ধতি" অনুসরণ না করে একে বৈধ করা হয়েছে, এই যুক্তিতে আইনটির বৈধতা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা হয়। কোর্ট রায় দিয়েছিল, গুদামঘরগুলি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট, কাজেই তাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ চলতে পারে। "শাসনতন্ত্র যাকে স্বীকার করে, তার থেকেই অধিকার

আসে,"—ইংল্যাণ্ডের এই সাধারণ বিধানের ভিত্তিতেই কোর্ট সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। যে ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করে অথবা শাসনতন্ত্রের সংশোধন করে নূতন কিছু করা হয় নি, সেক্ষেত্রে এমন কি নিজ শাসনতন্ত্রে পরিপূর্ণ নির্ভরশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারও এই সাধারণ বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

রাজ্য-আদালতগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতগুলির চেয়েও বেশী "স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের" মামলার বিচার করে থাকে। স্বতন্ত্র ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে এই সমস্ত মামলার বিচার হয়। এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া প্রভৃতি দেওয়ানী মোকদ্দমা এসবের অন্তর্ভুক্ত। কোন কাজ বে-আইনী না হতে পারে, কিন্তু তাতে যদি অনর্থক অন্য কোন লোকের অপকার হয়, সেক্ষেত্রে বিচারক সে কাজের বিরোধিতা করে আদেশ জারি করবে কিনা তা "ন্যায় বিচার" সংক্রান্ত আদর্শের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এই ন্যায় বিচার সংক্রান্ত আদর্শ ইংল্যাণ্ডে গড়ে উঠবার কারণ হল, সেখানকার সাধারণ বিধানগুলি এত অনমনীয় ছিল যে, নতুন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেই আইন দিয়ে তার প্রতি সুবিচার করা যেত না। ফলে, জনসাধারণও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ত। তখন "ন্যায় বিচার" ছিল "রাজার বিবেকাধীন"। আইনের প্রত্যক্ষ-গোচর অবিচার সংশোধন করার জন্যই তিনি তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। চ্যান্সেলার ছিলেন রাজার বিবেকবাহী, এবং চ্যান্সারি কোর্টে তখন বিচারের একটি স্বতন্ত্র আদর্শ-ধারা গড়ে উঠেছিল। গীর্জার আইন এবং রোমক আইনের সংমিশ্রনে এই আদর্শের সৃষ্টি হয়েছিল।

চার্লস ডিকেনসের পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন চ্যান্সারি কোর্টের বিচার-ধারা এত জটিল হয়ে পড়েছিল যে, বড় বড় সম্পত্তিগুলির উত্তরাধিকার- সংক্রান্ত মামলাগুলির সহজে নিষ্পত্তি হত না। আমেরিকায় সেই "ন্যায় বিচারের" আদর্শের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিধানগুলিকে আইন সভায় সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। "ন্যায় বিচার" সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য কতকগুলি রাজ্যে স্বতন্ত্র আদালত আছে, কিন্তু বেশীর ভাগ রাজ্যে আদালতে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতগুলিতে সাধারণ আইন ও ন্যায় বিচারের আইন, উভয় বিধান অনুযায়ীই বিচার হয়ে থাকে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কোর্টগুলিই হচ্ছে সর্বনিম্ন আদালত। সেখানে বিচারক বা ম্যাজিষ্ট্রেট জুরির সাহায্য ব্যতিরেকেই ত্রিশ দিন কারাদণ্ড দিতে পারেন বা অতিরিক্ত দ্রুত গতিতে মোটর চালানোর জন্য মোটর চালকদের জরিমানা করতে পারেন। সময় সময় খুনের মামলাও তাঁর এখ্‌তিয়ারে পড়ে। সেক্ষেত্রে, বিচারের জন্য তাকে উচ্চতর আদালতে প্রেরণ করা হবে কিনা, সেটা তাঁকে স্থির করতে হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের উপর অন্যান্য সাধারণ ট্রায়াল কোর্টগুলি রয়েছে। যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলার নিষ্পত্তিতে জুরির সাহায্য প্রয়োজন তারা সেই সমস্ত মামলার বিচার করে।

ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট বা নিম্ন-আদালতে প্রায়শঃই রাজনৈতিক নোংরামির পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানকার বিচার করা আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন থাকেন না এবং নোংরা রাজনীতির সুরঙ্গ-পথে তাঁরা চাকরী পেয়ে থাকেন। ট্রায়াল কোর্টগুলিতে দুর্নীতি অনেক কম।

প্রায় রাজ্যেরই ট্রায়াল কোর্টের বিচারপতিরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আইনজ্ঞরা বিচারপতির নির্বাচন পছন্দ করে না। কারণ, এর ফলে বিচারপতিকে রাজনৈতিক হাওয়া বুঝে চলতে হয়। বার এসোসিয়েসনগুলি তাদের স্বার্থের দিক্ থেকে সুবিধাজনক এ'রকম সৎ বিচারপতি মনোনয়নের জন্য চেষ্টা করে থাকে। শ্রমিক ও কিষাণ সংগঠনগুলি গণভোটে বিচারপতি নির্বাচনের স্বপক্ষে থাকে, তাদের ভয়—পাছে গভর্ণর বা আইনসভা বৃহৎ ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিচারপতি মনোনয়ন করে বসে। তাই, যে সমস্ত রাজ্য-বিচারালয়ে আমেরিকান জনসাধারণের বেশীর ভাগ মোকদ্দমার বিচার হয়ে থাকে, রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলির প্রতি তাদের অবশ্যই সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করে চলতে হয়। নির্বাচকরা সমর্থন করবে, বা যে পরিমাণে চাইবে, সেই রকম সততা ও ন্যায়-পরায়নতার মানদণ্ডে তারা বিচারকার্য পরিচালনা করার চেষ্টা করে।

রাজ্যের শাসন বিভাগে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে রাজনৈতিক বিবেচনার বশবর্তী হয়ে চাকরী দেওয়া হয়ে থাকে। চাকুরার যোগ্যতার প্রশ্নও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগে রাজ্যসরকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিবেচিত হয়ে থাকে। আইনসভার মত রাজ্যগুলির সরকারী চাকুরির বিষয়ও জনসাধারণের অবহেলার সামগ্রী হয়ে আছে। তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন শক্তির চাপে তা উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

এই সমস্ত শক্তির একটি হচ্ছে, স্বাস্থ্য-সংরক্ষন ও স্বাস্থ্যোন্নয়নের মত কুশলী জনসেবামূলক কাজকর্মগুলোর ব্যাপক সম্প্রসারণ। কারণ এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজনৈতিক যোগ্যতার বিচারে নিয়োগ হলে সে ব্যক্তি কাজ চালাতে পারবে না, এবং ফলে গদিনসীন দল জন-সমালোচনার সম্মুখীন হবে। এই সমস্ত কাজে যোগ্যতার মাপকাঠিতে কর্মচারী নিয়োগ করা দরকার, এবং একবার যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগের আদর্শ স্বীকৃত হলে স্বতঃই সে আদর্শ আরও বিস্তৃত হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় শক্তি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্য। এই সাহায্যের ফলে রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের অব্যবস্থা ও অর্থলিপ্সা আরও চাঙ্গা হয়ে উঠে। নিজ নিজ অঞ্চলে এই অর্থ তাদের হাত দিয়েই ব্যয় হয়। কিছুদিন এই অবস্থা চলার পর জনসাধারণের মধ্যে এই সম্বন্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। এদিকে ওয়াশিংটনে গদীনসীন শাসকদল দেখতে পান যে, রাজ্য-সরকারকে সাহায্য দিয়ে তাদের কোন সুনাম হচ্ছে না। সুতরাং, পরেরবার সাহায্য মঞ্জুরীর সময় এই সর্ত আরোপিত হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রদত্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য দায়িত্বশীল কর্মচারীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে।

এই ভাবে বিভিন্ন শক্তির চাপে রাজ্যের শাসন বিভাগগুলিতে সৎ ও বিচক্ষণ কর্মচারীরা নিযুক্ত হচ্ছেন। ফলে, রাজ্যের রাজধানীতে অধিকতর দক্ষ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যে সমস্ত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি পীড়াপীড়ি করছিল তারা সাহায্য লাভ ও উৎসাহিত বোধ কববে।

বেশীর ভাগ রাজ্য-সবকাবগুলিকেই নিজের রাজস্ব থেকে খরচ পোষাতে বেশ বেগ পেতে হয়। অন্যান্য আমেবিকান প্রতিষ্ঠানেব তুলনায় যে তাদেব ব্যয় একটা খুব বেশী কিছু তা নয়, তেমন বাজস্ব তোলার মত অবস্থা তাদেব না থাকাতেই তারা এই অসুবিধা ভোগ করে। কৃষিপ্রধান রাজ্যের বাৎসরিক বাজেট দশ থেকে বিশ কোটি ডলাব হতে পাবে, কিন্তু নিউইয়র্কেব মত রাজ্যেব বাজেট হবে একশ কোটি ডলারের মত। আমেরিকার বড় ও মাঝাবি গোছেব ব্যবসায়ী কর্পোবেশনের বাজেটএর সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু নিউইয়র্ক রাজ্য থেকেও নিউইয়র্ক নগরেব বাজেট বেশী।

রাজ্য-সবকার জমিজমা প্রভৃতি, অস্থাবব সম্পত্তি, ব্যবসায়েব লাইসেন্স, বিক্রী বা আদান-প্রদান, ব্যবসায় বা ব্যক্তিগত উপার্জনের উপব কব এবং পেট্রোল ও সিগারেট প্রভৃতিব উপর উৎপাদন-শুল্ক আদায় কবতে পাবে। বিষয় সম্পত্তির উপর খুব বেশী কব ধার্য কবাব উপায় নেই, কাবণ সবকাবেব রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অধিক, এবং বেশী পবিমাণে কব ধার্য করলে মালিক সেটা ছেড়ে চলে যেতে পাবে। আয়-কবও বেশী ধার্য কবাব উপায় নেই, কাবণ যুক্তবাষ্ট্রীয় সবকাব বিশেষ করে বড লোকদের উপব খুব বেশী আয়কর ধবে থাকে। যে ধনীর যুক্তবাষ্ট্রীয় সবকারকে তাঁর আয়ের শতকবা ৬০ থেকে ৭৫ ভাগ কব দিতে হয়, তিনি তাঁর অবশিষ্ট উপার্জন থেকে অনুরূপ হারে বাজ্য-সবকাবকে আয়কব দিতে পারেন না।

বাজ্য-সবকাব তাই আয়কবের হাব নির্ধাবণেব ক্ষেত্রে যুক্তবাষ্ট্রীয় সবকারেব মত ধনী নির্ধনীদেব মধ্যে ব্যাপক তারতম্য বাখতে পাবে না। সম্পত্তি ও বিক্রয়কব, এমন কি পেট্রোল ও তামাকের উপব শুল্ক বসালেও নিম্ন উপার্জনশীল ব্যক্তিবর্গেব উপব বেশী বোঝা পড়ে, এবং তা ব্যবসাব পক্ষে ক্ষতিকব। কোন রাজ্য-সরকাব অসঙ্গতভাবে করের হাব বৃদ্ধি করতে চাইলেই অমনি জনসাধাবণেব মধ্যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে গিয়ে মাল খরিদ করাব প্রবণতা দেখা যায়, যদি সেখানে এব চেয়ে সস্তায় মাল পাওয়া যায় এই আশায়।

বাজ্য-সরকারের আয়ও যেমন সীমাবদ্ধ, তাদের দায়িত্বও তেমনি সীমাবদ্ধ, এবং কোন কোন দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় সবকারেব উপর চাপিয়ে দেবাব একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা যায়। রাজ্য সরকারগুলি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডার থেকে সাহায্য কামনা করে। রাস্তাঘাট ও স্কুলেব জন্য প্রাচীন কাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দিয়ে আসছে। ১৯৩৩ সাল থেকে রাজ্যেব অনেক দায়িত্ব—যেমন, কর্মহীন ও অন্যান্য দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য দান ইত্যাদি

যুক্তরাষ্ট্রীয় সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ গ্রহণ করেছে। দুর্দিনে জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা সবাই আজ স্বীকার করে।

দু'টি অর্থনৈতিক কারণে রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্য দেওয়া হয়। একটি হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর সংগ্রহের ক্ষমতা রাজ্য-সরকার থেকে অনেক বেশী, কারণ আমেরিকায় থেকে কেউ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে কর ফাঁকি দিতে পারবে না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, সমতা সমগ্র দেশের পক্ষে কল্যাণকর হয়। কতকগুলি রাজ্য অন্যান্যদের চাইতে অনেক বেশী সমৃদ্ধ। ফলে, সমৃদ্ধ রাজ্যের লগ্নীকারীরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র রাজ্যে ব্যবসায় করে অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং তা করেও থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যদি সমৃদ্ধ রাজ্যে অধিকতর পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করে তার কতকটা দরিদ্র রাজ্যের উন্নতিবিধানে নিয়োগ করে, তাহলে সেখানে অর্থের অভাব হয় না এবং সমৃদ্ধি অটুট থাকে। রাজ্যগুলির আত্মনির্ভরশীলতার যুক্তি থেকে রাজ্যগুলির মধ্যে সমতার যুক্তি আজ প্রবল হয়ে উঠেছে।

অনুরূপভাবে, রাজ্যের সমৃদ্ধ ও দরিদ্র অংশের মধ্যে সমতা আনয়ন করাও রাজ্যসরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসায়ে সহরগুলো স্বভাবতঃই অধিকতর লাভবান হয়ে থাকে। সরকার হস্তক্ষেপ না করলে গ্রামাঞ্চলের খামার প্রভৃতির সম্পদগুলি ধীরে ধীরে সহরের ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স ও মহাজনদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, যেমন হোত ১৯৩৩ সালের পূর্বে। কিন্তু এ'তে দেশের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হয়। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অসম ফলাফল শুধরে নেবার জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন। রাস্তাঘাট তৈরী ও জনসেবামূলক কাজকর্ম পরিচালনা করে, স্কুল ও লাইব্রেরী এবং স্থানীয় জনসেবা ভাণ্ডারে সরাসরি অর্থ দিয়েই রাজ্যগুলি সাধারণতঃ এই প্রকার সাহায্য করে থাকে।

এই সমতার প্রয়োজীয়তা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধিকতর রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতার জন্যই রাজ্যগুলিকে ওয়াশিংটনের সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এই অবস্থা আমেরিকার জনসাধারণ পছন্দ করে না। এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র বড় বেড়ে যাচ্ছে এবং তার স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিভাগগুলোও বড় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। আর তাতে রাজ্যসরকারগুলোর দায়িত্ব ও মর্যাদা কমে যাচ্ছে। উভয় রাজনৈতিক দলের নেতারাই রাজ্যগুলোর যাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্যের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হতে না হয় তার উপায় উদ্ভাবনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময় গভর্ণর স্টিভেন্সন সরকারী দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ওয়াশিংটন থেকে রাজ্য এবং রাজ্য থেকে স্থানীয়:সরকার পর্যন্ত যথাসম্ভব সরকারী দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক জীবনকে আরও প্রাণশক্তিময় করে-তোলার উদ্দেশ্য

নিয়ে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির রাজস্ব ও দায়িত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাজ্যগুলির দায়িত্ব ও মর্যাদাবোধ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যেন পেট্রোল প্রভৃতি দ্রব্যের উপর হতে কর সংগ্রহে বিরত থাকেন। বড় বড় রাস্তাঘাটজনিত ব্যয়ের জন্য রাজ্যগুলি এই সমস্ত আয়ের উপর নির্ভর করে থাকে। অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি তার রাজ্যসরকারকে কোন বিষয়ে কর দিলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যেন তার উপর আবার সেই বিষয়ে কর ধার্য না করে। তবে রাজ্যসরকার যে সমস্ত বিষয়ে কর ধার্য করেনি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষে কর আদায় যেন কেবল সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে বাধ্য করার জন্য এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়েছিল, এবং আয়-কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়েছিল। রাজ্যগুলি যদি ব্যবসায়ী ধনী ব্যক্তিদের নিজ নিজ এলাকায় স্থিত হয়ে থাকার জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রলুব্ধ করতে সমর্থ না হয়, তাহলে রাজ্যগুলির রাজস্ব বহুল পরিমাণে বেড়ে যেতে পারে।

কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা মানুষের সহজাত ও দুর্বার। এর গতিরোধ করার জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে যতটা সম্ভব এখানে বিভিন্ন কৃত্রিম পন্থায় চেষ্টা করা হবে বলে মনে হয়। কারণ, আমেরিকার জনসাধারণ স্ব স্ব রাজ্যসরকারকে বিশেষ আমল না দিলেও রাজ্যগুলি বিপদের সম্মুখীন মনে হলে তাদের জন্য অবশ্যই তারা এগিয়ে আসবে।

।। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ।।

আমেরিকার অর্ধেকেরও বেশী লোক সহরে বাস করে, এবং এ'রকম প্রায় এক-শ'টি সহরে জনসংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী হবে। অবশিষ্ট জনসংখ্যা প্রধানত কাউন্টি-শাসনের মধ্যে দিয়েই স্থানীয় শাসন ভোগ করে। বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক কাজকর্ম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য হাজারো জেলা বা বিভাগ রয়েছে। এই সমস্ত জেলার কাজকর্ম কাউন্টি, সহর ও অনুরূপ অন্যান্য জেলার কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। একজন নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য, সহর, কাউন্টি ও জেলা ইত্যাদি আধ-ডজন সরকারী সংস্থাকে কর দিতে হতে পারে।

টমাস জেফারসন সহরকে ঘৃণা করতেন। তিনি সহরকে দুর্নীতির আস্তানা মনে করতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার সহরগুলিতে রাজনৈতিক জীবন অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। য়ুরোপ এবং আমেরিকার কৃষি-অঞ্চল থেকে তখন অনেক নতুন নতুন লোক এসে সহরে জমা হচ্ছিল। তারা সহজেই সহরে

রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ফাঁদে পা দিত। ১৯০০ সালের পর থেকে সততা ও বিচক্ষণতার দিক্ থেকে সহুরে শাসনব্যবস্থা উন্নত হতে আরম্ভ করে। এই উন্নতির একটা কারণ হচ্ছে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সহুরে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা লাভ। এক সময় রাজনৈতিক নেতারা দরিদ্র জনসাধারণকে সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে বাধ্য করে রাখত। কিন্তু জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তালাভের ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রে এই দুর্নীতির অবসান হয়েছে। সহুরে সরকারগুলিতে অধিকতর বিচক্ষণ শাসন-পদ্ধতির প্রবর্তনও এই উন্নতির অপর একটি কারণ।

সহরগুলির স্বকীয় কোন সার্বভৌম অধিকার নেই। কিন্তু তারা নাগরিকদের আকাঙ্খামত অধিকার আদায় করবার জন্য রাজ্য-সরকারগুলির উপর সাধারণতঃ খানিকটা প্রভাব খাটিয়ে থাকে। তিন ধরণের সহুরে শাসন-ব্যবস্থা আছে। মেয়র ও কাউন্সিলার নিয়ে সাবেকী ধরণের সহুরে শাসন ব্যবস্থা আজও বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রে বজায় রয়েছে। টেক্সাসের অন্তর্ভুক্ত গ্যালভেস্টনে সর্ব-প্রথম কমিশান ধরণের শাসন প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯০১ সালে প্লাবন-বিধ্বস্ত হবার পর জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য সেখানে এই ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী পনর বৎসর অন্যান্য মাঝারি ধরণের সহরেও এই শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তারপর আর নতুন কোন সহরে এই শাসন- ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এর পর জনসাধারণ কাউন্সিল ম্যানেজার বা নগর-তত্ত্বাবধায়ক প্রথার দিকে ঝুঁকে পড়ে। নয় শতেরও বেশী মাঝারি সহরে আজ এই তৃতীয় ধরণের শাসন-ব্যবস্থা চালু আছে।

সাবেকী ধরণের মেয়র ও কাউন্সিল প্রথার শাসন ব্যবস্থায় কাউন্সিলার বা অল্ডারম্যান হতেন স্থানীয় রাজনীতিকরা, এবং সেখানে চাকরী দেওয়া হত রাজনৈতিক কার্যাবলীর পারিতোষিক হিসাবে। তৎকালীন নিম্নস্তরের রাজনৈতিক ছলচাতুরীর সঙ্গে এই দুর্নীতিগ্রস্থ সহুরে শাসন-ব্যবস্থার বেশ মিল হয়েছিল, এবং তাই তারা সাধারণতঃ নতুন ধরণের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধী ছিল। কিন্তু তবুও এই শাসন-ব্যবস্থাতেও অনেক সংস্কার সাধিত হয়েছে।

প্রায় বেশীর ভাগ কাউন্সিলেরই দু'টি চেম্বার থেকে একটি চেম্বার করা হয়েছে, এবং কতকগুলি একক চেম্বারযুক্ত কাউন্সিলের আয়তন হ্রাস করে কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। সহরে এই সমস্ত কাজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াও বিশেষ বিচক্ষণ কর্মচারীর প্রয়োজন হয়, এবং তদনুসারে সহুরে শাসন-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। অনেক শহরে মেয়রের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সহরের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁকে অনেকখানি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এইভাবে যে সমস্ত সহরে নগর-তত্ত্বাবধায়ক-প্রথা সরাসরি গ্রহণ করা হয়নি সেখানেও শাসন-ব্যবস্থাগুলি কার্যতঃ অনুরূপ ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

কয়েকজন লোককে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বশীল করার উদ্দেশ্য নিয়েই কমিশান ধরণের সহুরে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছিল। কমিশানে সাধারণতঃ পাঁচজন

সদস্য থাকেন। তাঁদের মধ্যেই একজন কমিশানের চেয়ারম্যানের কাজ করেন, এবং তাঁকে মেয়র বলা হয়। কমিশান সামগ্রিকভাবে নীতি গ্রহণ করে, এবং প্রত্যেক সদস্যই এক-একটি বিভাগ পরিচালনা করার ভার নেয়। এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, কমিশানে অচল অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে, এবং তখন তাকে আর কোনক্রমেই সচল করে তোলা যায় না।

১৯০৮ সালে ভার্জিনিয়ার স্ট্যান্টন সহরেই সর্ব-প্রথম কাউন্সিল-ম্যানেজার-প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় কাউন্সিল সহর পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করে ও সহরে অর্ডিন্যান্সগুলি পাশ করে, কিন্তু শাসন পরিচালনার ভার থাকে ম্যানেজারের উপর। কাউন্সিল ম্যানেজারকে বেতন দিয়ে নিয়োগ করে। তিনি অন্য সহরের অধিবাসীও হ'তে পারেন। এই কাজে পারদর্শিতা লাভের সঙ্গে ম্যানেজার অন্যত্র আরও ভাল চাকরী পেতে পারেন। যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করে ম্যানেজার কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং এই ভাবে শাসন-ব্যবস্থা ভালভাবে নির্বাহ করার যথেষ্ট সুযোগ তাঁর থাকে।

নিম্নতম খরচে বেশী কাজ ও অধিকতর সেবা বিতরণ, এই ব্যবসায়ী বুদ্ধির ভিত্তিতেই সহরে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ম্যানেজারী-প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই জনসাধারণ বেসরকারী কর্পোরেশনের মত ডাইরেক্টর বোর্ড ও ম্যানেজার নিয়ে কর্পোরেশন গঠন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছে, এবং নিজেরাই এই কর্পোরেশনের অংশীদারের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

নিছক রাজনীতির মাধ্যমেই সমাধান করতে হয়—এমন সমস্যা সহরে শাসন-ব্যবস্থায় অনেক কম, জনসাধারণের ইচ্ছা হ'লে জাতীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক বেশী রাজনীতি পরিহার ক'রে সহরে ব্যবস্থাগুলি পরিচালনা করা সম্ভব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় সহরে শাসনের মধ্যে পড়ে না, বা ওয়াশিংটনের শাসকদের যেমন জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাকুঞ্চন প্রভৃতি সমাধান করতে হয়, তেমন কোন গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান তাদের করতে হয় না। অপর পক্ষে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত কাউন্সিল সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বার্থের প্রতিনিধি হওয়ায় সংখ্যালঘুরা তাদের শাসনে নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করে ও ম্যানেজার-প্রথার সমালোচনা করে থাকে। সহরে তাই কাউন্সিলে অনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সহরের জনসাধারণের মধ্যেকার রাজনৈতিক মতবৈষম্যকে স্বীকৃতি দানের কথা উঠেছে। এই প্রথা প্রবর্তিত হলে সংখ্যালঘুরা যদি নির্বাচনে দুই-পঞ্চমাংশ ভোট পায়, তাহলে কাউন্সিলেও তারা দুই-পঞ্চমাংশ আসন পাবে, কিন্তু বর্তমানে তারা একটিও আসন পায় না। জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা প্রবর্তিত হলে ছোটখাট দলের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক পদ্ধতির পক্ষে ক্ষতিকর হবে মনে করে এই প্রথার বিরোধিতা করা হয়ে থাকে। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে এই সাধারণ আপত্তির জন্য সহরগুলিতে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না।

সহরগুলির বাড-বাডন্তের চাইতে অনেক দ্রুতগতিতে সহরের শাসন-ব্যবস্থাগুলির কাজকর্মের প্রসার ঘটেছে, কারণ আজকের দিনের জনসাধারণ এই সমস্ত নতুন নতুন ব্যবস্থা ছাড়া বসবাস করতে চাইবে না। এদিকে সহরের আয়তন ও তার জনবহুলতার ফলে ব্যয়বহুল দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কাজকর্ম, ছাড়া সেখানে বাস করাই দায় হয়ে উঠেছে। জর্জ ওয়াশিংটনের আমলে এই সমস্ত বিষয়ের কোন প্রয়োজনই ছিল না। জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম ও ব্যবস্থা, অগ্নি-নিবারক বিভাগ, বিদ্যালয়, গ্রন্থালয় ও পুলিশী ব্যবস্থাগুলির ব্যয় সহরের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতার অনুপাতে অনেক বেশী বেড়ে যাচ্ছে।

বিক্রয়-কর, ব্যবসায়ের উপর ধার্য প্রত্যক্ষকর এবং জমিজমা প্রভৃতিই শহরে শাসন-ব্যবস্থাগুলির আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু জমি-জমা প্রভৃতি এবং বিক্রয়-করও ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে। ব্যবসায়ের উপর অতিরিক্ত পরিমাণ কর ধার্য হলে ব্যবসাগুলি সহরের সীমানার বাইরের উপকণ্ঠে চলে যাবে। তখন সহরের কর্তৃপক্ষ তাদের উপর 'কর' ধার্য করতে পারে না ও সহরের আয় কমে যায়।

আয়ের চেয়েও ব্যয় বেশী ব'লে সহরের বেশীর ভাগ শাসন-ব্যবস্থাগুলিকেই বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকে, কারণ রাজ্যগুলির উপর কৃষিজীবি জনসংখ্যার ভোটের বিশেষ প্রাধান্য থাকে। তাছাড়া রাজ্যগুলি গ্রাম ও সহরের মধ্যে সাম্য-আনয়নের চেষ্টা করে। তারা সহরে জনসাধারণের উপর কর বসিয়ে সে অর্থ গ্রামাঞ্চলে ব্যয় করে।

১৯৫৩ সালে নিউ ইয়র্ক সহরের মেয়র এবং সেই রাজ্যের গভর্ণরের মধ্যে সহরকে দেয় সরকারী সাহায্যের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রকাশ ছিল যে, রাজ্য-সরকার তার রাজস্বের শতকরা পঞ্চান্ন-ভাগ স্থানীয় শাসনব্যবস্থাগুলিকে সাহায্য দানখাতে ব্যয় করে। নিউ ইয়র্ক সহরকে রাজ্যসরকার থেকে যে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেটা সহরের বাজেটের শতকরা পনের-ভাগের মত। মেয়রের অভিযোগের মূল বক্তব্য ছিল, সাহায্য বণ্টনের ক্ষেত্রে রাজ্য-সরকারের বিধানগুলি ছোট ছোট শাসন-ইউনিটগুলিকে অনুচিতভাবে অধিকতর সাহায্য দিয়ে থাকে।

সহরগুলি সাম্যের আদর্শ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায় না, কারণ বড় বড় সহরগুলিতেই ধনসম্পত্তি সবচেয়ে বেশী কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। কর ধার্য করার ক্ষমতার পার্থক্যের কথা বলেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চায়। সহরের শাসন-কর্তৃপক্ষরা তাদের ধনাঢ্য অধিবাসী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর উচ্চহারে কর ধার্য করতে পারে না, করতে চাইলে তারা দপ্তর গুটিয়ে সহরের এলাকার বাইরে চলে যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার তাদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করে সংগৃহীত অর্থের কিছু অংশ সহরগুলিকে সাহায্য হিসাবে দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কার্যতঃ এইভাবেই সহরগুলিকে সাহায্য করে থাকে।

এরই ফলে দেশব্যাপী বিরাট মন্দার সময় রিলিফের ভারে জর্জরিত হবার পর হতে সহরে শাসন-ব্যবস্থাগুলির স্ব স্ব রাজ্য-সরকারকে নিষ্ঠুর বিমাতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে সহৃদয় মেসো মনে করবার মনোভাব দেখা যাচ্ছে।

সহরের সেবামূলক ব্যবস্থাগুলি বেশীর ভাগই বেশ বিচক্ষণতা ও সততা সহকারে কাজকর্ম করে থাকে, বেশীর ভাগ সহরেরই পুলিসি ব্যবস্থার এখনও তেমন উন্নতি হয় নি। যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরী হওয়ার পরিবর্তে পুলিস বিভাগে এখনও পূর্বের মত রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার বশবর্তী হয়ে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। দুষ্কৃতিকারীর অড্ডার সঙ্গে তাদের সরাসরি সংযোগ থাকে, আনুকূল্য লাভের জন্য তারা পুলিশকে বহু অর্থ দেয়। পুলিশেরা সাধারণতঃ স্বল্প বেতন পেয়ে থাকে, জনসাধারণ তাদের সন্দেহের চক্ষে দেখে এবং "সৎলোকেরা তাদের ঘৃণা করে। ১৯৫০ ও '৫১ সালে সেনেটার এস্টেস্ কিফভারের নেতৃত্বাধীনে একটি কমিটি কিছু সংখ্যক অপরাধ অনুসন্ধান করে দেখতে পায় যে, অপরাধী সংগঠনগুলি পুলিশের বেতন দিয়ে থাকে। অপরাধ উদ্ঘাটন করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্রমোন্নয়নের ফলে পুলিশ বিভাগে অধিকতর বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই বিভাগের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আরও আকৃষ্ট হচ্ছে, জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে বোঝাবুঝি বেড়ে চলেছে। এই সব কারণে আশা করা যায় যে, অন্যান্য সরকারী বিভাগের মত পুলিশ বিভাগের কাজকর্মও ক্রমশঃ উন্নত হবে।

ছয় কোটি আমেরিকাবাসী সহরের বাইরে বাস করে। প্রধানতঃ কাউন্টির মধ্যে দিয়েই তাদের শাসনব্যবস্থা চলে। ঔপনিবেশিক যুগে যেভাবে কাউন্টি শাসন চলত, আজও প্রায় অনেকটা সেই পদ্ধতিই চালু রয়েছে। এতে একটি বোর্ড থাকে। সাধারণতঃ দশজনের চেয়ে কম সংখ্যক সদস্য নিয়েই এই বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান অনেক ক্ষেত্রে কাউণ্টির আদালতের বিচারকও হয়ে থাকেন। সম্পত্তির দলিলপত্র, উইল, বিবাহের দলিল এবং অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ের নথিপত্র জনস্বার্থ সংরক্ষণ করতে হয়, সমস্তই এই কাউণ্টি রক্ষা করে থাকে। স্থানীয় রাস্তা নির্মাণ করাও কাউণ্টির কাজ। রাজ্য ও জাতীয় নির্বাচনে কাউণ্টি তার উপর ন্যস্ত কর্তব্যও সম্পাদন করে থাকে। আদমসুমারি এবং সৈন্যদলের জন্য লোক সংগ্রহ করাও কাউণ্টির কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কাউণ্টিগুলো শেরিফ, করোনার এবং বিচারালয় ও কারাগারের কাজকর্মেরও ব্যবস্থা করে থাকে।

বিভিন্ন রাজ্যের কাউণ্টিগুলোকে কতকটা বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম করতে হয়, তাদের কর্মচারীদের পদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি থাকে, সাধুতা ও অসাধুতায়ও তারতম্য থেকে যায়। জনসাধারণের সঙ্গে এই সমস্ত কাউণ্টি সরকারগুলোর সংযোগ সর্বাধিক এবং তারা প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে জড়িত। সৌখিন জনসেবকরা কাউণ্টির অনেক পদ পূরণ করে থাকেন। তারা পার্ট-টাইম কাজ করেন, অনেক সময় এজন্য বেতন নেন না। পল্লীঅঞ্চলের জনসাধারণ সাধা-

বণতঃ রক্ষণশীল হয়ে থাকে, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া ব্যবস্থাগুলি তারা পরিবর্তন করতে চায় না। অযোগ্যতা এবং লোলুপতা দীর্ঘকাল হতে একটা জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

রাস্তা ও স্কুল প্রভৃতির দরুণ ব্যয়-বহনের দায় এখন কাউন্টি সরকারের উপর থেকে গিয়ে পড়ছে রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর, এবং এমনকি কোন কাউন্টিতে একটা খুন হলে বহু ক্ষেত্রেই তার তদারক করার জন্য রাজ্যসরকারের গোয়েন্দারা এসে থাকেন। কেন্দ্রীয়করণ প্রথার প্রসারের ফলে কাউন্টিগুলোর সাবেকী কাজকর্মও তাই পূর্বাপেক্ষা অনেকখানি কমে গেছে। অপরপক্ষে, এই কেন্দ্রীয়করণের ফলে কাউন্টি সরকারের উপর নতুন কাজকর্মও এসে পড়েছে। পূর্বে স্থানীয় জেলা বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরাই এই সমস্ত কাজ করত।

বেশীর ভাগ বিভাগই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বসানো হয়েছে। এ'ছাড়া কর-বিভাগ, রাস্তা বিভাগ ও নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের কাজকর্ম করার জন্য নির্বাচনী বিভাগ রয়েছে। একজন জ্যাষ্টিস অব পীস যতটা এলাকার উপর কর্তৃত্ব করেন, সেইটুকু এলাকা নিয়েই একটা বিভাগ বা জেলা গঠিত হতে পারে। বিভাগগুলোর সংগঠন খুব সাদাসিদে ধরনের হওয়া উচিত। স্কুলগুলোকে কেন্দ্রীকৃত করার পর জিলাগুলির অস্তিত্ব একরকম মুছে গেছে। বড় বড় রাস্তা তৈরী ও মোটর চলাচলের হিড়িক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্থানীয় কাজকর্মগুলিও কাউন্টির আয়ত্তাধীনে চলে গেছে। জেলা সংগঠনের গুরুত্ব হ্রাসের ক্ষেত্রে এরও অবদান রয়েছে।

নিউ ইংল্যাণ্ড এ টাউনগুলো (অনেকটা ভারতীয় গ্রামের মত) ছিল মূল স্থানীয় ইউনিট। নিউ ইংল্যাণ্ডের টাউনগুলির আয়তন সাধারণতঃ ত্রিশ থেকে ষাট বর্গমাইলের মত। এই টাউন এলাকার সমস্ত অংশ থেকেই চাষীরা আবহাওয়া ভাল থাকলে ঘোড়ার গাড়ী হাকিয়ে আদালতে মামলা সেরে সেইদিনই বাড়ী ফিরে যেতে পারত। টাউনের সভাগুলোই হোল শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। টাউনের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য নাগরিকরা সেখানে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। কত কর ধার্য করবে, কি'ভাবেই কুইনসি ষ্ট্রীটটি তৈরী করবে ও পার্কের জন্য কত বেঞ্চ কিনতে হবে, এই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ও তার সেই সমস্ত সভায় ঠিক করে নেয়। যতদিন পর্যন্ত টাউনের জনসংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে না যায় ততদিন পর্যন্ত এইরূপে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেশ ভাল ভাবেই কাজ হয়। জনসংখ্যা বেড়ে গেলে টাউনগুলি নগরের মর্যাদালাভের জন্য রাজ্যগুলির কাছে আবেদন জানায়।

টাউনশিপগুলির বিস্তৃতি সাধারণতঃ ছয় বর্গমাইলের মত ছিল। কাউন্টি ও টাউনের মধ্যবর্তী হিসাবে এই টাউনশিপগুলি উত্তরাঞ্চলের কতকগুলি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাকা রাস্তা তৈরী হবার পর থেকে চলাচলের সুবিধা বেড়ে যাওয়ায় টাউনশিপগুলি কাউন্টির মধ্যে মিশে যাচ্ছে।

মোটরযানের আবির্ভাবের ফলে জেলা ও গ্রাম ইত্যাদি প্রাচীন সমাজগোষ্ঠী-

গুলির উপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। পূর্বে জনসাধারণ পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে প্রতিবেশীর কাছে যেত, বাজার করে আসত বা গীর্জায় উপাসনা করতে যেত। কিন্তু আজকে যানবাহনের উন্নতিব ফলে দেখা যায় যে সহরের একই অঞ্চলের বাসিন্দারা ভিন্ন.ভিন্ন অঞ্চলে চাকরী করে, তাদের বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে থাকে বিভিন্ন এলাকায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন এলাকার স্কুল ও উপাসনা গৃহে তারা যাতায়াত করে থাকে। এব ফলে জনসাধাবণেব পূর্বেকাব সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। জনসাধারণ এখনও রাজনীতি ও দলীয় সংগঠনে অংশ গ্রহণ কবে, কিন্তু এখন বাজনীতি ও দলীয় সংগঠনেব পরিধি পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, অনেক অপবিচিত লোকের মধ্যে তাদের কাজ কবতে হয়।

পবিচিত পবিবেশে কাজ করার অনেক সুবিধা ছিল। আমেরিকানরা আজ তাদেব সেই নৈকট্য ও হারানো প্রতিবেশী-সম্পর্ককে ফিরে পাবার জন্য তাদের বর্তমান রীতিনীতি ও সামাজিক সংগঠনগুলির নানাভাবে সংস্কাব সাধন করতে চাইছে। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রীয় সবকাবও তার কাজকর্মকে যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীভূত করে দিতে চাইছে। যুক্তবাষ্ট্রীয় সবকারের কৃষি বিভাগও এ নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা কবেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবাবকে প্রতিবেশীব বন্ধনে গ্রথিত কবার জন্য কৃষি-শিক্ষা ও একসঙ্গে জলখাবারেব ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তারা এই প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। গ্রামেব বিদ্যালয়, বৈদ্যুতিক সমবায় সমিতি এবং রাজ্যেব বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকে মোটবে যাতায়াতেব সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নতুনভাবে বৃহত্তর প্রতিবেশী সম্পর্ক গড়ে তোলাব চেষ্টা চলেছে।

এই সমস্ত নতুন প্রতিষ্ঠানগুলি প্রয়োজনেব খাতিবে গড়ে তোলা হলেও সেগুলি কোন অংশে কম আমেবিকান নয়। প্রয়োজনে আমেবিকানবা নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে ভালবাসে। যান্ত্রিক উন্নতি আমেবিকার জীবনধারাব উপর কেন্দ্রীয়করণ চাপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমেরিকার জনসাধারণ কেন্দ্রীয়করণের সার্থকতা সম্পর্কে প্রগাঢ় সন্দেহ পোষণ করে। তারা বিকেন্দ্রীকরণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্যগ্র। তারা পূর্বেব প্রতিবেশী-পরিবেশের মধ্যে ফিবে যেতে চায়। তাদেব সহজাত মনোভাব থেকে তাবা মনে করে, সেই প্রতিবেশী-পরিবেশের মধ্যে থেকেই রাজনৈতিক জীবনের প্রাণশক্তি আহরিত হয়। ছোট বড় সরকার নিয়ে আমেরিকার রাজনৈতিক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। আমেরিকান জীবনের কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণকারী শক্তিগুলির ঘাতপ্রতিঘাতে আমেরিকার সেই রাজনৈতিক পদ্ধতির ক্রমোন্নতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

॥ সরকার ও ব্যবসায়ী ॥

অন্যান্য গণতন্ত্রী দেশগুলোর মত আমেরিকায়ও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলিতে যাকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা হয় সেরকম স্বাধীন

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এখানে অসংখ্য ছোট ছোট ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কৃষক ও স্বাধীন উপজীবিকাসম্পন্ন মানুষ আছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী বা অন্যান্য উপায়ে নিবৃত্তিমূলক প্রভাবসম্পন্ন বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানও আছে। এদের কার্যাবলীকে সময় সময় "একচেটিয়া প্রতিযোগিতা" বলা হয়ে থাকে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্বভাবতঃই একচেটিয়া হয়ে থাকে, যেমন টেলিফোন ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আবার সমবায় পদ্ধতিতে চলে; এখানকার লাভ অংশীদারদের পরিবর্তে ক্রেতারাই ভোগ করে। এখানে মুনাফা করে না এমন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। তারা সমাজ সেবায় ব্রতী। অংশতঃ বা সম্পূর্ণ-ভাবে এগুলি জনসাধারণের দানের সাহায্যে চলে। গীর্জা, বেসরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়, বিভিন্নধরণের সোসাইটি, ক্লাব এবং জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিক ইউ-নিয়নগুলি সবই এই ধরনের প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া স্কুল এবং পোষ্ট অফিসের মত সরকারী প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে সরকার ও ব্যবসায়ী স্বার্থের সম্পর্ক বেশ জটিল হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক পদ্ধতিরই তার নিজস্ব প্রয়োজন ও গতি-প্রকৃতি থাকে। সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্যসংক্রান্ত ও স্থানীয় ব্যবস্থা-গুলিরও এই জটিলতা সৃষ্টিতে অবদান রয়েছে। সরকারী সাহায্যের জন্য স্বভাবতঃই "ধনবাদী" জনসাধারণের কাছ থেকেই বেশীর ভাগ চাপ আসে। ছোট-বড় ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কের মালিক এবং কৃষক, সবাই সরকারী সাহায্য চায়। অনেক সময় এদের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধতা দেখা যায়। গীর্জা, কলেজ এবং সমবায়গুলিতে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রধানতঃ কর দেওয়ার হাত থেকে মুক্তি দিয়েই এই সাহায্য করা হয়। অন্যান্য ব্যবসা অপেক্ষা প্রকৃতিগত একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির উপরই সরকারী নিয়ন্ত্রণ বেশী কার্যকরী হয়েছে।

য়ুরোপে স্যুম্যান পরিকল্পনা যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, প্রথমতঃ সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমেরিকান শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ক্ষুদ্র পরিধি ও শুল্কের বেষ্টনী ভেঙ্গে বৃহত্তর বাজার সৃষ্টি করে ব্যবসা ক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করার জন্যই উভয় পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। এক রাজ্যের সঙ্গে অপর রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত বাধা তুলে দিয়ে ও বাধা আরোপ করা নিষিদ্ধ করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করেছিল।

এর পর, আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের তত্ত্বাবধানে সরকার আমেরিকার অর্থ-নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করে তোলার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই ব্যবসার পক্ষেও সহায়ক হয়। সরকার প্রায় মূল্যহীন ওয়ারবণ্ডগুলিরও দায় গ্রহণ করে। এমন কি যে সমস্ত রাজ্যে ফাটকাবাজরা ডলার প্রতি কয়েক সেণ্ট দিয়ে বণ্ড ক্রয় করেছে, তার দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করেছিল। সরকার প্রধানতঃ আমদানী শুল্ক বসিয়ে জনসাধারণ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং এই ভাবে বণ্ডের দেনা শোধ হয়।

এই ভাবে সরকার ঋণ পরিশোধ করায় নবীন যুক্তরাষ্ট্রে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন পাওয়া গিয়েছিল।

এই শুল্কে কেবল রাজস্বই বৃদ্ধি পায়নি, বিদেশী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ক'রে আমেরিকার নয়া শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকেও রক্ষা করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রথম হ'তেই বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে সাহায্য দিতে আরম্ভ করেছিল। খাল কেটে, ডাক চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরী করে এবং প'রে রেলপথ নির্মাণ করে সরকার বেসরকারী ব্যবসায়ে সাহায্য করেছিল। পশ্চিমাঞ্চলের যে সমস্ত স্থান সরকার ক্রয় করে বা জয় করে নিজের আয়ত্বাধীনে এনেছিল, তাদের বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিল। তুন্দ্রা অঞ্চলের অকর্ষিত ভূমি এবং উইসকনসিন ও মিনেসোটার বিস্তীর্ণ বনানীকে বহু বৎসর ধরে নির্বিবাদে ধ্বংস করা হয়েছিল, সেগুলিকে সংরক্ষণ অথবা মূল অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা চিন্তাও করা হয়নি। ভূমি ও বনানীর এই ক্ষতিসাধনে প্রাকৃতিক সম্পদের যে অপচয় ঘটেছিল সে বিষয়টা হিসাবের মধ্যে ধরলে দেখা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে যে কাঠ পাওয়া যেত ও গম উৎপন্ন হত তার খরচ পোষাত না। প্রথম একশত বা তদূর্ধ্ব বৎসর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পশ্চিমাঞ্চলে নতুন নতুন সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের হাতে সেগুলি তুলে দিত।

ব্যবসাক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ নজর রাখার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মাল চলাচল, টাকা জাল ও জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কোন সাহায্য প্রথমে প্রয়োজন হয় নি। পরবর্তীকালে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠার পর এবং দূরদেশের সঙ্গে ব্যবসা সৃষ্টি ও তা'তে জটিলতা বৃদ্ধির ফলে নতুন নতুন ভাবে আইনের অপপ্রয়োগ হতে থাকে, এবং সে সমস্ত ঘটনা নিবারণের জন্য ব্যবসায়ের উপর নজর রাখার প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে উল্লিখিত ধরণের অপপ্রয়োগের যে বিষয়টিতে জনসাধারণ সর্বাধিক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে সেটা হ'ল একচেটিয়া ব্যবসায়। ১৮৬১-৬৫ খৃষ্টাব্দের গৃহ-যুদ্ধের পর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি এত বড় হয়ে উঠে যে তাদের একচেটিয়া ব্যবসা-পদ্ধতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমেরিকান জনসাধারণ তখনও সীমান্ত সম্প্রসারণে সক্রিয় ছিল এবং পশ্চিমাঞ্চলের নূতন রাজ্যগুলিতে প্রত্যেকটি পরিবারই তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয়ে মোটামুটিভাবে স্বাধীন ছিল। কিন্তু গম বিক্রী করে অন্যান্য পণ্য ক্রয় করার সময় তারা দেখতে পেল যে, তারা একচেটিয়া ক্রেতা, একচেটিয়া রেলওয়ে ও একচেটিয়া সরবরাহকারীর হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। এতে তারা একচেটিয়া ব্যবসাগুলির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, এবং সেই থেকে আমেরিকার জনসাধারণ তাদের স্বকীয় পদ্ধতিতে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধতা করে আসছে।

বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বগ্রাসী অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকরা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পরের কা · ·ছর পার্টি সংগঠন করে। এই পার্টি রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রয়ত্ত করার দাবী তোলে। পোষ্টাল সেভিঙ ব্যাঙ্ক ও ক্রমিক আয়কর নির্ধারণ করার প্রস্তাবও পপুলিষ্টরা করে। "গ্রীন্ ব্যাক" বা কাগজের নোট চালু করে, এবং "রূপা থেকে অবাধে অর্থ তৈরী" করার স্বাধীনতা দিয়ে তারা ব্যাঙ্কের একচেটিয়া ব্যবসা ভঙ্গ করার প্রস্তাব করে। কিন্তু এই শেষোক্ত প্রস্তাবও নোট ছাড়ার মত কতকটা মুদ্রাস্ফীতিজনক, কারণ একটি ডলার তৈরী করতে যেটুকু রূপা ব্যবহৃত হবে, প্রকৃত প্রস্তাবে তার মূল্য এক ডলার হবে না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম জে ব্রায়ানের নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক পার্টি রূপা থেকে অবাধ মুদ্রা প্রণয়নের নীতির ভিত্তিতে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল। পপুলিষ্টরা ডেমোক্রেটিক দলকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু নির্বাচনে ব্রায়ান পরাজিত হয়েছিলেন।

কিন্তু পপুলিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ আমেরিকার প্রধান দল দুইটিকে একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে জাতীয় ভিত্তিতে কিছু না কিছু করবার জন্য অগ্রসর হতে হয়েছিল। এর ফলে শারম্যান এণ্টি-ট্রাষ্ট এ্যাক্টের সৃষ্টি হয়। এই আইন আন্তঃরাজ্য ব্যবসায় অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকস্বরূপ একচেটিয়া জোটের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে।

শারম্যান এ্যাক্ট গৃহীত হবার পূর্বে রাজ্যগুলি সাধারণ আইন প্রয়োগ করে একচেটিয়া শিল্প-ব্যবসাগুলিকে খানিকটা বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি যতই বড় হতে থাকে এবং দেশের বাইরেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, ততই তাদের উপর কর্তৃত্ব করা রাজ্য-সরকারগুলির কাছে অসম্ভব হয়ে উঠে। সাধারণ আইন বা শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের ধরণেই শারম্যান এ্যাক্ট রচনা করা হয়েছিল। আদালতের সিদ্ধান্ত এবং সময় সময় নতুন বিধানের মধ্যে দিয়ে এই আইনের বিশেষ প্রয়োগ নির্ধারিত হতে থাকে। সুতরাং, কালক্রমে ট্রাস্ট বিরোধী-আইন সাধারণ আইনের মত নমনীয় হয়ে উঠে। কারণ, অসংখ্য উপায়ে অনুষ্ঠিত অন্যায় নিবারণ করতে হলে এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

ট্রাষ্ট-বিরোধী আইন প্রয়োগের নানা উত্থান-পতন ও ব্যাপকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক প্রচেষ্টার কথা ধরলেও দেখা যাবে যে, য়ুরোপে সচরাচর প্রচলিত ব্যবস্থা হতে আমেরিকা স্বতন্ত্র এক নীতি অবলম্বন করেছে। কি ডেমোক্র্যাট, কি রিপাবলিকান, আমেরিকার প্রতিটি লোক শারম্যান এ্যাক্টকে আমেরিকার স্বাধীনতার অন্যতম ভিত্তিস্তম্ভ মনে করে। যারা এই আইন ভঙ্গ করেছে বলা যেতে পারে, তারাও সেটা করেছে আইনের ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়ে, সেই আইনের পবিত্র মূলনীতিকে অবজ্ঞা করবার জন্য নয়। যতই প্রতারণামূলক

মনোভাব থাক না কেন, তাদের উৎপত্তি অবাধ প্রতিযোগিতার মৌলিক আদর্শ থেকেই, সে আদর্শ আমেরিকান চিন্তাধারায় দৃঢ়মূল হয়ে আছে।

আমেরিকার ব্যবসায়ীদের যতই আদর্শচ্যুতি দেখা যাক না কেন, এ'ক্ষেত্রে আমেরিকার একটি নিজস্ব আদর্শ রয়েছে। এই আদর্শ আমেরিকান চিন্তাধারাকে অন্যান্য অনেক স্বাধীন জাতির চিন্তাধারা থেকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। আমেরিকান জনসাধারণ কার্টেল ও একচেটিয়া ব্যবসায়কে নৈতিক দিক্ দিয়ে অন্যায় এবং অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে আত্মঘাতী বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে, ট্রাষ্ট-বিরোধী আইনটিকে সময় সময় যতই জীর্ণ ও সেকেলে মনে হোক্ না কেন, এখনও সেটা স্বাধীন মানুষের স্বাধীনতা সংরক্ষণের বৈজয়ন্তী হয়ে আছে; সুতরাং আমেরি-কান প্রগতিতে এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নব প্রতিষ্ঠিত য়ুরোপীয়ান কয়লা ও ইস্পাত কমিউনিটির সনদে দৃঢ় একচেটিয়া বিরোধী আইন রয়েছে যাতে করে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি ক'রে শিল্পগুলিকে কারিগরি বিষয়ে উৎকর্ষসাধনের যোগ্য করা হয়। আমেরিকার জনসাধারণের কাছে এটাই যথার্থ প্রগতির দৃষ্টান্ত মনে হয়। নানা প্রচেষ্টা ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে আমে-রিকার জনসাধারণ দেখেছে, সমৃদ্ধতর ও অধিকতর উৎপাদনশীল "ধনবাদী" পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী মারাত্মক ব্যাধি সম্বন্ধে মার্ক্স ও তাঁর অনুবর্তীরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন, সদাসর্বদা সরকারকে একচেটিয়া ব্যবসায়ের আবির্ভাব বন্ধ করার কাজে নিয়োজিত করেই তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্য-সরকারগুলি বিশেষতঃ ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আরও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ পুলিশী কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে। পূর্বের সাদাসিদে দিনগুলিতে কৃষকরা চৌরাস্তার উপরেও দোকানে সমস্ত বেচা-কেনা করত। তখন শততাই ছিল শ্রেষ্ঠ নীতি, কেননা সুনাম না থাকলে দোকানীর ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু, ব্যবসা যতই সারা দেশে প্রসারিত হয়ে পড়ল এবং নতুন ও অদৃষ্টপূর্ব সমস্ত পণ্য বাজারে বিক্রয়ার্থ আমদানী হতে লাগল, ক্রেতারা ততই দিশেহারা হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় তাদের সব রকমে ঠকিয়ে নেওয়া সহজ হয়ে উঠেছিল ও তাতে লাভও হত বেশী। এরই ফলে প্রসাধন ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে মারাত্মক বিষ ব্যবহার এবং প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করে আইন প্রণীত হয়। এই আইনের ফলে খাদ্য ও ঔষধাদির প্যাকেটের উপর তার ভিতরের মালের নীট ওজন, এবং সেটা তৈরীর জন্য ব্যবহৃত উপাদানের তালিকা লিখে দিতে হয়।

রাজনৈতিক দিক থেকে প্রতারণার বিরুদ্ধে এই আইন প্রণয়নের সার্থকতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জনসাধারণের প্রত্যেকেই ক্রেতা, এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে তারা সংগঠিত ও শক্তিশালী না হওয়ায় এই ধরণের আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অপরপক্ষে উৎপাদকদের সুসংগঠিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং লবী মহলে নিজেদের প্রতিনিধির মারফৎ ওয়াশিংটন ও

বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সময় সময় শিল্প-বিশেষের শীর্ষস্থানীয়েরা উৎকৃষ্ট পণ্যকে ভেজাল দ্রব্যের প্রতিযোগীতা থেকে রক্ষা করার জন্য অবাধ বাজার থেকে নিয়ন্ত্রিত বাজার পছন্দ করে। তখন তারা রক্ষামূলক আইন প্রণয়ণের জন্য উৎসাহী হয়ে পড়ে। প্রয়াশঃই জনমতের চাপে পড়ে এই সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির প্রবন্ধ যেমন একদিকে জনসাধারণের দাবীকে জোরদার করেছে, তেমনি অপর দিকে শিল্পসংস্থাগুলি এই সমস্ত আইন প্রণয়ণের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে।

সিকিউরিটি-বাজারে সততা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজ-ভেল্টকে তাঁর শাসনকালের প্রথম ভাগে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বাজারে ঋণপত্র ছাড়ে, ১৯৩৩ সালের সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট এবং ১৯৩৪ সালের সিকিউরিটিস অ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট-এর মধ্য দিয়ে তাদের কোম্পানীর যথার্থ অবস্থার বিবরণ প্রকাশে বাধ্য করা হয়। অন্যথায়, মিথ্যা বিবরণের জন্য ক্ষতি হলে তার সমুদয় দায়িত্ব হবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর। অর্থনৈতিক বাজারের উপর 'নিউ ডিল' পর্যায়ের অপর যে আইনটির বিশেষ প্রভাব পড়েছে সেটা হচ্ছে ১৯৩৫ সালের হোল্ডিং কোম্পানীর অ্যাক্ট। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্তরে স্তরে কোম্পানী বিন্যাস করে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার বন্ধ করা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিটি কোম্পানী পরবর্তী নিম্ন স্তরের কতকগুলি কোম্পানীর স্টক নিয়ন্ত্রণ করত। এরই ফলে এই সমস্ত জটিলতাসম্পন্ন একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কারচুপি করে সমস্ত মুনাফা নিজেদের আত্মসাৎ করা সহজ হত এবং সাধারণ লগ্নীকারীরা ফাঁকে পড়ে যেত।

যে সমস্ত অর্থবিনিয়োগকারী কোম্পানী মিথ্যা বিজ্ঞাপন স্টকের বাজারে কার-চুপি করে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করত, এবং আজগুবি সমস্ত হোল্ডিং কোম্পানী খাড়া করে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করত, তারা মরিয়া হয়ে নিয়ন্ত্রণ আইনগুলির বিরো-ধিতা করেছিল। এমার ডেনিয়েলসন নামে একজন সংবাদবাহীবালক এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, হোল্ডিং কোম্পানী অ্যাক্টের বিরুদ্ধে টেলিগ্রামে প্রতিবাদ জানা-নর জন্য সে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সইপিছু তিন সেণ্ট হিসাবে পেয়েছিল। এমনও দেখা গিয়াছে যে, সুদূর অঞ্চল হতে এই আইনের প্রতিবাদে ওয়াশিংটনে গাদা গাদা টেলিগ্রাম আসত, এবং যাদের নামে টেলিগ্রাম আসত তারা কিন্তু সমাধির নীচে চিরবিশ্রামে শায়িত রয়েছে। প্রতিরোধের এইসব অসাধু পদ্ধতি আইন পাশ করার আরও সুবিধা করে দেয়।• এই আইনের ফলে অর্থনৈতিক বাজারের জটিলতা দূর হয়েছিল এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক শক্তির জোরেই এই আইন পাশ করা সম্ভব হয়েছিল।

সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ী স্বার্থের আর একটি সম্পর্ক রয়েছে বিনামূল্যে কারিগরি বিষয়ে সাহায্য করার ক্ষেত্রে। এ কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যে সমস্ত সংস্থা স্থাপন করেছিলেন, কৃষি-গবেষণা ও শিক্ষা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান সেগুলির মধ্যে প্রথম

গড়ে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এখন গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্যাদি, আবহাওয়া এবং স্বদেশ ও বিদেশের বাজারের খবরাখবর সরবরাহ করে থাকে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার কপিরাইট ও পেটেন্ট যাতে লঙ্ঘিত না হয় তার ব্যবস্থাও করে থাকে।

সিকিউরিটির দাম একেবারে পড়ে যাওয়ার ফলে ব্যবসায়ী কর্পোরেশনগুলি যাতে দেউলিয়া হয়ে না যায় তজ্জন্য তাদের টাকা ধার দেবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট হুভারের শাসনকালে "রিকনস্ট্রাকশান ফিন্যানস্ কর্পোরেশান" গঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয় এবং মেটালস রিজার্ভ এজেন্সী, রাবার কোম্পানী ও ডিফেন্স সাপ্লাইজ কর্পোরেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এদের মধ্যে ফিন্যান্স কর্পোরেশন কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছিল। এ ছাড়া, বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য অর্থ ধার দেওয়ার প্রয়োজনে ১৯৩৪ সালে আমদানী বিষয়ক (এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট) ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হয়। বাড়ী বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের হাউসিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সুদের হার কমিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। মহাজনদের বীমার বন্দোবস্ত করে দিয়ে ঝুঁকি কমিয়ে দেবার ফলেই এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অল্প সুদে অর্থ ধার দেবার ব্যবস্থাকল্পে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান এড্‌মিনিস্ট্রেশান গঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কেবল পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ব্যাঙ্কার (অর্থের যোগানদার) নয়, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বীমা কোম্পানীও বটে। বেকার, বৃদ্ধ ও যুদ্ধ ফেরতদের জন্য বীমার ব্যবস্থা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বেসরকারীভাবে প্রদত্ত বাড়ীর জন্য ঋণ, ছোটখাট ব্যবসায়ী উদ্যোগ ও খামার প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছে।

সরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী উদ্যোগের যথাযোগ্য ভেদরেখা নিয়ে আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনে প্রায়ই নানা ধরনের প্রশ্ন উঠতে দেখা যায়। যেখানে বেসরকারী উদ্যোগে সম্ভব, যেমন জলবিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র, সেখানে রিপাবলিকানরা সাধারণতঃ সরকারী উদ্যোগ পছন্দ করে না। অপরদিকে ডেমোক্র্যাটরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরিক্ষা চালিয়েছে, যেমন চালিয়েছিল "নিউ ডিলের' মধ্য দিয়ে টেনেসী ও কলাম্বিয়া নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। এর আবশ্যিক উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারী উদ্যোগের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য "মানদণ্ড" স্থাপন করা।

কিন্তু কি ডেমোক্র্যাট, কি রিপাবলিকান, কার্যক্ষেত্রে কারও সমাজতন্ত্রের দিকে আসক্তি দেখা যায় না। সরকারী পরিচালনা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট কারণ না থাকলে কোন দলই সরকার কর্তৃক ব্যবসা অথবা শিল্প পরিচালিত হতে দেবার পক্ষপাতী নয়। তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতেই বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হয়।

প্রথমতঃ, যেখানে জনসাধারণ ন্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা আবহাওয়াব পূর্বভাষ প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন চায়, অথচ যে সমস্ত ক্ষেত্রে উপকৃত ব্যক্তিদেব কাছ হতে সে বাবদ অর্থ আদায়ের যথোচিত ব্যবস্থা নাই, সে ক্ষেত্রে কার্যসিদ্ধির জন্য সরকারের ডাক পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণ যদি সরকারী বিদ্যালয় অথবা বৃদ্ধ-বয়সের ব্যবস্থার জন্য বীমা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করার দাবী তোলে, এবং সে ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ অপেক্ষা সরকারী ব্যবস্থাপনায় যদি অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে কার্য নিষ্পন্ন হয়, তাহলে সরকার সেখানে সে বিষয়ের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

তৃতীয়তঃ, ডাক ব্যবস্থা অথবা টেলিফোনের মত বেসরকারী মালিকানাধীন নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাগুলি জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না বলে মনে হলে জনসাধারণের তরফ হতে সে প্রতিষ্ঠানে সরকারী মালিকানার দাবী উঠে। এক্সপ্রেস কোম্পানীগুলির (যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ডাক লেন-দেন ও জরুরী চিঠিপত্র বিলি করত) কার্য অসন্তোষজনক হওয়ার ফলেই পার্শেল পোষ্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। আমেরিকার অধিকাংশ জল সরবরাহ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি মিউনিসিপ্যাল সরকার তাদের কর্তৃত্বাধীনে এনেছে। জনসাধারণের অসন্তোষ বারণ ও রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য টেলিফোন কোম্পানীগুলি প্রায়ই নিজেদের উৎকর্ষ সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। রেলপথ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার ও আকাশ পথের মত স্বভাবিক একচেটিয়া অথবা প্রায় —একচেটিয়া ব্যবস্থাগুলি আমেরিকার জনসাধারণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে না রেখে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করে। সরকার কর্তৃক নিজ হস্তে মালিকানা নিয়ে নেবার সম্ভাবনা আছে বলেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে পরিচালনার দায়িত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যধিক স্বেচ্ছাচার করতে পারে না বা তেমন দুর্নীতি তাতে থাকে না।

এই বিশেষ জটিলতাসম্পন্ন কার্যক্ষেত্র সম্পর্কে আমেরিকানদের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী সরকার ও ব্যবসায়ী স্বার্থের মধ্যেকার এই আদর্শগত ভেদরেখার ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রতিরক্ষা কর্মসূচীসহ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের বাজেটের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন সমস্ত লেন-দেনের ব্যবস্থা থাকে যার দ্বারা ব্যবসায়ীজগত সরাসরিভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। এরকম অসংখ্য ছোট-বড় ব্যবসায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমেরিকানরা সব সময়ে চায় মধ্যবিত্ত হয়ে থাকতে, ব্যবসায়ে অবাধ উদ্যোগ পদ্ধতি অব্যাহত রাখতে এবং সাধারণ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হতে। মধ্যপন্থা পরিত্যাগ করে ফ্যাসিষ্ট বা কমিউনিষ্ট পন্থা প্রবর্তন সম্পর্কে রাজনৈতিক বাদানুবাদ এখানে কখনও দেখা যায় না। এখানে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক হয়ে সত্যকার মধ্যপন্থা কি তাই নিয়ে।

ব্যক্তির অধিকার

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আছে: "সৃষ্টিকর্তা মানুষকে কতকগুলি অলঙ্ঘ্য অধিকারে ভূষিত করেছেন। এই সমস্ত হচ্ছে জীবনধারণ, স্বাধীনতা ভোগ ও সুখানুসরণের অধিকার। এই সমস্ত অধিকার সংরক্ষণের জন্যই মনুষ্য সমাজে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৪৬ সালে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে যে কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন, তা'তে আরও স্পষ্টভাবে চার ধরনের অধিকার সংরক্ষণের উপায় সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়। এই চার ধরনের অধিকার হচ্ছে:

১) ব্যক্তির নির্বিঘ্নতা ও নিরাপত্তার অধিকার;

২) প্রজাধিকার ও তার সুযোগ সুবিধার অধিকার;

৩) বিবেকের স্বাধীনতা ও তার অভিব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার,

৪) সমান সুযোগ সুবিধার অধিকার।

সরকার বা অন্য নাগরিক, বা বেবারী থেকে বসন্তের প্রকোপ অবধি সাধারণ দুর্যোগ থেকে রক্ষা নিয়ে অধিকারগুলিকে আরও নানাভাবে ভাগ করা যায়। রাজনীতি ও সরকার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার সময় এই সমস্ত শ্রেণীবিন্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয় কারণ, জীবনধারণ, স্বাধীনতা ভোগ, অথবা সুখানুসরণের অধিকারের বিরুদ্ধে যে তিন শ্রেণীর প্রতিবন্ধক রয়েছে, সরকার তাদের সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে মোকাবেলা করে, এবং তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রকৃতি আছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য বা স্থানীয় সরকারগুলি কারও অধিকার লঙ্ঘন করলে শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের ভিত্তিতে আদালত তার বিচার করে। বে-আইনীভাবে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা হ'লে কোর্ট সে ব্যক্তিকে মুক্তি দেবার নির্দেশ দিতে পারে, এবং প্রকৃতপক্ষে সরকার কখনও আদালতের সেই নির্দেশ অমান্য করে না।

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করলে সাধারণ আইন অনুযায়ী তা বে-আইনী হয়, অথবা বিধানসভা প্রণীত আইন বলেও সেই কাজকে বে-আইনী ঘোষণা করা যায়। গীর্জা বা অন্যান্য নৈতিকতার মানদণ্ডে অনেক আচরণ অপ্রিয় হিসাবে ধিকৃত হলেও সে সমস্ত আচরণ কখনও বে-আইনী ঘোষিত হয় নি। বর্ণগত ও ধর্মীয় ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ অনেক সময় এই পর্যায়ে পড়ে, এবং কোন কোন বৈষম্যমূলক আচরণকে আইনতঃ দণ্ডার্হ ঘোষণা করার প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক বাদানুবাদ হয়ে থাকে।

সমাজের অংশ ও রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে সাধারণ শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার নাগরিকদের রয়েছে। কেবল শত্রুর বোমাবর্ষণ নয়, মহামারী, অগ্নির ধ্বংসলীলা বা বন্যার তাণ্ডব থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকারও তাদের

আছে। ইংল্যাণ্ডের সাবেকী সাধারণ আইন অনুযায়ী অনাহারের সম্ভাবনা থাকলে সেই ব্যক্তির সরকারী খয়রাত লাভের অধিকার আছে। রক্ষা ব্যবস্থা লাভের ক্ষেত্রে মানুষের অধিকারের সঠিক সীমা-রেখা নির্ণয় নিয়েই রক্ষণশীল ও উদারতন্ত্রীদের মধ্যে মৌলিক মতানৈক্য দেখা যায়। ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান পার্টিরও এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে. পার্টি দুইটির অভ্যন্তরে উপদলগুলির মধ্যেও মতানৈক্য আছে।

বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আমেরিকায় যেদিন এক নতুন স্বাধীন জাতির অভ্যুদয় হল, সেদিন সেই নব প্রতিষ্ঠিত সরকারের অবিচার ও অত্যাচারের হাত হতে তাদের অধিকারকে নির্বিঘ্ন করে তোলাই আমেরিকার জনসাধারণের প্রধান চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রচলিত রীতি ও সাধারণ আইনের মধ্যে দিয়েই তখন তাদের অন্যান্য অধিকারগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নির্বিঘ্ন ছিল। সেজন্য সেদিন তারা পরবর্তী সময়ের মত সে সব অধিকার সংরক্ষণের জন্য তত উৎকণ্ঠিত ছিল না।

আমেরিকার নাগরিকেরা সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রায় সর্বপ্রকার দৈনন্দিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ শাসনতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করেছে। কিন্তু অধিকারগুলির সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে সব সময়ে নানা বিতর্কমূলক প্রশ্ন উঠে, এবং অধিকার থাকলে কিভাবে সে অধিকার প্রয়োগ করা হবে সে প্রশ্নের মীমাংসা আদালতগুলিকে করে দিতে হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৫১ সালে সুপ্রীম কোর্ট শারিরীক উৎপীড়নকে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম ও চতুর্দশ সংশোধনের বিরোধী ঘোষণা করেছিল। শাসনতন্ত্রের এই সমস্ত সংশোধনের ফলে সরকারের পক্ষে যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিরেকে ব্যক্তির ধনপ্রাণ ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ হয়। অপরাধী সন্দেহ ক'রে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য সহিংস পদ্ধতি প্রয়োগ করবার অপরাধে একজন পুলিশ অফিসার তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল। এই ভাবে এইখানে প্রাচীন অধিকারের নতুন ব্যাখ্যা হয়েছে।

চতুর্দশ সংশোধনে বলা হয়েছে যে, কোন রাজ্য কোন ব্যক্তিকে আইনের অপক্ষপাত আশ্রয় হতে বঞ্চিত করবে না। একজন লোককে খুনের দায়ে বন্দী করা হয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি রাজ্যের সুপ্রীম কোর্টে তার আপীল পাঠাতে চাইলে সেখানকার জেলের নিয়ম অনুযায়ী জেল রক্ষক তার সেই আপীল পাঠাতে অস্বীকার করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীম কোর্ট তখন রায় দেয় যে, এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনের অপক্ষপাত আশ্রয় লাভ করতে দেয় নি। সুপ্রীম কোর্ট সেই রাজ্যের প্রতি নির্দেশ দেয় যে, হয় আপীল অনুসারে সেই ব্যক্তির উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে, নতুবা তাঁকে মুক্তি দিতে হবে।

শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধন জনসাধারণকে অযৌক্তিক খানাতল্লাসী ও ক্রোকের হাত থেকে রক্ষা করে। সুতরাং কোন্ তল্লাসী বা ক্রোক অযৌক্তিক, সেটা আদালতগুলিকেই স্থির করতে হয়। এক মোকদ্দমায় দেখা যায়, একজন মাদকদ্রব্য বিক্রেতা কিছু মাদক ঔষধ তার এক বন্ধুর ঘরে লুকিয়ে রেখেছে এই সন্দেহে পুলিশ

ওয়ারেণ্ট ছাড়াই সে ঘর তল্লাসী করে, এবং ঔষধগুলি খুঁজে পায়। সুপ্রীম কোর্ট পুলিশের এই কাজকে বে আইনী ব'লে ঘোষণা করে। যাকে সন্দেহ করা হয়েছে, সে যতই অপরাধী হোক না কেন, আইন কিছুতেই বে-আইনীভাবে তার গ্রেপ্তার অনুমোদন করতে পারে না। এ না হলে নির্দোষীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে।

নতুন উদ্ভূত মানুষের অধিকার ভঙ্গের বিষয়গুলিকে উৎপাটিত করার জন্য, বা প্রাচীন ও অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, অথচ সম্প্রতি জনসাধারণের বিবেককে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে, এমন সব মানব-অধিকার-বিরোধী বিষয়গুলি নির্মূল করার জন্য কোর্টগুলিকে প্রায়ই ন্যায্য বিচারের অধিকারগুলির পুনর্ব্যাখ্যা দিতে হয়।

ফ্লোরিডা রাজ্যে দু'জন নিগ্রো বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে শাস্তি পেয়েছিল। যে গ্রাণ্ড জুরি ও ট্রায়াল জুরির সাহায্যে তাদের বিচার হয়েছিল তা গঠিত হয়েছিল শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে। রাজ্য আদালত এই বিচারের রায় অনুমোদন করেছিল, কিন্তু জুরিরা সবাই শ্বেতাঙ্গ ছিল ব'লে সুপ্রীম কোর্ট সর্ব-সম্মতিক্রমে সেই রায় নাকচ করে দেয়। এই বিচারের আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। ফরিয়াদী পক্ষ হতে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোন স্বীকারোক্তি পেশ না হওয়া সত্ত্বেও সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, তারা স্বীকারোক্তি করেছে। সুপ্রীম কোর্টের দু'জন বিচারক এতে বলেন যে এই ধরণের সংবাদ প্রকাশ স্বতঃই ন্যায় বিচারে বাধা সৃষ্টি করে।

জুরী তার সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে সংবাদপত্রে কোন অভিযোগের দোষ-গুণের বিচার হতে পারবে না, ব্রিটেনে যেমন বিবাদীদের এই অধিকার আছে, আমেরিকায় এখনও সেরকম কিছু নেই। ফ্লোরিডার এই মামলার মধ্যে আমরা বিবাদীর সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূচনা দেখতে পাচ্ছি।

কোন কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে সাক্ষীর ফৌজদারীতে সোপর্দ হবার সম্ভাবনা থাকলে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধন অনুযায়ী সাক্ষী সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বী-কৃত হতে পারে। কিন্তু কমিউনিষ্ট চাঁইরা যখন জবরদস্তি করে সশস্ত্র পন্থায় সর-কারের উচ্ছেদ সাধনের অভিযোগে ১৯৪০ সালের স্মিথ এ্যাক্ট অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তখন কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট সেই আইনকে শাসনতন্ত্রবিরোধী বলে ঘোষণা করতে অসম্মত হয়। সুতরাং কংগ্রেস নিযুক্ত কোন অনুসন্ধান কমিটি সকাশে সাক্ষ্যদানের জন্য আহূত কোন ব্যক্তি কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তার সংস্রব সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করতে পারে; কারণ সে বলতে পারে যে, কমিউনিষ্ট কার্যকলাপ দণ্ডনীয় অপরাধ বিবেচিত হওয়ায় তাদের সঙ্গে সংস্রবের কথা স্বীকার করলে সেও অভিযুক্ত হতে পারে। সুপ্রীম কোর্টও একথা স্বীকার করেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যতই নির্দোষ মনে হোক না কেন, যদি সেই তথ্য কোন দণ্ডনীয় অপরাধের প্রমানাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, যার ফলে সাক্ষীর অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই সমস্ত তথ্য প্রকাশে সাক্ষী অসম্মত হতে পারে।

এই পঞ্চম সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে সাক্ষী কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের অভিযোগে জড়িয়ে পড়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। কিন্তু এতে চাকরী যাবার ভয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কারণ মালিক স্বাভাবতঃই এটাকে এ রকম ধরণের স্বীকৃতি বলে মনে করে—সত্য উদ্‌ঘাটিত হ'লে তদ্বারা ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

প্রথম সংশোধনীতে ধর্মীয় স্বাধীনতার যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল সময় সময় তার পুনর্ভাষ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অনেক ধর্মপ্রচারক রাস্তার মোড়ে বা পার্কে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে চায়। তাদের মধ্যে সময় সময় কতকগুলি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক দেখা যায়। তাদের বক্তৃতা থেকে দাঙ্গা হবারও সম্ভাবনা থাকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পুলিশরাই ঠিক করে নেয় কতটুকু ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, আর কতটুকু দাঙ্গার উত্তেজনা। এ ক্ষেত্রে আরও একটা অসুবিধা হচ্ছে, ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগে চোর বাটপাড়েরাও ধর্মের ভেক ধরে স্বার্থসিদ্ধি করে নিতে পারে।

আমেরিকায় সংবাদপত্রসমূহ অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীদের সমালোচনার ক্ষেত্রে তা সেটা ন্যায্য অথবা অন্যায্য যাই হোক না কেন, তাদের বহুল পরিমাণে স্বাধীনতা আছে। সংবাদপত্রের এই স্বাধীনতা এখানে গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক রক্ষাকবচ হিসাবে বিবেচিত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এই আইনগত ভিত্তি থেকে কিন্তু ইচ্ছামত সংবাদপত্র মুদ্রণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসেনি। মুদ্রণ ক্ষেত্রে কারিগরি উৎকর্ষের ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, বড় বড় সংবাদপত্রগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প মাশুলে বিজ্ঞাপন ছাপাতে সমর্থ হয় এবং ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। ফলে বহু ক্ষেত্রে একাধিক সংবাদপত্র টিকে থাকতে পারছে না। এভাবেই জনসাধারণকে স্থানীয় সংবাদপত্রে পরস্পরবিরোধী যুক্তি পাঠ করবার সুযোগ হারাতে হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হতে উদ্ভূত এই বাস্তব সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থাগুলি কি করবে তা ঠিক করতে পারছে না। সময় সময় ন্যায়-বিরুদ্ধ পদ্ধতিতে প্রতিযোগী সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টার অভিযোগে সংবাদপত্র বিশেষকে ট্রাষ্ট-বিরোধী আইনে অভিযুক্ত করা হয়। বেশীর ভাগ সংবাদপত্রগুলি কিন্তু ন্যায়-বিরুদ্ধ পদ্ধতিতে একচেটিয়া হয়ে উঠে নি। অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই তাদের সৃষ্টি হয়েছে। একারণেই, ছোটখাট সংবাদপত্রগুলিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত। সুতরাং এই সমস্যার যদি কোন সমাধান থাকে তবে তা রাজনীতির মধ্যে নয়, ছোট-খাট সংবাদপত্রগুলির উপযোগী নতুন ধরণের কারিগরি কৌশল উদ্ভাবনের মধ্যে।

যে ক্ষেত্রে সরকার পুরাপুরিভাবে বৈষয়িক অথবা সাময়িক কোনরূপ অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিতভাবে করতে পারে না, সে ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক অধিকার কি'ভাবে তার সীমা অতিক্রম ক'রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এই আংশিক বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে তা বোঝা যায়। বর্ণগত বা ধর্মীয় পার্থক্যের ক্ষেত্রেও এ'রকম বহু সমস্যা দেখা যায়।

বিভিন্ন জাতির জনসাধারণের আগমনে মার্কিন জাতির সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর-

পশ্চিম ইউরোপ হতে আগত জনগোষ্ঠী অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। দেশের বেশীর ভাগ বিষয়-সম্পত্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদেরই হাতে। ধর্ম ও আচার-ব্যবহার, অথবা সর্বোপরি বর্ণগত পার্থক্যের ফলে অন্যান্য গোষ্ঠিদের যখন সহজেই চেনা যায় তখন তাদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ হওয়ার সম্ভাবনা সমাধিক। নিগ্রো জাপানী, চীনা ও মেক্সিকান, রেড ইণ্ডিয়ান, এবং রিও গ্র্যাণ্ড ভ্যালির প্রথম স্পেনিশ ঔপনিবেশিকদের বংশধর হিসপানো-আমেরিকানরা সবাই একভাবে না একভাবে এই বৈষম্যমূলক আচরণ লাভ করে। ইহুদী, ক্যাথলিক এবং জিহোভাপন্থীদের মত কতকগুলি ছোট-খাট প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠিভুক্তদেরও এই বৈষম্য ভোগ করতে হয়। পূর্ব ও দাক্ষিণ য়ুরোপের জনসাধারণ যতদিন পর্যন্ত নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে নিজেদের ভাষা ব্যবহার করতে থাকবে, ততদিন তাদের প্রায় সকলেরই এখানে বিদেশীর মত আচরণ লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

বেকারীর আশঙ্কা সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের একটি প্রধান কারণ। চাকুরী লাভের ব্যাপারে নিজেদের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকরা বর্ণ, ধর্ম বা জাতিগত পার্থক্যের সুযোগ গ্রহণ করে এবং এই প্রভেদের ভিত্তিতে তারা স্বার্থ-সিদ্ধি করতে চায়। ১৯৪০ সালের পর দীর্ঘকাল আমেরিকায় ব্যাপকভাবে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হওয়ায় চাকুরীর ক্ষেত্রে এই ধরণের একচেটিয়া অধিকার বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, এমন কি নিগ্রোদের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান নিযুক্ত "নাগরিক অধিকার তদন্ত কমিটি" তাদের রিপোর্টে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের ভোগ করতে হয় এরকম বিবিধ অবিচারের উল্লেখ করেছিল। সংখ্যালঘুদের উপর যে সমস্ত অবিচার হচ্ছে সেগুলি অনুধাবন ক'রে তার প্রতিবিধানের পন্থা সুপারিশ করাই ছিল এই কমিটির বিশেষ দায়িত্ব। সংখ্যা-লঘুদের উপর অবিচারের বিস্তৃত বিবরণী প্রসঙ্গে কমিটি বলেছিল, আমেরিকান জীবনযাত্রায় স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার বিস্তার অবকাশ রয়েছে। এমন কি সংখ্যালঘুরাও তা থেকে বঞ্চিত নয়, এবং নাগরিক অধিকারগুলি যতই দিন যাচ্ছে ততই নিরাপদ হয়ে উঠছে।

ব্যক্তির নিবিঘ্নতা ও নিরাপত্তার অধিকার প্রসঙ্গে এই কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে যে, এই শতাব্দীর প্রথম দশ বৎসরে দাঙ্গাজনিত মৃত্যুর হার ছিল বৎসরে দেড়-শতের ও অধিক, কিন্তু ১৯৪০ সালের পর সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ছয়েরও অনধিক। তবে সম্প্রতি যত লোক এভাবে নিহত হয়েছে, তদপেক্ষা কয়েকজন অধিক লোককে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা জনতার হাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছে। টাসকেগী ইনস্টিটিউটে লিঞ্চিং (জনতার বে-আইনী দণ্ড, প্রায়শঃই মৃত্যু) সম্বন্ধে সমস্ত খবর সতর্কতার সঙ্গে সংকলিত হয়ে থাকে। সেখানকার রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এমন কি ১০৪৬ সালের পূর্ববর্তী সাত বৎসরে ২২৬ জন মানুষকে জনতার কবল থেকে রক্ষা করে তাদের মরণের হাত হতে বাঁচান হয়েছে। এদের মধ্যে নিগ্রোদের সংখ্যা দুই শতাধিক।

শিক্ষা ও সমৃদ্ধির প্রসার এবং শেরিফ ও পুলিশের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ফলে জনতার দাঙ্গাহাঙ্গামা অনেকাংশে কমে যায়। সম্প্রতি দেখা গেছে দাঙ্গাহাঙ্গামার বিরুদ্ধে যখন শেরিফরা দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন, তখন উচ্ছৃঙ্খল জনতা তাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যায় নি।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান জনতার বে-আইনী দণ্ডদানকে (লিঞ্চিং) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আওয়াতাধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য করার জন্য কংগ্রেসে সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সেনেটের সভ্যরা দীর্ঘকালীন বিতণ্ডা সৃষ্টি করে এই প্রস্তাবটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়।

ব্যক্তিগত নির্বিঘ্নতা ও নিরাপত্তার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় বিভিন্ন প্রকারে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পুলিশ নির্যাতন ও আদালতের পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহারও রয়েছে। এই সমস্ত অপরাধ প্রায়শঃই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের বিরোধী এবং সুপ্রীম কোর্টে এদের বিচার হয়। পিওনেজ বা দণ্ডভোগী অসোমীদের দাস-করণের মত কদাচ দৃষ্ট বিষয়গুলিও সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারে। জনসাধারণ যেখানে দরিদ্র, ভয়ার্ত ও তাদের অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ, সেখানেই এই পিওনেজ চলতে পারে। কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক কাউকে ঋণ আবদ্ধ করে যতদিন না সে ঋণ শোধ করে, ততদিন তাকে ঋণদাতার জন্য কাজ করতে বাধ্য করানোকেই পিওনেজ বলে। বংশগত পরিচয় যাই থাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সবাই তার নাগরিক হতে পারে। কিন্তু তাদের সন্তান সন্ততিরা জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হলেও এশিয়া থেকে আগত অনেক লোক এখানকার প্রজাধিকার পায়নি। যে সমস্ত বিদেশী লোক এখনও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারেনি, ক্যালিফোর্নিয়া এবং পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি রাজ্যে তারা খামারের মালিকানা লাভ করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের সন্তান সন্ততির জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক ও খামারের মালিক হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই সব খামার হতে এই সমস্ত বিদেশীর ভরণ-পোষণও আইনতঃ নিষিদ্ধ। আইনতঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকার কোন একটি চুক্তি সম্পাদন করে অথবা বহিরাগত সম্পর্কিত আইনের সংশোধন করে এই বৈষম্য দূর করবার ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু জনমত অধিকতর পরসহিষ্ণু হয়ে না ওঠা পর্যন্ত রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

ভোটের অধিকার প্রথমে আইনগত নানা বিধিনিষেধে সীমাবদ্ধ ছিল, একের পর একে সেই সমস্ত বিধি নিষেধকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দক্ষিণের কতক অঞ্চলে জনতার সহিংস বিক্ষোভের ভয়ে নিগ্রোরা ভোটের অধিকার গ্রহণ করে নি, কিন্তু ১৯৫২ সালের নির্বাচনের হিসাবে দেখা যায়, দক্ষিণের প্রায় সব রাজ্যগুলিতেই নিগ্রো ভোটারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

১৯২১ সালে দক্ষিণাঞ্চলের এগারটি রাজ্যে পোল ট্যাক্স না দিলে ভোটের অধিকার পাওয়া যেত না। এই কর থাকার ফলে উভয় বর্ণের দরিদ্র জনসাধারণ ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের রিপোর্টে জানা যায় যে, এই সমস্ত রাজ্যে ভোটার

হওয়ার উপযুক্ত অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা মাত্র দশজন ভোট দিয়েছিল। দেড়শত বৎসর পূর্বে কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিরাই ভোট দিতে পারত। পোল-ট্যাক্স সেই ব্যবস্থারই অন্তিম রূপ। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ব'লে এই কর বিদূরিত করার প্রচেষ্টাকে সেনেট সভায় অযথা সময়ক্ষেপ করার নীতি গ্রহণ করে প্রতিরোধ করা হয়েছে: কিন্তু তাহলেও, অনেক রাজ্য নিজে থেকেই পোল-ট্যাক্স রহিত করে দিয়েছে।

নাগরিকের আর একটি অধিকার হচ্ছে অস্ত্র রাখবার স্বাধীনতা। এই অধিকার বিপজ্জনক হতে পারে, কিন্তু এতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যই প্রকাশ পায়। সশস্ত্র বাহিনীতে পূর্বে নিগ্রো এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের যুদ্ধ করতে হয় না এমন সব কাজ দেওয়া হত, অথবা তাদের কাজ হত স্বতন্ত্রীকৃত ইউনিটে। অফিসারদের স্থলে নিগ্রোদের কদাচিৎ ভর্তি করা হত। সম্প্রতি সৈন্য বাহিনীর সমস্ত বিভাগে যত দ্রুত সম্ভব বর্ণগত বিভেদ বিদূরিত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৫ সালে দেখা গেছে, ফ্রান্সে যুদ্ধকালে নিগ্রোদের সংগ্রামরত সামরিক বাহিনীতে গ্রহণের আদেশ শ্বেতাঙ্গ সৈন্যেরা খুসি মনে গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু যুদ্ধে নিগ্রোদের কৃতিত্ব দেখে দক্ষিণাঞ্চলের সৈন্যসহ প্রায় সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরাই তাদের প্রতি আজ সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। ১৯৫৩ সাল নাগাদ বর্ণগত বাধ্যবাধকতার অবসান করে সৈন্যদলে নিগ্রোদেরজন্য স্থান করার ব্যবস্থা বেশ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সৈন্যদলে বর্ণগত বাধা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে আশা করা যায়।

অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রীকরণ প্রথার বিলুপ্তির সঙ্গে বর্ণগত গোড়ামি বহুলাংশে শিথিল হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্বেতাঙ্গদের থিয়েটার অথবা রেস্তোঁরায় নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার লাভের কথা বলা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, অনেক সময় যেমন আশঙ্কা করা হয়ে থাকে তেমন কোন প্রতিরোধ ছাড়াই একই কারখানায় নিগ্রোদের শ্বেতাঙ্গদের পাশাপাশি কাজ করতে দেওয়া চলতে পারে।

স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থার অবলুপ্তিতে বর্ণ সংস্কার তীব্র হয়ে উঠে হাঙ্গামা বাঁধবার পরিবর্তে গোড়ামি দূর হয়ে যেতে দেখে অনেকে স্বতন্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যেখানে হস্তক্ষেপ না করলে স্বতন্ত্রীকরণ প্রথা বহুদিন ধরে চালু থাকবার সম্ভাবনা, সেখানে আইন প্রবর্তিত করে এই প্রথা বন্ধ করে বর্ণবৈষম্যের অবসান করতে সকলেই স্বীকৃত হবে।

সরকারী চাকুরী ও যুদ্ধের রসদ সরবরাহের কাজে নিযুক্ত বে-সরকারী শিল্পে আচরণের সমতা আনয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৪১ সালে ফেয়ার এমপ্লয়মেণ্ট প্র্যাকটিস কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিটি দেখতে পায় যে, তাদের কাছে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির প্রতি পাঁচটার মধ্যে চারটি ক্ষেত্রেই হয় নিগ্রোদের চাকুরী দেওয়া হয় নি, অথবা তাদের সহকর্মী শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের অপেক্ষা অল্প বেতন নিতে বাধ্য করা হয়েছে। অভিযোগের শতকরা

আট ভাগ দেখা গেছে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে, এবং সবই প্রায় ইহুদিদের বিরুদ্ধে। সরকারী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শ্রমিক সংগঠন সবাই সংখ্যালঘুদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণের দায়ে দায়ী। যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিয়োজিত কমিটির কাজ চলার সময় চাকুরীর ক্ষেত্রে এই বৈষম্য অনেকটা বিদূরিত হয়েছিল। শ্রমিকের সংখ্যাল্পতার দরুণই এটা হয়েছিল।

চাকুরীর ক্ষেত্রে যাতে নিরপেক্ষ আচরণ হয়, কতকগুলি রাজ্যে সেই রকম আইন আছে। যে সমস্ত রাজ্যে এই ধরণের আইন পাশ করা হয়েছে, সেখানে জনমত আবও তর সমতা বিধানের অনুকূল, এবং সেখানে প্রায়শঃই আইনের দ্বারা মালিককে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শ্রমিক নযুক্ত করান সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে দিয়ে সমস্ত রাজ্যে নিরপেক্ষ আচরণ চালু করার প্রয়াস সেনেট সভাতে বানচাল করে দ য় হয়েছে।

শিক্ষা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক সরকারী ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে বহু রাজ্যে নিগ্রোদের শ্বেতাঙ্গ থেকে পৃথক করে রাখবার আইন বলবৎ আছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে, রাজ্য সরকার যদি নিগ্রোদের জন্য 'স্বতন্ত্রভাবে সমপর্যায়ের' জনকল্যানমূলক ব্যবস্থাদি করে, তাহলে স্বতন্ত্রীকরণের আইন অনুসারে নিগ্রোদের ক্ষেত্রে আইনের নিরপেক্ষ আশ্রয়ের নীতি প্রতিপালিত না হলেও শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধন লঙ্ঘিত হয় না। সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্তে বিচারক হার্লান একমত হতে পারেন নি। প্রসঙ্গতঃ তিনি এর সমালোচনাও করেছিলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে নিগ্রোদের জন্য যে সমস্ত সরকারী স্কুল এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা রয়েছে, সাজ-সরঞ্জাম অথবা কাযের বিচক্ষণতার দিক দিয়ে সেগুলি শ্বেতাঙ্গদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থাবলীর সমকক্ষ নয়। তাছাড়া জাষ্টিস হার্লানের কথায় বলতে গেলে, এই বাধ্যতামূলক স্বতন্ত্রীকরণে 'আইনের দরবারে আমাদের সমকক্ষ ও আমাদের সহযোগী নাগরিকদের এক বিরাট অংশের উপর দাসত্বের ও অবমাননার ছাপ পড়ছে। স্বতন্ত্রভাবে সমব্যবহারের ক্ষীণ আবরণ দেখে... কেউই ভুলবে না।' তারপর আদালতের রায়ের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টিই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল যে, জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ সমান নয় এবং যতদিন স্বতন্ত্রীকরণ চলতে থাকবে ততদিন এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমতা বিধান অসম্ভব। কোর্টের ক্রমবর্ধমান দৃঢ়তা কেবল নিগ্রোদের জন্য প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যয়-বহুলতা এবং দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর সহনশীলতার মনোভাবের উল্লেখযোগ্য উন্নতির ফলে সেখানে কতকগুলি কলেজে নিগ্রো ছাত্রেরা ভর্তি হবার সুযোগলাভ করে। এতে কোনরূপ হাঙ্গামা বা অন্য কোন বিশদৃশ ঘটনার উদ্ভব হয় নি। এই অবস্থা এই নূতন ব্যবস্থার প্রসারলাভের অনুকূল হয়েছে।

সরকারী কর্মক্ষেত্রের একেবারে বাইরে, বিভিন্ন বেস্ বল লীগের পেশাদারী দলগুলো তাদের টিমে নিগ্রোদের গ্রহণ করে সমগ্র জাতির অবস্থাকে উন্নততর করেছে। বেস্ বল খেলাকে লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসী তাদের পতাকা ও শাসন-

তম্বের মত পবিত্র মনে করে। এ'যেন তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ও স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। ওয়ার্ল্ড সিরিজে খেলতে পাওয়া মানেই হল পূর্ণাঙ্গ আমেরিকান নাগরিকের মর্যাদা পাওয়া। ব্রুকলিন ডজার্স দলে একজন নিগ্রো খেলোয়াড় আছে দেখে কোন কোন দল বিদ্রোহ করার হুমকি দিয়েছিল। এতে লীগের সভাপতি যে ভাবে বিগড়ে যাওয়া খেলোয়াড়দের সামাল দিয়েছিলেন তাতে সংখ্যালঘুদের প্রতি সমব্যবহারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। লীগের সভাপতি তাদের বলেছিলেন: 'এ হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র; এখানে প্রত্যেক নাগরিকেরই অপর নাগরিকের মত খেলবার অধিকার আছে।'

মানবীয় অথবা অমানবীয়, সর্বপ্রকার শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সরকারের আশ্রয়লাভে নাগরিকের অধিকার অনেক ক্ষেত্রে সুসম আচরণের অধিকারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। যখন বেকারী, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং রোগ মানুষকে আক্রমণ করে, তখন সংখ্যালঘুরা সর্বদাই সংখ্যাগরিষ্ঠদের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ ভোগ করে থাকে। কিন্তু সব লোকই রোগ ও মৃত্যুর এক্তিয়ারে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণেরও এক বিরাট অংশের বেকারত্ব প্রাপ্তির বা উপার্জন কমে যাবার ভয় আছে। অসংখ্য লোক কাজ করে মজুরী অর্জন করে, এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে মালিকের সঙ্গে দর কষাকষির জন্য তাদের আইনের আশ্রয় লাভ করা প্রয়োজন হয়।

শ্রমিকদের অবস্থা বহু শতাব্দী ধরে য়ুরোপ ও আমেরিকার সরকারগুলির চিন্তার বিষয় হয়ে আছে। মধ্যযুগে সরকারগুলির পক্ষে বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খল শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে গিয়ে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করাটাই স্বাভাবিক ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সরকারী হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে দাবিয়ে দেওয়া। তখনকার সাধারণ আইন অনুযায়ী শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠান মনে করা হত। আজকের আইন শ্রমিকদের বহুলাংশে মালিকের একতরফা মর্জিমাফিক কার্যকলাপ এবং কতকগুলি সাধারণ দুর্দশা থেকে রক্ষা করছে।

১৯৩৩ সালে গৃহীত ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিকভারি এ্যাক্ট অনুযায়ী শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হবার অধিকার পায়। ঐ একই আইনে ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নিতে মালিকদের বাধ্য করা হয়েছিল। ওয়াগনার এ্যাক্ট এবং টাফট্-হার্টলি এ্যাক্ট শ্রমিক ও মালিকের অধিকারের আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়। প্রথমটি শ্রমিক ও দ্বিতীয়টি মালিক স্বার্থের অনুকূল। এই সমস্ত বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য হোল এমন সমস্ত রীতি-নীতি প্রতিষ্ঠা করা যেগুলির মাধ্যমে আদালত ন্যায়-সম্মত ভিত্তিতে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে শান্তিস্থাপন করতে পারে।

ন্যায়পরায়ণতা বলতে কি বোঝায় তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে নানা রাজনৈতিক মতামতের উৎপত্তি হয়। অতীতে শ্রমিকরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। সংগঠনের অধিকার অর্জনের জন্য তাদের তখন সংগ্রাম করতে হয়েছে, অনেক সময় রক্তপাতও হয়েছে। তাদের নেতারা তখন যত না রফা করতে, তার চেয়েও বেশী সংগ্রাম

করত। তারপর দেশের আইন তাদের অনুকূলে এল। ইউনিয়নগুলির কার্যকলাপের মাধ্যমে যখন দেখা গেল যে শ্রমিকরা আর নিষ্পেষিত নয়, তখন ধীরে ধীরে তাদের উপর সাধারণের করুণাও অন্তর্হিত হয়ে যেতে লাগল। তারপর ১৯৪৭ সালের রাজনীতির জোয়ারে রিপাবলিকানরা শাসনক্ষমতায় এলে মালিকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কংগ্রেসে টাফ্‌ট-হার্টলি এ্যাক্ট গৃহীত হয়। শ্রমিক ইউনিয়নের সভ্যদের ইতিমধ্যে ধনিকগোষ্ঠি বা রিপাবলিকান দলের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার মনোভাব অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে তারা রিপাবলিকানদের জয়লাভে সাহায্য করেছিল। শ্রমিকদের অধিকার তখন যথেষ্ট নিরাপদ হয়েছিল বলেই তারা অন্যান্য বিষয়ে ইচ্ছামত ভোট দিতে পেরেছিল।

বহুদিন থেকে বিভিন্ন রাজ্যে একভাবে না একভাবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও তাকে জাতীয় ভিত্তিতে প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য সভ্য জাতীগুলির পেছনে পড়ে ছিল। ১৯৩৫ সালে এই জন্য জাতীয় আইন পাশ হয়। তার পর থেকে বৃদ্ধ বয়সের ও মৃত ব্যক্তির পোষ্যবর্গের বীমা কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং আরও বিভিন্ন ধরণের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও তা বিস্তৃত হয়। বেকার ভাতা, অন্ধ ও বিকলাঙ্গদের জন্য সরকারী সাহায্য, এবং অনাথ শিশুদের সাহায্য-ব্যবস্থার মত বিষয়গুলি ধীরে ধীরে একে একে হয় রাজ্য সরকার, নয়তো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলে বা রোগে বা বৃদ্ধ বয়সে, ব্যাপক বেকারত্বের সময় যে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অপারবর্তিত থাকে এ কথা সবাই স্বীকার করে। ব্যবসায়ী ও শ্রমিক স্বার্থের পক্ষে সুবিধাজনক হওয়ায় উভয় রাজনৈতিক দলও সামাজিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সমর্থন করে।

বিভিন্ন পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থার নিকট হতে বিভিন্ন ধরণের নিরাপত্তালাভের জন্য আমেরিকান জনসাধারণের দাবী-দাওয়া একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক বাদানুবাদের উদ্ভব হয়েছে। রক্ষণশীলদের অভিমত হচ্ছে, এই সমস্ত প্রস্তাবিত ব্যবস্থার প্রত্যেকটিই সমাজতান্ত্রিক ও এতে জনসাধারণের অর্থের অপব্যয়ই হবে, এবং জনসাধারণের সত্যিকার সমস্ত প্রয়োজন বেসরকারী উদ্যোগই মিটাতে পারে। অপর দিকে উদারতন্ত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে বেসরকারী উদ্যোগ জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাচ্ছে না, আর বিভিন্ন কারণে তারা মিটাবেও না। তাছাড়া প্রস্তাবিত সরকারী ব্যবস্থা কার্যকরী হলে তদ্দারা অর্থের কোন না কোন ভাবে অপব্যয় বন্ধ হবে ও জনসাধারণের অর্থ বাঁচানো যাবে।

প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে অবশ্য অধিকারের রকম-ফের হয়। রাজনৈতিক তর্কবিতর্কের মধ্যে সাময়িকভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। নতুন পরিস্থিতির ফলে পূর্ব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিলে আবার তা'কে পুনর্বিবেচনা করে দেখা হয়। মোটামুটি রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে যে সমস্ত বিপদ প্রতিরোধ করা যায় বলে জনসাধারণ মনে করে, সেই সমস্ত বিপদ হতে নিরাপত্তালাভের জন্যই সাধারণতঃ সরকারী ব্যবস্থাপনার পক্ষে আন্দোলন হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করার ফলে আমেরিকার জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার বিকাশ সাধনের কাজে বিশ্বসংস্থাকে সহায়তা করার সদস্যোচিত দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছে। শ্রীমতী ক্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট আমেরিকার প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে এক বিশেষ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। মানব অধিকার সংক্রান্ত সেই কমিশনের ঘোষণা সোভিয়েট য়ুনিয়ান ও তার তাঁবেদারী শক্তিগুলির তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে।

মানব অধিকারের এই ঘোষণা আমেরিকান শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত অধিকারের সনদকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তার কারণ, হিটলার ও সোভিয়েট রাশিয়া অনেকগুলো নতুন ধরণের অন্যায় করেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, জিনোসাইডা বা বর্ণ, গোষ্ঠী ও ধর্ম সম্প্রদায়কে নির্বংশ করে দেবার মত সংকবী প্রচেষ্টার উল্লেখ করা যায়। এই সমস্ত প্রাচীন দুষ্কৃতি বিংশ শতাব্দীর সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে আবার দেখা দিয়েছে। এই কারণেই, এই সমস্ত বিষয়ের উপর রাষ্ট্রসংঘকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়েছে।

মানব অধিকারের ঘোষণা ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে পেশ করে তাদের অনুমোদন লাভের আশায় একটি চুক্তিপত্র রচনার ভারও এই কমিশনকে দেওয়া হয়েছিল। অধিকারের ঘোষণায় সকল রকম অধিকারই আছে; কেবল অন্যায় ও উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়া নয়, বেকারী প্রভৃতি দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার ও এতে আছে। আমেরিকানরা এখানে দু'ধরণের চুক্তিপত্র সম্পাদনের পক্ষপাতী ছিল। একটি অধিকারের সনদের মত, আদালতগুলি যাদের প্রয়োগ করতে পারে. অপরটি দারিদ্য ও রোগ প্রভৃতি নিবারণের মত বিষয়ে সরকারী দায়িত্ব নিয়ে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আশা করা যায় না। আদালতে গিয়ে শেষোক্ত অধিকারগুলি আদায় করা যায় না। এর জন্য রাজনৈতিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ব্যক্তি গত ও সরকারী দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য করে জনসাধণের অধিকার রক্ষিত হয়েছে কি'না সে বিচারে জনসাধারণ রাজনৈতিক দলগুলিকে পুরস্কৃত করতে পারে অথবা শাস্তিও দিতে পারে।

এই চুক্তিপত্র দুইটির কোনটিই যে অনুমোদনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটসভাতে পেশ করা হবে তা মনে হয় না। এই পথে প্রধান বাধা হচ্ছে, আমেরিকান আইনে যে সমস্ত অধিকার আছে রাষ্ট্রসংঘের অন্য সমস্ত সদস্যরা সে সমস্ত অধিকার সম্পর্কে একমত হয় নি। আমেরিকা তার শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অধিকারগুলিকে খর্ব করতে পারে না, এ'সম্পর্কে শক্তিশালী বিধিগত ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়টি সবাই মেনে নিতে পারে নি। সেনেটে এই সম্পর্কে ঝুঁকি নেওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

সুতরাং রাষ্ট্রসংঘে এই সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাব হচ্ছে, আমরা সর্বদেশে ব্যক্তিগত অধিকারের নিরাপত্তা চাইলেও আমরা আশা করি না যে কোথাও সর্বতোভাবে এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের দেশের আইন ও রীতি-

নীতিতে বহুত্রুটি-বিচ্যুতি দেখি এবং সে কথা আমরা স্বীকারও করি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ যে ক্রমাগত অধিকতর সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা'ও দেখতে পাই। ব্যক্তিগত অধিকার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি যতই প্রসারিত হচ্ছে, আমাদের রাজনৈতিক পদ্ধতিও তত সেই আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে আর কোন ভাল পন্থা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার

আমেরিকান শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকটি রাজ্যকেই "প্রজাতন্ত্রী সরকার" গঠনের নিশ্চয়তা দিয়েছে। কিন্তু শাসনতন্ত্রের এই অংশ নিয়ে কারও কোন কিছু বলার প্রয়োজন হয় নি, কারণ এখানে রাজনৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণত কি ক'রে বিচক্ষণতার সঙ্গে সরকারী কার্য পরিচালনা করা যায় তা নিয়েই ব্যাপৃত থাকে। একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী চরমপন্থীরা এখানে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রেও সুবিধা করতে পারেনি। ১৯৪০ সালে রোড্ আইল্যাণ্ডে একটি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট তখন যাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেছিলেন, তাকেই সাহায্য দিয়েছিলেন। ১৮৭৪ সালে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়ার সমর্থকরা একটি শাসনতান্ত্রিক অভিযোগ তুলেছিল। তারা বলেছিল, যে রাজ্য-সরকার মেয়েদের ভোটের অধিকার স্বীকার করে না, সেই রাজ্য-সরকার "প্রজাতন্ত্রী নয়।" কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। প্রশ্নটি "রাজনৈতিক," এই যুক্তি দেখিয়ে আদালতগুলি সাধারণতঃ প্রজাতন্ত্রী সরকার বলতে কি বোঝায় সেই সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে অসম্মত হয়।

এর নীট ফল হল এই যে, কোন সরকার (যেমন বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথমভাগে লুইজিয়ানায় হুয়ে লঙ-এর নেতৃত্বে গঠিত সরকার) একনায়কতন্ত্রী কিনা এবং জাতির অবশিষ্টাংশ সেই পন্থা অনুসরণ করবে কিনা, রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সেটা নির্ধারণ করার অধিকার আমেরিকার জনসাধারণ পেল। যদি যুক্তরাষ্ট্রের অবশিষ্টাংশ সিদ্ধান্ত করে যে কোন রাজ্যকে নিয়ন্ত্রনাধীনে আনা দরকার, তাহলে সে নিয়ন্ত্রণ হবে প্রজাতন্ত্রী ধরণের সরকারের আদর্শ বিচ্যুতি নিরসনের প্রচেষ্টা হিসাবে। এই রকম ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট'ও কোনরূপ আপত্তি করবে না।

সুতরাং দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিকেরা প্রজাতন্ত্রী আদর্শের যতই বিচ্যুতি ঘটাক না কেন, আমেরিকানরা সাধারণতঃ যাকে 'প্রজাতন্ত্রী সরকার' বলে তার কোন অদল বদল হয় না। প্রত্যেকটি রাজ্য-সরকারই শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বলে পরিচালিত হয়। সহিংস বিপ্লব ব্যতিরেকেই জনসাধারণ সে শাসনতন্ত্রের সংশোধন

করতে পারে। জনসাধারণের কাছে জবাব-দিহি করতে হয় এমন প্রতিনিধিরাই আইন প্রণয়ন করে। জনসাধারণ যে সমস্ত ব্যক্তিগত অধিকারকে আইনের রক্ষা-কবচ দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করেছে, আইনের বেড়াজালে সেগুলিকে নিরাপদ করা হয়েছে। তবে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে ঐ আইন প্রয়োগ করার বিষয়ে দুর্নীতিও দেখা যায়। সরকারী উৎপীড়নের হাত থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবার ব্যবস্থাও রয়েছে। আমেরিকার জনসাধারণ 'প্রজাতন্ত্রী সরকার' বলতে যা বোঝে, এই সমস্ত হচ্ছে তার প্রধান প্রধান আঙ্গিক। সব সময় অক্ষরে অক্ষরে যে সমস্ত বিষয় প্রতিপালিত নাও হতে পারে, তবুও আমেরিকায় সেগুলি রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণ হিটলার ও সোভিয়েট ইউনিয়নের কার্য-কলাপ প্রত্যক্ষ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন জাতিগুলির উল্লিখিত অধিকার সংরক্ষণের ধারাগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। নিজ নিজ স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য যে সমস্ত অধিকার থাকা প্রয়োজন বলে আমেরিকানরা মনে করে, সোভিয়েট রাশিয়ার মত রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে হয়ত তার প্রায় সমস্ত অধি-কারই জনসাধারণকে দেওয়া হতে পারে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যদি সেখানকার জনসাধারণের বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনের অধিকার এবং শাসন পরিচালকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর কোন ব্যবস্থা না থাকে,—তাহলে সেই সমস্ত অধিকারের নিশ্চয়তা অর্থহীন হয়ে উঠে। বিভিন্ন রকম আইনের সমষ্টিগতরূপ হল 'প্রজাতন্ত্রী সরকার'। এ সব আইনের মধ্যেও দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জনসাধারণের স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের অধিকার থাকাতে তারা ইচ্ছামত সেই দুর্নীতি ঝেঁটিয়ে দিয়ে তাদের চিরাচরিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি ফিরিয়ে আনতে পারে। স্বাধীন দেশে যেখানে ভোটাররা কে কাকে ভোট দিচ্ছে কেউ দেখতে পায় না এবং রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য তাকে বিপদগ্রস্ত হতে হয় না সেখানে জনসাধারণ নিজে-দের ইচ্ছামত বিধানসভা ও প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করে তাদের দিয়ে প্রয়োজনীয় যে কোন অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

জনসাধারণের সার্বভৌম হিসাবে চলতে পারার মত ব্যবস্থা থাকলে তবে তাদের কার্যকলাপ বিভিন্ন বিরোধী স্বার্থ এবং তাদের দর্শন বা বিচারবিবেচনার আদর্শের দ্বারা নিরূপিত হতে পারে। আমেরিকান জনসাধারণের রাজনৈতিক দর্শন অত্যন্ত জটিল এবং কতক দিক্ দিয়ে পরস্পর-বিরোধীও।

সরকার সম্বন্ধে আমেরিকানদের আদর্শ ইংরেজ জাতি ও আমেরিকান জন-সাধারণের বহুদিনব্যাপী সরকারী উৎপীড়ন-বিরোধী ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত। সরকারী উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রথম অভ্যুত্থান হয় ১২১৫ সালে। রাজা জনের বিরুদ্ধে ব্যারণদের সেই সংগ্রাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এর ফলে রাজা ব্যারণদের তৎকালীন সামন্ত আইন-কানুন সম্বন্ধে কতকগুলি গ্যারাণ্টি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইতিহাসে এই লিখিত সনদ ম্যাগ্না কার্টা নামে অভিহিত। সাধারণ মানুষের অধিকার অপেক্ষা ব্যারণদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থাই এই সনদে করা

হয়েছিল তবে, জনসাধারণ রাজার বিরুদ্ধে তখন ব্যারণদের পক্ষই সমর্থন করেছিল। কারণ তারা মনে করেছিল রাজার অযথা অমিতব্যয় ও কর্তব্যে অবহেলার জন্যই তাদের দুর্দশা বেড়ে যাচ্ছে। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের অত্যাচার হতে প্রজাদের রক্ষা করতে না পারাকেও তারা রাজার কর্তব্যে বিচ্যুতি মনে করেছিল।

আমেরিকান বিপ্লবের সময়ও অনেকটা অনুরূপ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। উচ্চতন রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে অধঃস্তন রাষ্ট্রশক্তির বিরোধ জনসাধারণ ইংল্যাণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক সরকারগুলিকে সমর্থন জানিয়েছিল। এখানেও জনসাধারণ মনে করেছিল, রাজা আইনের অপব্যবহার করাতেই তাদের দুর্দশা দেখা দিয়েছে: রাজার বিরুদ্ধে তখন ঔপনিবেশিক বিধানসভা ও তাদের উত্তরাধিকারী রাজ্য-সরকারগুলিকে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষক বলে মনে করা হয়েছিল।

ম্যাগ্নাকার্টা হতে সুরু করে গোষ্ঠিগতভাবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার দিয়ে শ্রমিকদের জন্য যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রণীত হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আমেরিকানদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে বাস্তবরূপ দেওয়া হয়েছে। বস্তির অধিবাসী, কোন বঞ্চিত সর্বহারা এই আদর্শকে সার্থক করে তোলে নি। এই আদর্শকে যাঁরা সার্থক করে তুলেছেন, তাঁরা কোন না কোন ভাবে সুবিধাভোগী। অতীতে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ সময় সময় সেখানকার অবস্থাপন্ন লোকজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। ১৩৮১ সালে ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহ এই রকম একটি ঘটনা। কিন্তু উপযুক্ত ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের অভাবে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি, ঈপ্সিত সংস্কারও সাধিত হতে পারেনি। প্রতিপত্তিশালী সরকার ও ব্যক্তিদের সঙ্গে অনুরূপ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে এখানে সমাজ অধিকতর গণতন্ত্র-সম্মত সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে গেছে। এর ফলে আমেরিকানদের দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষভাবে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর'। উদাহরণস্বরূপ, সংগঠিত শ্রমিকরা এখানে তাদের 'সর্বহারা' বা প্রোলেটারিয়েট মনে করে না। তারা তাদের শ্রমিক সংগঠনগুলিকে সমর্থন করে, কিন্তু সংগঠনগুলিকে তারা কমিউনিষ্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় হাতিয়ার মনে করে না। তাদের মধ্যবিত্তসুলভ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা, সে মানকে উন্নত করা এবং আমেরিকান সমাজ-ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তদের স্বাভাবিক মর্যাদা লাভের জন্য তারা তাদের সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করে।

আমেরিকার রাজনৈতিক ঐতিহ্য তাই বহুদিন থেকে সংগঠিত ও সম্ভ্রান্ত স্বার্থের সুদীর্ঘ সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ব'য়ে এসেছে। আমেরিকান বিপ্লব যথার্থই এই ঐতিহ্যের প্রতীক। বিপ্লবের সময় রাজপক্ষে ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা। আমেরিকানরা তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করবে এ'টা তাদের সহ্য হয়নি। রাজা ও পার্লামেন্টের বিধিবদ্ধ ক্ষমতার অধিকার নিয়ে তাদের স্বার্থ সংগঠিত হয়েছিল। আর আমেরিকান পক্ষে ছিল আমেরিকার ব্যবসায়ী, তামাক উৎপাদক ও ভূস্বামী এবং সেইসব শ্রমিক ও

কৃষক জনসাধারণ যাদের তারা ব্রিটিশের ধার্য কর ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিধিনিষেধে তাদের স্বার্থহানি সম্বন্ধে সচেতন করতে সক্ষম হয়েছিল। আমেরিকানরা তখন স্ব স্ব রাজ্যের মধ্যে সংহত হয়ে উঠেছিল, এবং কন্টিনেন্টাল বা মহাদেশীয় কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে তাদের একটা শিথিল ঐক্যও গড়ে উঠেছিল। যে সমস্ত প্রভাবশালী আমেরিকান রাজপক্ষ সমর্থন করেছিল, পরে তাদের সেখান থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর নতুন জাতির অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করে যারা তার ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের কাছে এই যুক্তি বিশেষ জোরাল বলে মনে হয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপীড়ক হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, আর ঐক্যবদ্ধভাবে সেই উৎপীড়নের প্রতিরোধ করার পক্ষে আঞ্চলিক সরকারের উপযোগিতা সমধিক। প্রাচীন পূর্বপুরুষরা যেমন একদিন রাজা জনের বিরুদ্ধে ব্যারণদের পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন, এই দিক দিয়ে আমেরিকানরা সেই ঐতিহ্যের অনুসারী হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে এই আশঙ্কা ও বিমুখতাই ছিল টমাস জেফারসনের অনুসারীদের প্রধান আদর্শ। জেফারসন-পন্থী গণতন্ত্রের মূল কথা ছিল: "যে সরকার শাসন করে কম, সে সরকারই হ'ল সবার সেরা সরকার।"

অপর পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারগুলিকে সেই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে হয়; তবুও জনসাধারণের এমন কতকগুলি প্রয়োজন রয়েছে যা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারই পূরণ করতে পারে। বিপ্লবের পরেই আমেরিকায় এমন কতকগুলো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা'তে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতার মতবাদ একেবারে বিপ্রভ হয়ে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অধঃপতন ও দেশরক্ষার ক্ষেত্রে দুর্বলতা ব্যবসায়ী, অর্থলগ্নীকারী ও সরকারী কর্মকর্তাদের অত্যন্ত চিন্তিত করে তুলেছিল। আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন ছিলেন এই দলের নেতা। এই হ্যামিল্টন-পন্থী অথবা যুক্তরাষ্ট্রপন্থীরা (ফেডারালিষ্ট) আমেরিকার উপর ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় শাসনের ঘোরতর বিরোধী হলেও অবস্থার চাপে পড়ে বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে তাঁরা আমেরিকায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠার উপাসক হয়ে উঠেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অনুমোদন করার সময় এলে এমন কি জেফারসনও শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত আদর্শের তেমন বিরোধিতা করেন নি।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমেরিকানরা হ্যামিল্টন ও জেফারসনের মতবাদের মধ্যে বহুবার দোলা খেয়েছে, যখন যে মতবাদ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক মনে করেছে, তখন সেই মতবাদকেই গ্রহণ করেছে।

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল অবধি ডেমোক্র্যাটিক দলের অনুসৃত নীতি বিশ্লেষণ করে দেখলে এই নীতি পরিবর্তনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাবে। ডেমোক্র্যাট দল জেফারসনের উত্তরাধিকারী হলেও এবং এখনও তাঁর বহু আদর্শে নিষ্ঠাবান থাকা সত্ত্বেও মিঃ রুজভেল্ট এবং মিঃ ট্রুম্যান বহুলাংশে যুক্তরাষ্ট্রীয়,

সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন ও তার কর্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত করেছেন; আর এটাই হল প্রকৃত হ্যামিলটনী নীতি। অবস্থার তাগিদে তাঁদের আদর্শ ও নীতির এরূপ বিচিত্র সমাবেশ হয়েছে। ১৯৩৩ সালে আমেরিকান জনসাধারণ ১৭৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দের মত ব্যাপক মন্দার মধ্যে দিয়ে চলেছিল। এবারে মন্দা ছিল আরও ব্যাপক। ডেমোক্র্যাটরা তখন মনে করেছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তবেই জনসাধারণের প্রয়োজন মেটান যেতে পারে। ১৭৮৭ সালে হ্যামিল্টনও ঠিক একই ধারার চিন্তা করেছিলেন। অতএব, ১৯৩৩ সালে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেবার জন্য ডেমোক্র্যাটদের আদর্শকেও খানিকটা অবনমিত করতে হয়েছিল।

সরকার সম্বন্ধে জেফারসন ও হ্যামিলটনের মনোভাব ছাড়াও আমেরিকার রাজনৈতিক দর্শন সরকারের প্রকৃতি ও লক্ষ্য সংক্রান্ত অধিকতর তত্ত্বগত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের বর্তমান আলোচনার সুবিধার জন্য সেই মতবাদগুলিকে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়। নৈরাজ্যতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র রয়েছে একেবারে দুই বিরোধী প্রান্তে। এই দু'য়ের মধ্যবর্তী দু'টি নরমপন্থী মতবাদ নিয়েই সাধারণতঃ আমেরিকানদের বেশীরভাগ রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক বাদানুবাদ চলে। মধ্যবর্তী মতবাদ দু'টির একটিকে বলে ব্যক্তিতন্ত্র। আমেরিকান ভাষায় অপরটির কোন নির্দিষ্ট নাম নেই, তবে সেই মতবাদের সারাংশ হচ্ছে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে সরকারের অবশ্যই সাহায্য করা উচিত। এঁকে হস্তক্ষেপ করণের মতবাদ বলা যেতে পারে।

আমেরিকান রাজনীতিতে নৈরাজ্যতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রভাব উল্লিখিত দুই মতবাদের অনুপাতে অল্প। নৈরাজ্যতন্ত্র একটি চরম মতবাদ। এর মতে রাষ্ট্র একটি উৎপীড়ক প্রতিষ্ঠান, এবং তাকে ধ্বংস করতেই হবে। এই মতবাদের একেবারে বিরোধী প্রান্তে রয়েছে সমাজতন্ত্র। এর মতে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যক্তিগত মালিকানা জনসাধারণের দুর্দশা দুঃসহ করে তুলেছে এবং রাষ্ট্রকেই মজুর নিয়োগক্ষম সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও শিল্পগুলির মালিক ও পরিচালক করা উচিত। কিন্তু এই ধরণের মতবাদ আমেরিকার জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। অধিকাংশ আমেরিকান জনসাধারণের মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাবের জন্যই চরমপন্থী ও সমস্যার সহজ সমাধানের মতবাদগুলি এখানে জনপ্রিয় হয় নি। সম্ভবতঃ হ্যামিলটন এবং জেফারসনের মতবাদের মধ্যে আমেরিকান ইতিহাসের অন্তহীন দোলাই আমেরিকার জনসাধারণকে রাজনৈতিক বিতর্কে মধ্যপন্থী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। যাই হোক না কেন, রাষ্ট্রশক্তির যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কিত রাজনৈতিক বিতণ্ডায় যে দুটি মতবাদের উল্লেখ সব সময়ই করা হয়ে থাকে, তার একটি হল জেফারসনী মতবাদের অনুবর্তী ব্যক্তিতন্ত্র, আর অপরটি হ'ল আমেরিকান রাজনীতিতে হ্যামিলটন প্রবর্তিত হস্তক্ষেপ করণের মতবাদ।

ব্যক্তিতন্ত্র অনুযায়ী গভর্ণমেন্টের একমাত্র ও যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ

শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। এই মতবাদকে "লেইসেজ ফেয়ারও" বলে। "জনসাধারণকে তাদের নিজের পথে চলতে দাও" এই হল এই মতবাদের মূল কথা। অপরাধদুষ্ট মানুষ ছাড়া অন্য সমস্ত জনসাধারণকে তাদের নিজের স্বার্থ অনুযায়ী চলতে দিলেই তারা সর্বোত্তম পন্থায় তাদের উন্নতির পথ করে নেবে, এই ধারণাই হ'ল এই মতবাদের ভিত্তি। তারা তাদের বিবেক বুদ্ধি মতে পরস্পরে সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বা প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করবে। এই মতবাদের বক্তব্য হচ্ছে, যে "অদৃশ্য হস্ত" মানুষের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ সাম্য বিধান করে দেয়, সেইটাই আবার মানব সমাজে সুখকর বিষয়বস্তু ও দুর্দশাগুলির ন্যায়সম্মত বিন্যাস করে থাকে। অবশ্য দৈবদুর্বিপাক বশতঃ এতে কিছুসংখ্যক লোকের দুঃখ দুর্দশা থাকতে পারে। এ সমস্ত লোকের দুর্দশা ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে নিরসন করা যায়।

যদি কোন অঘটন হয়, যেমন—কোন গোষ্ঠীর উপার্জ্জনের একমাত্র সম্বল একটি মিল দেউলিয়া হয়ে পড়ে, তাহলে ব্যক্তিতন্ত্র অনুযায়ী সেটিও হচ্ছে অর্থনৈতিক নিয়মের যথাযথ পরিণতি। দেশে যদি মন্দা দেখা দেয় তা'ও হবে অর্থনৈতিক শক্তির কার্যকারিতায়। এইজন্য অর্থনীতির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া মারাত্মক ও অবিবেচনাপ্রসূত হবে। প্রকৃতিক নিয়মে হস্তক্ষেপ করতে গেলে ফল আরও ভয়ানক হতে পারে—এই ভয় থেকেই এইরকম মনোভাব পোষণ করা হয়ে থাকে। ১৯২৯ সালে যে ভয়াবহ মন্দা সুরু হয়েছিল, সেই সময়ে এই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে বহু রাজনৈতিক বাদানুবাদ হয়েছিল।

এর বিকল্প মতবাদটির কোন নামকরণ হয়নি তার কারণ একে সব সময়েই আত্মরক্ষামূলকভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে। আমেরিকানরা সরকারী সাহায্য নিতে লজ্জা বোধ করে থাকে এবং এভাবেই তাদের গড়ে তোলা হয়। সরকারী সাহায্যের যৌক্তিকতা নিয়ে কোন সার্বজনীন মতবাদকে তারা সহজে স্বীকার করে নিতে চায় না। যদিও সমস্ত আমেরিকানরাই বিশ্বাস করে যে, সরকারকে তাদের জন্য কোন কাজ করতে হলে বিধিবদ্ধ আইনের প্রয়োজন হবে, তবুও অপরের সহায়তার জন্য 'কর' দেওয়ার নীতিকে আমেরিকান ঐতিহ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

"হস্তক্ষেপকরণ" মতবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, পুলিশী ও সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াও কতকগুলি প্রয়োজন জনসাধারণের রয়েছে এবং সেগুলি একমাত্র সরকারের পক্ষেই মেটান সম্ভবপর। ব্যবসায়ীরা মরীয়া হয়ে চেষ্টা না করলে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হয়ত বা রচিত হত না। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা এবং মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার আবর্ত বিদূরিত করে ব্যবসা-বাণিজ্যকে অবারিত করার জন্য তার উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব চেয়েছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ, ডাক-বিভাগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সর্বসাধারণের

কল্যাণ সাধন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ও সামগ্রিক বিচারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর ক্ষমতা দেবার জন্যই শাসনতন্ত্রের সৃষ্টি করা হয়েছিল।

এইভাবেই আজকের রিপাবলিকানদের পূর্বাধিকারিক ফেডালিষ্টরাই সরকারের উপর দেশের শান্তিরক্ষা ও বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা অপেক্ষা অনেক বেশী দায়ীত্ব আরোপ করেছিল। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য যেটুকু প্রয়োজন বলে তারা মনে করত, তারই সীমার মধ্যে থেকে তারা ব্যবসায় ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সরকারী সাহায্য দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল।

যে আদর্শের বশবর্তী হয়ে ফেডার‍্যালিষ্টরা শাসনতন্ত্রকে সমর্থন করেছিল, সেই আদর্শই তাদের উত্তরাধিকারীদের শিল্পসম্প্রসারণের জন্য প্রতিরক্ষামূলক শুল্কনীতির সমর্থক করে তুলেছিল। আমেরিকার ইতিহাসের প্রথম দিকে দেখা যায়, যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকারেব অধিকাংশ কল্যাণমূলক কাজের দ্বারা দেশের সাধারণ শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষী অপেক্ষা ব্যবসায়ীরাই প্রত্যক্ষভাবে অধিকতর উপকৃত হয়েছে। জেফারসন-পন্থীরা তখন তাই সরকারী কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের বিরোধী হয়ে উঠেছিল এবং ব্যক্তিতন্ত্রী মতবাদকে আঁকড়ে ধরেছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এনড্রু জ্যাকসন্ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখপাত্র হিসাবে তিনি তখন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ সেটা সীমান্ত অঞ্চলের ছোটখাট চাষী ও ব্যবসায়ীদের চেয়ে সহুরে ব্যবসায়ীদেরই অধিক অনুকূলে ছিল।

এইভাবে কোন্ দল কোন্ আদর্শ গ্রহণ করবে, কেন এক সময় ব্যক্তিতন্ত্রের সমর্থক হয়ে উঠে, আবার আর একসময় সরকারী কর্তৃত্বের প্রসার কামনা করে, তা বোঝা যায়। কিন্তু উভয় দল একটা বোঝাপড়ায় এসে প্রত্যেক লোকে যাতে তার প্রয়োজন অনুসারে সব পেতে পারে সেরকম সরকারী ব্যবস্থা করে না কেন? এ রকম বোঝাপড়া তারা খানিকটা ক'রে থাকে।

প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যই চান, সরকার তাঁর এলাকায় ডাকঘর বসাক বা নদীতে বাঁধ দিক্। এই সমস্ত কাজের জন্য তিনি যদি অপর কংগ্রেস সদস্যের সমর্থন লাভ করেন, তাহলে আবার সেই সদস্যের কাজের সময় তিনি তাকে সমর্থন করেন। একে বলা হয় "পর্ক-ব্যারেল" প্রথা। তবে এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার পথে বাধাও আছে। প্রথম বাধা হচ্ছে, জনসাধারণ চড়া হারে কর দিতে চায় না। দ্বিতীয়ত: এমন কতকগুলি কল্যাণমূলক কাজকর্ম আছে তাদের প্রসারিত করতে গেলে শক্তিশালী বেসরকারী স্বার্থকে কোন না কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, অথবা তাদের কিয়দংশে হস্তক্ষেপ করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকার ট্রাষ্ট-বিরোধী আইনের উল্লেখ করা যায়। এই আইন সমগ্রভাবে ব্যবসায়ী স্বার্থের অনুকূল হলেও এতে অনেক প্রভাবশীল ব্যবসায়ীর স্বার্থের উপর আঘাত পড়েছিল। আঘাত-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ স্বভাবতই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এই সমস্ত কার্য নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ব্যক্তিতন্ত্রের পক্ষ নিয়ে যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে।

বিশেষ স্বার্থের বশবর্তী হয়ে দলীয় যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা হলেও তাদের অর্থহীন বা অন্যায় মনে করা সঙ্গত হবে না। নৈরাজ্যতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী মতবাদদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে আমেরিকানরা তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি এনেছে ও বহু দুর্দৈব থেকে রক্ষা পেয়েছে। একদিকে সরকারী সহায়তার সুযোগ সুবিধা এবং অপর দিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ অবসানের বিপদ সম্বন্ধে নিয়ত যুক্তিতর্কের মধ্যে দিয়ে আমেরিকানরা মধ্যপন্থার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। উভয়বিধ যুক্তির মধ্যেই আংশিক সত্য রয়েছে। নির্বাচকরা উভয় যুক্তির মধ্যে ভারসাম্য করে ভোট দিতে পারলেই তবে আমেরিকান জনসাধারণের মনোমত সরকার গঠিত হয়।

আজকে পার্টিগুলির পূর্বতন ঐতিহ্যের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেদিনের ফেডারালিষ্টদের উত্তরাধিকারীরা আজ ব্যক্তিতন্ত্রের পূজারী হয়ে উঠেছে, এবং জেফারসনের অনুসারীরা আবার সরকারী কার্যকলাপের ক্ষেত্র প্রসারের সমর্থক হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের জয়যাত্রাই পার্টিগুলির মধ্যে এই পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

১৮০০ সালে অধিকাংশ আমেরিকানরাই ছিল কৃষিজীবী। সরকারের পক্ষে তখন তাদের বিশেষভাবে সাহায্য করবার মত কিছু ছিল না। অতঃপর সরকার পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলি ক্রয় করে বা জয় ক'রে তখন জনসাধারণকে সেখানে বসবাসের অবাধ অধিকার দিয়েছিল। রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কিছুপরিমাণ সামরিক ব্যবস্থা ছাড়া সরকার থেকে তাদের জন্য তখন আর কিছুই করা হয় নি। নতুন রাজ্যে এসে জনসাধারণকেই তাদের অন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে নিতে হয়েছে। তারা তখন নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তুলেছে এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিই তাদের শাসন পরিচালনা করেছে। চোরজুয়াচোরের শাস্তি তারা নিজেরাই দিয়েছে। আদিম জনগোষ্ঠিতে যে সমস্ত ধারায় সরকার গঠিত হয়েছে, তন্মধ্যে সম্ভবতঃ "সামাজিক সংগঠনের" মাধ্যমে সরকার সংগঠনের ধারার সঙ্গে সর্বাধিক মিল রয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের পথিকৃৎদের দ্বারা গঠিত এই সরকারগুলির। পুরোধা পথিকৃৎরাই আমেরিকার ভবিষ্যৎ সরকারী ধারা কি হবে সেটা বুঝতে পেরেছিল এবং যখনই সেইভাবে সরকার গঠনের প্রয়োজন হয়েছে তখনই তারা সমবেত হয়ে সেটা করে নিয়েছে।

এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে কেবলমাত্র পশ্চিমাঞ্চলের পথিকৃৎরাই নয়, সমস্ত আমেরিকানরাই উপলব্ধি করেছে যে বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানে সরকারের সহায়তা যদি সত্যই প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে সে কাজের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক সরকারই যথেষ্ট, তা সে সমস্যা যতই গুরুতর হোক না কেন।

তারপর ধীরে ধীরে দেশের উপর ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে বিজ্ঞানের প্রভাব পড়তে আরম্ভ করল। সুদীর্ঘ ট্রান্সকন্টিনেণ্টাল রেলপথ প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে গিয়ে পৌছল। ক্যালিফোর্নিয়ার জনসাধারণ রেল কোম্পানীর চড়া ভাড়া ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলল। সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত রেল

কোম্পানীকে নিয়ন্ত্রিত করা একটি বিশেষ রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর হল পেট্রোলের আবির্ভাব। মানুষ এবার মোমবাতি ও তিমির তেলের বাতি ছেড়ে পেট্রোলের বাতি জ্বালাতে লাগল। পেট্রোলের ব্যবসা স্বল্পকালের মধ্যেই একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত হল, এবং এর পরিণাম দেখে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হতে পারল না। জনসাধারণ রেল পরিচালনার ক্ষেত্রে ও একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবী করল।

বিংশ শতাব্দীতে এই নতুন পরিস্থিতি দ্রুত বিস্তৃতিলাভ করতে থাকে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে চলে যাওয়াতে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা রাজ্যবিশেষের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। একাজের জন্য অধিকতর ক্ষমতার দরকার। কোন একটা ব্যবস্থাকারী কর্তৃপক্ষ না থাকলে আমেরিকায় লাভজনকভাবে নতুন ক'রে ব্যবসা পরিচালনাও সম্ভব নয়। আকাশপথে যাতায়াতের জন্যও এ'রকম যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। উড়োজাহাজগুলির আসা-যাওয়া ও রাস্তা সম্পর্কে লাইসেন্স ব্যাপারে এবং নিরাপত্তামূলক বিধানগুলি প্রতিপালিত হচ্ছে কি'না তা দেখবার জন্যও একচেটিয়া অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন। দিন দিন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিচালনা বা সাহায্যে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে, এবং এতে ওয়াশিংটনের আমলাতন্ত্রের অধীনে আর একটি ক'রে নতুন ব্যুরো করতে হচ্ছে। এমন কি জনসাধারণের নিজের মোটরগাড়ী নিজে চালাতে হলেও দেশব্যাপী বড় বড় রাস্তার প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া রাজ্যবিশেষ সন্তোষজনকভাবে এ'কাজ করতে পারে না।

ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণার্থে বহু নতুন নতুন আবিষ্কার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাহায্যেই এই সমস্ত আবিষ্কারগুলি অল্প মূল্যে বা বিনামূল্যে জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারে। প্রথমে এল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি উন্নয়ন। তখন এগিয়ে এল যুক্তরাষ্ট্রীয় কৃষি বিভাগ। বিভিন্ন রাজ্য ও তার নিজস্ব লোকজনের সহযোগিতায় পুস্তিকাদি মারফৎ তারা এই নতুন আবিষ্কার প্রচার করে। এইভাবে কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধি ও সেগুলি প্রচারিত হওয়ার ফলে বেশীর ভাগ কৃষকই কৃষি ছেড়ে অন্য জীবিকা গ্রহণের সুযোগ পায়। আমেরিকায় উচ্চহারে শিল্পোৎপাদনের এও একটি প্রধান কারণ। আজ যে কয়েক লক্ষ আমেরিকান কৃষিকার্যে ব্যাপৃত রয়েছে, তারা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। আমেরিকার কৃষি-উৎপাদন এত বেশী হয়ে থাকে যে, সেই উৎপাদনগুলির বিক্রয় ব্যবস্থা করাও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি বিরাট সমস্যা হয়ে উঠেছে।

জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কারগুলি আমেরিকার জনসাধারণের গড়পড়তা আয়ু বৃদ্ধি করেছে। এতে কেবল বেসরকারী ডাক্তারদের উপর নতুন দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে তা নয়, আঞ্চলিক সরকারগুলোর উপরও পরিষ্কার জল সরবরাহ করা ও স্থানীয় এলাকাগুলি স্বাস্থ্যকর রাখার দায়িত্ব এসে পড়েছে। এই সমস্ত

আবিষ্কারগুলি আরও অনেকগুলো নতুন সুবিধার অবকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু কেবল জাতীয় ভিত্তিতেই সে সুবিধাগুলি আরহণ করা যেতে পারে। আমেরিকার জনস্বাস্থ্যগুলি তাই আজ জাতীয় ভিত্তিতেই উন্নত হয়েছে। চিকিৎসা বিভাগ এবং গ্রামাঞ্চল থেকে জনসাধারণের সহরে আগমনের ফলে বৃদ্ধ-বয়সে পেন্‌সান্‌ভোগী জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছে। এই সমস্ত পেন্‌সানভোগীরা যে রাজ্যেই থাক্‌ না কেন, তাদের পেন্‌সান্‌ ঠিক্‌ই পেয়ে যায়।

আবহাওয়া নির্ণয় বিভাগ, মান নির্ণয়ক বিভাগ ও লোক গণনা বিভাগ, এবং কৃষি ও শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষক বিভাগেব মত এবকম আরও বহু বিভাগ রয়েছে। এই সমস্ত বিভাগের কাজকর্ম বড জটিল ও পরিশ্রমসাধ্য। আমেরিকার জনসাধারণ তাদের বিজ্ঞান ও যন্ত্রকুশলতাকে এখানেও প্রয়োগ করেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এ'রকম বহু বিভাগ পরিচালিত হয়, আবার স্থানীয় এবং রাজ্যসরকারগুলিও এ'রকম বিভাগ পরিচালনা করে। কিন্তু এমন কতকগুলি বিভাগও আছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তি ছাড়া সেগুলো অর্থনৈতিক দিক্‌ দিয়ে লাভজনক হয় না।

পরিশেষে ১৯৩২ সালের দেশব্যাপী তীব্র মন্দার দিনে রুজভেল্ট প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়ে এলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। মন্দার আঘাতে জনসাধারণের তখন শোচনীয় অবস্থা। স্বাভাবিক গতিতে সাধারণ অবস্থা ফিরে আসবে এই আশায় জনসাধারণ অনেকদিন "লেইসেজ্‌ ফেয়ারের" উপর বিশ্বাস আঁকড়ে ছিল। ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্য এবং স্থানীয় ও রাজ্য-সরকারের সাহায্য নিয়ে মন্দা নিবারণের বহু চেষ্টা তারা করেছিল। পরিশেষে তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দিয়ে মন্দা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। রুজভেল্টের প্রচেষ্টাগুলি প্রায়ই ছিল পরীক্ষামূলক, কিন্তু জনসাধারণ এতে তাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে দেখে তাঁর প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকেই সমর্থন করে গিয়েছিল। পরিশেষে ১৯৪৬ সালে গৃহীত "এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাক্টের" মধ্য দিয়ে সরকারী কর্তব্য ও দায়িত্বের আদর্শ পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। এর মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস স্বীকার করে নেয় যে, মন্দা নিবারণের জন্য সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে চেষ্টা করা' সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

এই স্বীকৃতিতে কিন্তু এই সম্পর্কে বাদানুবাদের অবসান হয়নি। আমেরিকান জনসাধারণ এখনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা পছন্দ করে। অতীতে যে সমস্ত সবকারী কর্তৃত্ব নিয়ে পার্টিদ্বয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল, আজ উভয় পার্টিই তার অনেকগুলো স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ সর্বক্ষেত্র অযথা সরকারী উদ্যোগ পছন্দ করে না, এবং যে সমস্ত বিষয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভালভাবে চলতে পারে তাদের অনর্থক সরকারের হাতে তুলে দিতে চায় না। ১৯৫২ সালে জেনারেল আইজেনহাওয়ার "মিতব্যয়িতার" কর্মসূচিতেই প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর অর্থ, জনসাধারণ যে সমস্ত সরকারী ক্রিয়া-

কর্ম পছন্দ করে না প্রেসিডেণ্ট তাদের ছাঁটাই করে দিলে তারা তার বিরোধিতা করবে না।

আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতাপ্রসারের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে তৎকালীন ব্যবসায়ীশ্রেণী সরাসরি উপকৃত হয়েছিল। এই জন্য তারা হ্যামিল্টনের পক্ষে ছিল। আবার ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট যখন সরকারী কর্তৃত্ব প্রসারিত করেছিলেন তখন সবচেয়ে বেশী সরাসরি উপকৃত হয়েছিল জীবিকাহীন জনসাধারণ। সেজন্য তারা সেদিন রুজভেল্টের সমর্থক ছিল। রুজভেল্টের নীতিতে পরিশেষে ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু সেজন্য প্রথমে তাদের কর দিতে হয়েছিল। কিন্তু কর বৃদ্ধিজনিত বেদনা আগামী দিনে আয় বৃদ্ধির আনন্দ থেকে বেশী মনে হয়। জনসাধারণের প্রয়োজন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ এড়ানো সম্ভব নয় একথা ব্যবসায়ীরা জানত এবং আরও জানত যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অপেক্ষা রাজ্য-সরকারের সঙ্গেই এই সমস্ত ব্যাপারে বোঝা-পড়া করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ'রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যক্তি সেদিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রচারের বিরোধিতা ক'রে এই সমস্ত বিষয় রাজ্যগুলির আয়ত্বাধীনে রাখার কথা বলেছিল। বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের প্রয়োগে এইভাবে অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ডেমোক্র্যাটরা আজ হ্যামিল্টন-পন্থী হয়ে উঠেছে, আর রিপাবলিকানরা হয়েছে জেফারসনবাদী।

কিন্তু মনে মনে প্রত্যেকটি আমেরিকানই দুই নৌকায় পা দিয়ে রয়েছে। আমরা অনন্যোপায় হয়ে বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। মতবাদের দিক্ থেকে আমরা রাজ্য ও স্থানীয় সরকারগুলির উপরই যুক্তরাষ্ট্রীয় দায়িত্বগুলি অর্পণ করার পক্ষপাতী। এবং এই সরকারত্রয়ের কার্যাবলীও সম্ভব হলে আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দিতে চাই। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও গভর্ণর ষ্টীভেন্সনের বক্তৃতাগুলি ঘুরে-ফিরে বারবারই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কলেবর সঙ্কোচনের স্বপক্ষে জনসাধারণের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করে।

বিকেন্দ্রীকরণ ও সরকার-সঙ্কোচনের প্রশ্ন কার্যকরী করার মত আমেরিকান জনসাধারণের সামনে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ নেই। সাধারণতঃ তারা সরকারী খরচ কমানোর দাবী করে থাকে, আবার তাদের প্রয়োজনীয় সরকারী কার্যাবলীকে সমর্থন করে থাকে। অবশ্য বিকেন্দ্রীকরণের একটি মতবাদ আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, এবং ভবিষ্যতে সেটা আরও প্রভাবশীল হতে পারে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সময়ে "ন্যাশনাল রিসোর্স বোর্ডের" চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ ফ্রেডারিক ডেলানো। তিনি এই বিকেন্দ্রীকরণের মতবাদের নাম দিয়েছিলেন—"অপরিকল্পনা" টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষই এই বিকেন্দ্রীকারী মতবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষ প্রথমে যখন কেবল নদী পরিচালনা, স্বল্প-মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও আরও কয়েকটি বিষয়ে গবেষণা করতে বসেছিল,

অন্য কেউ তখন এই গবেষণা পরিচালনা করতে রাজী হয় নি। এই গবেষণার মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষ টেনেসি উপত্যকার বিভিন্ন রাজ্য, কাউন্টি ও সহর, ব্যবসায়ী ও কৃষক সমাজকে এই সমস্ত বিষয়ে নিজস্ব পরিকল্পনা রচনা করার তথ্য সরবরাহ করেছিল ও উপায় বাতলে দিয়েছিল। অপরিকল্পনা কথাটার অর্থ হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ সাহায্য বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা-ব্যবস্থা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে খুব কম ক্ষমতাই থাকে। অপরিকল্পনার তাৎপর্য হচ্ছে, এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থানীয় বা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে না হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে মনে হয় এই বিকেন্দ্রীকরণের মতবাদ আরও জোর জনস্বীকৃতিলাভ করছে। ব্যবসাক্ষেত্রে সমৃদ্ধি সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব হয়ে উঠেছে। অবিমিশ্র বা কড়া ব্যক্তিতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা এ নয়। এতে চাকা চালু রাখার দায়িত্ব সরকারের উপর দেওয়া হয়েছে। সরকার সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে চাকা চালু রাখার চেষ্টা করবে, কিন্তু তার জন্যে প্রত্যেকটি চাকার পাশে সরকারী চাকুরিয়া মোতায়েন রাখার দরকার হবে না। চাকা ধীরে চললে অধিকতর কুশলী কর্মচারী নিয়োগ করা হবে, তারা ব্যবসাক্ষেত্রে অশুভ পরিবর্তনের সংকেত দেবে, এবং যথাসম্ভব অর্থনৈতিক অবস্থার গলদ দূর করার জন্য সরকারী ক্ষমতা পরিচালনায় অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকার রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্রদের বেশীর ভাগ গবেষণা এই অপরিকল্পনা নিয়েই ব্যাপৃত ছিল। সরকারী শক্তি প্রয়োগ করে আমেরিকায় কি ভাবে বিকেন্দ্রীভূত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়, কি ভাবে সর্বপ্রকার ত্রুটি বিদূরিত করে আমেরিকান জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনী ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করা যায়, তা নিয়ে আজও তারা গবেষণা করে যাচ্ছে। আশা করা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে এইভাবে প্রয়োগ করার উপায় নির্ধারণ করে তাকে মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার কষ্টিপাথরে যাচাই করে আমেরিকার জনসাধারণ আবার তাদের রাষ্ট্রদর্শনকে নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন করে নেবে।

বৈদেশিক সম্পর্ক

আমেরিকার বৈদেশিক নীতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য তার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ জাতি থেকে আমেরিকার এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা কিছুটা স্বতন্ত্রধরণের।

প্রথমতঃ আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানগণ ছাড়া আর সব আমে-

রিকানই এসেছে বিদেশ থেকে। তারা বা তাদের পূর্বপুরুষরা গত চারশো বৎসরের মধ্যে অন্যান্য দেশ থেকে এখানে এসেছে, এবং তারা এখনও তাদের আদি ভূমি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মৃতি ভুলতে পারে নি। এদের বেশীর ভাগই এসেছে য়ুরোপ থেকে, এবং আন্তর্জাতিক সংঘাতের সময় তারা তাদের এখনও পরিত্যক্ত আদিভূমির প্রতি ভালবাসা ও ঘৃণা ব্যক্ত করে থাকে।

যে সমস্ত কারণে এই সমস্ত য়ুরোপবাসী সাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় চলে এসেছে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক উৎপীড়ন, নৈরাশ্যজনক দারিদ্র্য বা ধর্মীয় অত্যাচারের ভয় ও তাদের প্রতি ঘৃণাই ছিল প্রধানতম কারণ। দেশত্যাগীরা স্বদেশে তখন এই সমস্ত অনাচারের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল। দেশের জন্য তাদের প্রাণ কাঁদত, আবার এই সমস্ত উৎপীড়নের কথা ভেবে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। বিপ্লবের সূচনা থেকে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার তিক্ত সংঘাতের স্মৃতি তাদের ক্ষুব্ধ মনোভাবকে তীব্রতর করে তোলে। সমগ্র আমেরিকান ইতিহাসে তাই আমেরিকান জনসাধারণের একটি মনোভাব পরিস্ফুট দেখা যায়: "আমরা য়ুরোপ থেকে চলে এসেছি, আর আমরা সেখানে ফিরে যাব না।"

কিন্তু "রক্তের টান জলপথের দূরত্ব মানে না।" যে আইন-কানুন ও রীতি-নীতি প্রতিষ্ঠান ও বিচার-বিবেচনার মানদণ্ডে আমেরিকানরা তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তার প্রায় সবই পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমেরিকান সভ্যতার জন্মভূমি হচ্ছে য়ুরোপ, এবং এখন আমেরিকানরা আধা-য়ুরোপীয়। য়ুরোপ যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হয় আমেরিকানরা তখন তাকে আমেরিকা ধ্বংসের পূর্বাভাষ মনে করে। য়ুরোপ বিপদগ্রস্ত হলে আমেরিকানদের এই পরস্পরবিরোধী মনোভাব এখানে মহা রাজনৈতিক সংঘাতের সৃষ্টি করে, বিংশ শতাব্দীতে আমরা বার বার এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। এই সংঘাতের কারণ হচ্ছে, য়ুরোপের যে সমস্ত জাতি আমেরিকায় গিয়েছে তাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের মত হবে ব্রিটিশ ঐতিহ্যপরায়ণ। তাদের সঙ্গে য়ুরোপের অন্যান্য ঐতিহ্যপরায়ণ জনসাধারণ, বিশেষ করে আইরিশ ও জার্মাণ জনসাধারণের মনোমালিন্য প্রায়ই লেগে থাকে। আমেরিকান জীবন ধারা এখনও এই সমস্ত প্রাচীন বংশগত মনোভাবকে সম্পূর্ণভাবে অবসান করতে পারে নি।

আমেরিকানদের মনোভাব নির্দ্ধারণে দ্বিতীয় প্রধান শক্তি হচ্ছে আমেরিকার ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য। কিছুদিন পূর্ব্বে পর্যন্ত এই স্বাতন্ত্র্য তাকে নিরাপদ রেখেছে। মঁশিয়ে জুলস জুসারাণ্ড নামক একজন ফরাসী রাষ্ট্রদূত এক সময় আমেরিকা সম্বন্ধে বলেছিলেন, এই দেশ বড় সৌভাগ্যশালী। এর উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে দুর্ব্বল প্রতিবেশী, আর পূর্ব ও পশ্চিমে রয়েছে মৎস্যসংকুল জলধি।

কিন্তু ১৯৪২ সালে হাটেরাস অন্তরীপের অদূরে জার্মাণ ডুবোজাহাজকে শান্তিপ্রিয় মৎস্যরাজির সঙ্গে সন্তরণ করতে দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে পড়ে। সাইবেরিয়া থেকে শিকাগো ও ডিট্রয়েটে বোমা বর্ষণ করা যায় দেখে আমেরিকানরা আরও চিন্তামগ্ন হয়ে ওঠে। এখানেও বহু শতাব্দীর নিরাপত্তালব্ধ মনোভাব ও হঠাৎ

বিপত্তির সম্ভাবনার মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। য়ুরোপকে আমেরিকানরা প্রাচীনকাল থেকেই ভয়ের চক্ষে দেখে। ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য তাদের সেই বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্তি দিয়েছে বলে আমরা মনে করেছিলাম। অকস্মাৎ আবার সেই আশঙ্কাই আমেরিকায় দেখা দিল।

আমেরিকানরা এতদিন য়ুরোপের সেনাবাহিনীর নাগালের বাইরে প্রশান্তির মধ্যে কাটিয়েছে। তাছাড়া, য়ুরোপীয় জাতিগুলি—বিশেষ করে ফ্রান্স, বৃটেন ও স্পেনের প্রতিনিয়ত বিবাদ-বিসম্বাদে প্রথম দিকে আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের সুবিধাই হ'য়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নেপোলিয়ান একদা স্থির করেছিলেন, লুইজিয়ানা অঞ্চলের শাসন-কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে তাকে বেশ শক্তিশালী করে তুলবেন। সন্নিহিত এই পশ্চিমাঞ্চল তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বিপজ্জনক হয়ে পড়ত। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তখন তাঁকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল বলে তিনি সে সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করে লুইজিয়ানা রাজ্যটিকে আমেরিকার কাছে বিক্রী করে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে বারবারই দেখা গেছে, য়ুরোপ অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত থাকার ফলেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও উদীয়মান আমেরিকা য়ুরোপের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলে আমেরিকানদের মনে এরকম একটি মনোভাব গড়ে উঠেছে—য়ুরোপের যুদ্ধে আমেরিকার কোন ভয় নেই, বরং তাতে আমেরিকার মঙ্গল হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দুটো মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে আমেরিকানদের এই মনোভাব পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

তিনশত বৎসর ধরে বিরাট মহাদেশের বিস্তৃত ভূখণ্ডে আমেরিকানরা বসবাস করে এসেছে। নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে সেই উন্মুক্ত ভূখণ্ডে। আমেরিকান চিন্তাধারায়ও এই জীবনধারার গভীর প্রভাব পড়েছে। য়ুরোপীয়রা যখন প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করেছিল, তখন উত্তর আমেরিকা এক রকম খালিই ছিল। বিপ্লবের পর অ্যাপালেশিয়ান পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বসতিকামী জনসাধারণ দু'হাজার মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডে নতুনভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। বহুদিন ধরে সীমান্ত সম্প্রসারণ নিয়ে ব্যাপৃত থাকায় পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে আমেরিকান জনসাধারণের চিন্তাধারায় এমন একটি আশাবাদী মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর সঙ্গে তা সব সময়ে খাপ খায় না।

সমুদ্র পথে ব্যবসা বাণিজ্যের দীর্ঘ ইতিহাসও আমেরিকান জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। পূর্ব সৈকতের ইংরেজ উপনিবেশগুলি শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য ইংল্যাণ্ডের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তার পরিবর্ত্তে তারা তামাক, পশুচর্ম কাঠ ও শস্যাদি চালান দিত। এমন কি এক উপনিবেশ থেকে অন্য উপনিবেশে যাওয়া-আসাও তখন কয়েক পুরুষ ধরে প্রধানতঃ সমুদ্র পথে হয়েছে। আমেরিকার সব চেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে তাই সমুদ্রগামী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। জনসাধারণের রাজনৈতিক মনোভাবের উপরও এর প্রভাব পড়েছে। এমন কি মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের পুরোধা অধিবাসীরা বন্ধুর পর্বতমালার জন্য সমুদ্র সৈকতের সহরগুলির

সঙ্গে সহজ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে না পেরে তাদের ফসল নিয়ে মিসিসিপি নদী বয়ে এসে নিউ অবলিয়ান্স পৌঁছাত এবং সেখান হতে য়ুরোপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য কবত।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকাব আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। এই মূলধনেব একটা মোটা অংশ সরবরাহ করেছিল ব্রিটিশ ও হল্যান্ডাজ লগ্নীকারীরা। আমেরিকানরা বৈদেশিক ঋণ ও বহির্বাণিজ্যের উপর সে ঋণেব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিল। তাবা বিদেশ থেকে যে ঋণ গ্রহণ কবত, তার সুদেব অর্থ দিয়ে বিদেশীরা আমেরিকায় গবাদি পশু ও গম ইত্যাদি ক্রয় কবতে পারত। এই সমস্ত পণ্যের দাম দেবার জন্য বিদেশীদেব এখানে তাদের শিল্পজাত পণ্য প্রচুর পবিমাণে বিক্রী করতে হ'ত না। এইভাবে আমেবিকান ব্যবসায়ীরা বিদেশী বাজারে তাদের জিনিষ-পত্র বিক্রয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক বসিয়ে তারা বিদেশেব প্রতিযোগিতা থেকে দেশী শিল্প-বাণিজ্যগুলিকে বক্ষা কবত।

আমদানি-রপ্তানীব ক্ষেত্রে সমতা ছিল না ব'লে কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি হয়েছে মনে হয় নি। বহু পুরুষ ধরে এই ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে তারা যে শিক্ষা গ্রহণ করেছে ও তাদেব যে মনোভাব গড়ে উঠেছে, আধুনিক বিশ্বের স্বতন্ত্র অবস্থা উপলব্ধি করাব পক্ষে তা অনুকূল নয়।

পরিশেষে, আমেরিকান জনসাধারণের মনোভাব বুঝতে হবে তাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জীবনধারাব পবিপ্রেক্ষিতে। আমেরিকার রাজনৈতিক আচরণের ধাবায় আব যতই ক্রটি থাক না কেন, খোলাখুলি আলাপ আলোচনার অবকাশের অভাব এখানে দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে যখনই কোন বিদেশী আমেরিকা পবিদর্শনে এসেছেন, তখনই তাঁরা এখানে অসংখ্য পরস্পর-বিবোধী মতামত শুনতে পেয়েছেন। সংবাদপত্রগুলি তাদের ইচ্ছামত মতামত ব্যক্ত করে ; কংগ্রেসের সভ্যদেবও পররাষ্ট্রদপ্তবের সযত্ন-বচিত বিঘোষিত নীতির বিরোধিতা করতে দেখা যায়। শত্রু বা মিত্রের সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তি স্থাপনের মত স্পর্শকাতর বিষয়গুলিও সমর্থক ও সমালোচকদেব হৈ-হুল্লোরের মধ্য দিয়ে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্যও বিপজ্জনকভাবে বেতাবে ফাঁস হতে দেখা যায়। হঠাৎ হয়ত দেখা গেল, কোন ব্যক্তি দেশোদ্রোহীবা শত্রুশক্তির কাছে কি ধবণেব সংবাদ সরবরাহ করতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেন তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বেতারে উল্লিখিত গোপন সামরিক তথ্য উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার মত সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রী ও গোপনতাপ্রিয় রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এইরূপ শৃঙ্খলাহীন আচরণ আমেরিকাকে বিষম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলে। খুসী মত কথা বলার স্বভাব আমেরিকানদের এত বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে যে, সেটা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। কোন কোন আমেরিকান আবার এ

মনে করেই স্বস্তি পান যে, সোভিয়েট জীবনের নিষ্প্রাণ লৌহ-নিয়ন্ত্রণের চেয়ে এই অবাধ আলোচনায় কতকগুলো নৈতিক সুবিধা আছে

এতে অন্যান্য স্বাধীন জাতিগুলিকে বুঝানো যেতে পারে যে, আমেরিকানরা পরিবর্তনশীল, এবং তাদের উপর নির্ভর করা না গেলেও বিশ্বের স্বাধীনতা নষ্ট করার কোন গোপন অভিসন্ধিতে তারা লিপ্ত নয়।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পর প্রায় শত বৎসর পর্যন্ত আমেরিকানরা প্রধানতঃ দেশের অভ্যন্তরীন উন্নতির দিকেই দৃষ্টি দিয়েছে। বৈদেশিক রাষ্ট্রদপ্তর তখন বহুলাংশে অবহেলিত অবস্থায় ছিল এবং তৎকালীন বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেসই তখন সর্বেসর্বা। য়ূরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সব সময়ে কূটনীতি নিয়ে বিশেষভাবে জড়িত থাকে। তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক ব্যবস্থা তখন ছিল অত্যন্ত আনাড়িধরণের ও অগোছাল। কেবলমাত্র ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই তখন রাষ্ট্রদূত হবার মত ব্যয় বহন করতে পারত, এবং জয়ী দলকে প্রভূত অর্থ সাহায্য করা ছাড়া এঁদের সাধারণতঃ কূটনৈতিক পদের উপযুক্ত কোন যোগ্যতা ছিল না। দেশের সঙ্কটের সময় কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে,—বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত জাতীয় দুর্দিনে বিচক্ষণ রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্র-সাচবের অভ্যুদয় হয়েছে।

প্রত্যেক দেশেই পররাষ্ট্র দপ্তর বিদেশীর সঙ্গে সংশ্রবসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। ফলে এই দপ্তর সম্পর্কে জনসাধারণের সন্দেহ পোষণ করাই স্বাভাবিক আমেরিকার পররাষ্ট্র-দপ্তরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই দপ্তরকে যে কাজ করতে হয় সেটা অনুকূল জনমত সৃষ্টির পরিপন্থী। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে এই দপ্তর জনসাধারণের ঈপ্সিত ফললাভে ব্যর্থ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সেটা হয়ে উঠল না, জনসাধারণ তা সম্যক বুঝতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে এই সন্দেহের সেখানে অবকাশ থাকে, এবং রাজনৈতিক আক্রমণের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ কার্যকরী অস্ত্র। পররাষ্ট্র দপ্তরকে যদি এমন কোন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে হয় যেটা শত বৎসর ধরে প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী, তাহলে বহু লোকই সেই সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি পরিবর্তনকে উদ্বেগের চক্ষে দেখবে। এই ভাবে পররাষ্ট্র দপ্তর সহজেই জনসাধারণের সমালোচনার বস্তু হয়ে পড়ে।

বৈদেশিক বাণিজ্য, পররাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন, বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ, এবং আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী যুগে যে সমস্ত জটিল যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে তার ফলে পুরাতন ধারা একরূপ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। সে যুগে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল পররাষ্ট্র দপ্তর। আজকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রায় প্রত্যেকটি বিভাগই আমেরিকান জীবনযাত্রার কোন না কোন বিষয় নিয়ে কাজ করছে। বৈদেশিক সম্পর্কের উপর তাদের গুরুতর প্রভাব রয়েছে। বিদেশী ও বৈদেশিক সরকারের সঙ্গে অনেক প্রতিষ্ঠান আবার সরাসরি কাজকারবার করে থাকে। তার

উপর, এ দেশের স্থানীয় স্বার্থ আবার অনেক সময় বিশ্বব্যাপী গুরুত্বসম্পন্ন বৈদেশিক-নীতির বিরোধী হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও আইজেনহাওয়ারের "সাহায্য নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য"—নীতির কথা বলা চলে। উভয় প্রেসিডেণ্টই এঁকে আমেরিকান নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি মনে করেছেন। কিন্তু অসংখ্য ব্যবসায়ী, চাষী ও শ্রমিক প্রতিনিধি এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করেছে। তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষুদ্র সার্থের জন্য শুল্ক নিরাপত্তা দাবী করেছে; অথচ এর ফলে বৈদেশিক ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রভূত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পররাষ্ট্র-দপ্তর এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিরোধী বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কমিটিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে সবল ও সঙ্গতিপূর্ণ বৈদেশিকনীতি পরিচালনা করতে পারে না। একমাত্র প্রেসিডেণ্টই কার্য নির্বাহক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব করতে পারেন এবং কৃষি বিভাগ ও দেশরক্ষা বিভাগের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে একই উদ্দেশ্য সার্থক করাবার জন্য কাজ করাতে পারেন। হোয়াইট হাউস ষ্টাফ অথবা প্রেসিডেণ্টের নিজস্ব কর্মচারীগোষ্ঠি সৃষ্টি করার পর এ বিষয়ে অনেকটা উন্নতি করা গিয়েছে। এই কর্মচারীদের সাহায্যেই প্রেসিডেণ্ট সমস্ত কর্মধারার সূত্র খুঁজে পেতে পারেন, যেগুলি একমাত্র তাঁর পক্ষেই পরিচালনা করা সম্ভব। তবে, এক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না।

স্থানীয় সার্থের সঙ্গে বৈদেশিক নীতির সংঘাত দেখা দিলে কেবলমাত্র প্রেসিডেণ্টই কংগ্রেসকে এই সংঘাতের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি জন-সাধারণের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহকারী ব্যবস্থা থাকলে পররাষ্ট্র-দপ্তর সমস্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রেসিডেণ্টকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্টকেই নেতৃত্ব দিতে হয়। এবং মহান প্রে সডেণ্টরা সব সময়েই জনসাধারণের সমর্থন পেয়ে এসেছেন।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে স্বার্থকতা আবার কংগ্রেসে উভয় দলের সমর্থনের উপরও কিছুটা নির্ভর করে। কিছু সংখ্যক কংগ্রেস সদস্য আবার রাজনৈতিক স্বার্থে বিশ্ব পরিস্থিতি প্রসঙ্গে সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু উভয় দলের অধিকাংশ সদস্যই কার্যগ্রহণকালীন শপথ অনুযায়ী সর্ব্বপ্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে। নেতৃত্বের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাময়িক-ভাবে উভয় দলকে ঐক্যবদ্ধ করার ইচ্ছা কার্যকরী করা সম্ভব হলেও সে একতা স্থায়ী হয় না। অশীতিতম কংগ্রেসে মার্শাল পরিকল্পনা নিয়ে বিতর্ক হবার সময় সেনেটার ভ্যাণ্ডেনবার্গের দৌলতে উভয় দলের নেতৃত্বের মধ্যে ঐক্য দেখা দিয়েছিল। সাধা-রণতঃ নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব ও বিরোধী নেতৃবৃন্দকে স্বমতে আনয়নে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতার উপরই উভয় দল সমর্থিত বৈদেশিক নীতির সম্ভাবনা নির্ভর করে।

উড্রো উইলসন ফাউণ্ডেশান কমিটি চার বৎসর অন্তে কংগ্রেসের সভ্য নির্বাচনের প্রস্তাব করে একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের সুপারিশ করেছিল। কমিটি বলেছিল, যখন প্রেসিডেণ্টকে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে হয় না, ভোটাররা তখন ভোট দেয়

কম, এবং সেই সুযোগে বলিষ্ঠ বৈদেশিকনীতির বিরোধী স্বার্থানুসারীরা তাদের পছন্দমত সব লোককে কংগ্রেসে নির্বাচিত করিয়ে নেয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পালা সঙ্গে থাকলে জনসাধারণ সচেতন থাকে; তাই এরা তখন নির্বাচিত হতে পারে না। এই কমিটি সুপারিশ করেছে, প্রেসিডেন্ট যেন কংগ্রেসকে তাঁর দীর্ঘকালীন বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে আরও ওয়াকিবহাল রাখেন যাতে করে স্বল্পকালীন ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে আরও ভাল করে সংগ্রাম করা যায়।

বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তীব্র আকার ধারণ করবে কিনা তা দুটো প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি হচ্ছে, প্রতিনিয়ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব এবং অপরটি হচ্ছে, আমেরিকানদের মনে স্থায়ীভাবে আসন লাভ করেছে এমন কোন প্রচলিত নীতির পরিবর্ত্তন। বর্তমান শতাব্দীর পরিস্থিতি পরিবর্ত্তনের ফলে এরকম পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের মত চতুর ও ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষের সঙ্গে ঠিকমত চলতে গেলে এই রকম উভয় সঙ্কট দেখা দেবেই। শত্রুপক্ষ এমন একটা অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করে, যার চাপে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র দুটো মন্দের মধ্যে একটিকে বাছাই করে নিতে বাধ্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোরিয়ার কথা বলা যায়। এখানে যুক্তরাষ্ট্র বহু উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে এবং এক্ষেত্রে যে নীতিই গ্রহণ করুক না কেন, তাকে মন্দ বলে তার বিরোধিতা করা যেতে পারে। দেশদ্রোহীরা এই বিরোধিতাকে আরও তীব্র করে তোলার চেষ্টা করে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই মূল্য দিতেই হয়। সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি পরিবর্ত্তনের ফলে বিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিকে দেশের অভ্যন্তরে ভীষণ রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের অধুনা পরিচালিত বৈদেশিকনীতির কথা বলা চলে। শত বৎসর ধরে আমেরিকানরা বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনপ্রকার সন্ধি-চুক্তি ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত হওয়ার নীতি গ্রহণ করেনি। স্বয়ং ওয়াশিংটনের নামের সঙ্গে এই নীতি জড়িত। কিন্তু আজ আমেরিকানরা সেই প্রচলিত নীতি পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তির সহায়তায় দেশের স্বাধীনতা লাভের মাত্র কয়েক বৎসর পরেই ১৭৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে নিরপেক্ষনীতি গ্রহণ করেছিলেন। নবীন যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজনীয় সময় লাভের জন্যই তিনি এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফ্রান্সের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে য়ূরোপীয় শক্তিদ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িত করতে স্বীকৃত হন নি। তাঁর বিদায় সম্ভাষণে তিনি আমেরিকান জনসাধারণকে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবহারবিধি বর্ণনা করে বলেছেন: "বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রাজনীতি যত কম থাকে ততই ভাল।" তিনি ভবিষ্যতে এমন একটা সময়ের আশায় ছিলেন "যখন বহিঃশক্তির বিরাগের দরুণ যে বৈষয়িক ক্ষতি হবে তা আমরা অবহেলা করতে পারব...,যখন যুদ্ধরত জাতিগুলি

আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে না পেরে অযথা আমাদের উত্তেজিত করার পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়বে ; যখন আমরা আমাদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ ও বিবেক অনুযায়ী যুদ্ধ বা শান্তি বেছে নিতে পারব।"

১৮২৩ সালে প্রেসিডেন্ট মনরো বলেছিলেন : "দীর্ঘদিন ব্যাপী য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় য়ুরোপ সম্বন্ধে আমাদের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, আজও তা বলবৎ থাকবে ; কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করব না।" গ্রীক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে মনরো পুনর্বার এই নীতি ঘোষণা করেছিলেন। বহু আমেরিকাবাসী তখন গ্রীকদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল। য়ুরোপে যাই হোক না কেন, বেশীর ভাগ আমেরিকানই তার বাইরে থাকার নীতি পছন্দ করে।

এই নীতির বশবর্তী হয়েই ১৯১৪-১৭ সালের মত দুঃসময়ে উড্রো উইলসন আমেরিকার নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে আটলান্টিকের সীমা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল এবং আমেরিকান নীতির অন্যতম মৌলিক ভিত্তি—সমুদ্র চলার স্বাধীনতার উপর হামলা সুরু হয়েছিল। ঘটনার চাপে উইলসনকে তাঁর পূর্ব মত পরিবর্তন করতে হয়। ১৯১৭ সালে তিনি কংগ্রেসকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলেন। এর পূর্বে তিনি সেনেটকে বার বার অনুরোধ করেও লীগ অব নেশানে আমেরিকার যোগদানের প্রশ্নে সম্মত করাতে পারেন নি। অর্দ্ধেকের বেশী আমেরিকাবাসী তখন আমেরিকার লীগ অব নেশানে যোগদানের পক্ষে ছিল।

কিন্তু তাহলেও আমেরিকানদের স্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্য তখনও লুপ্ত হয়ে যায় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও আমেরিকানদের একথা বুঝতে বিলম্ব হয়েছে যে, নাৎসীরা কেবল প্রতিবেশী য়ুরোপীয়দের আক্রমণ করেনি, সমগ্র স্বাধীন বিশ্বের উপরই হামলা আরম্ভ করেছে। পার্ল হারবার আক্রমণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জার্মাণ ও ইতালীর যুদ্ধঘোষণা পর্যন্ত আমেরিকায় স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা প্রবল ছিল। আমেরিকার রাজনীতিতে এই মনোভাব এখনও শক্তিশালী ফল্গুধারা হয়ে আছে।

অতীতে য়ুরোপ-বিমুখতা থেকে আমেরিকান জনসাধারণের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হয় না। বলা হয়ে থাকে, "জন্মাবধিই সমস্ত আমেরিকাদের মধ্যে পশ্চিমপ্রীতি দেখা যায়।" স্বতন্ত্র্যতা অর্থে পশ্চিমের যে কোন দেশের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি বোঝায় না; এমন কি দূরদেশের চীনের সঙ্গেও নয়।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, সে'টা হচ্ছে—বিদেশাগত দ্রব্যের উপর প্রচলিত উচ্চ শুল্কের হ্রাস। ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ডেমোক্র্যাটরা তাদের পার্টির ঐতিহ্য অনুযায়ী এই শুল্ক হ্রাসের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। তারা সব সময়েই সংরক্ষণ শুল্কের বিরোধী ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পসমৃদ্ধি হওয়াতে এই

সম্পর্কে পার্টিগত বিরোধ অনেকটা নিস্তেজ হয়ে এসেছিল। দক্ষিণাঞ্চলের ডেমো-ক্র্যাটরা তাদের নিজেদের শিল্প সংরক্ষণের জন্য শিল্প সংরক্ষণ-নীতির সমর্থক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের গতি তখন উচ্চ শুল্কের বিরোধী ধারায় বইতে আরম্ভ করেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকা ঋণী-রাষ্ট্র থেকে ঋণ-দাতা রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। এর পর থেকে বিদেশীদের আমেরিকার নিকট থেকে গম বা গাড়ী ইত্যাদি ক্রয় করতে হলে আমেরিকানদের কাছে কোন না কোন জিনিস বিক্রয় করে প্রয়োজনীয় ডলার উপার্জন করতে হয়। উপরন্তু, ঋণের সুদ দেওয়ার জন্য তাদের আরও বেশী জিনিস আমেরিকায় পাঠিয়ে আরও বেশী ডলার সংগ্রহ করতে হয়। এক কথায়, যদি খাতকদের ঋণ পরিশোধ করতে হয় ও বিদেশি অধিকতর পরিমাণে আমেরিকান দ্রব্য বিক্রয় করতে হয়, তাহলে আমেরিকানদের অবশ্যই রপ্তানী থেকে বেশী আমদানী করতে হয়। অধিক ঋণ দিলে সাময়িকভাবে বিপদ কেটে যায়, কিন্তু এতে শেষ পর্যন্ত ঋণদাতা রাষ্ট্রে আমদানীর আধিক্য দেখা যায়, নতুবা গোলমাল বাঁধে। এইজন্য আমেরিকাকে বিদেশজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক কমাতে হয়েছে, নতুবা একটা গোলমাল দেখা দিত।

কিন্তু আমেরিকান শিল্পগুলি বিদেশজাত দ্রব্যের উপর চড়া শুল্কে অভ্যস্ত। রাজ-নীতি ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবও রয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বার বৎসর আমে-রিকায় বিদেশী দ্রব্যের উপর সব চেয়ে বেশী চড়া শুল্ক ধার্য হয়েছিল, এবং তাতে যুদ্ধ-ঋণগুলি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের পরবর্তী তীব্র অর্থ নৈতিক সংকটের জন্য আমেরিকার শুল্ক ব্যবস্থাও আংশিকভাবে দায়ী ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধান্তে যুদ্ধ-ঋণের সমস্যা অত ভয়ানক হতে পারেনি, কারণ লেণ্ড-লীজ ব্যবস্থা অনুযায়ী মিত্র রাষ্ট্রগুলির কাছে অস্ত্র সরবরাহের সমস্ত মূল্য আমেরি-কাকে তাদের দিতে হয়নি। এর পর যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবা ও পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকা থেকে প্রভূত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আমেরিকা বৎসর বৎসর কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিতে থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারসাম্যের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু সাহায্য দেওয়া বন্ধ ক'রে চলতে হলে, যুক্তরাষ্ট্রকে অধিকতর বৈদেশিক বাণিজ্য স্বীকার করে নিতে হবে। এ থেকে আমেরিকার "সাহায্য নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য" নীতির সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব পরিস্থিতির জন্য আমেরিকাকে এই নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে, কিন্তু অসংখ্য আমেরিকাবাসীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশ্বাস এতে আঘাত পেয়েছে। এ ধরণের ভাবাবেগের মধ্যে দিয়ে বৈদেশিক-নীতি পরিচালনা করা সহজ ব্যাপার নয়।

এ ছাড়াও অপর কতকগুলি সাবেকী-নীতি পরিবর্তিত হয়েছে বা এমনভাবে মোড় নিয়েছে যে, জনসাধারণ তা'তে তেমনটি শঙ্কিত হয়ে পড়েনি। "মনরো

ডকট্রিন” এদের মধ্যে একটি। লাটিন আমেরিকার প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোকে য়ুরোপীয় শক্তিবর্গের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার সঙ্গে যে যৌথ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিল, মূলতঃ সেখান থেকেই “মনরো ডকট্রিনের” উদ্ভব হয়। ফ্রান্স, স্পেন বা রাশিয়া পশ্চিম গোলার্ধে নূতন সাম্রাজ্য বিস্তার করুক, বৃটেন বা আমেরিকা, কেউ তা চায়নি। ভবিষ্যতে বৃটেনের কোন নীতি আমেরিকানদের মনোঃপূত না হয় এই ভয়ে প্রেসিডেণ্ট মনরো তখন বৃটেনের সঙ্গে কোন সূত্রে আবদ্ধ হতে চাননি। ১৮২৩ সালের ২রা ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, আমেরিকার কোন অংশে য়ুরোপীয় অধিকারের সম্প্রসারণকে যুক্তরাষ্ট্র তার “শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক” মনে করবে। তখন সমুদ্রের উপর কর্তৃত্ব করছিল বৃটিশ নৌ-বাহিনী। বৃটেন তার নিজের স্বার্থেই তা'ই মনরো ডকট্রিন সমর্থন করেছিল।

সেই শতাব্দীর অবশিষ্টাংশ এই নীতির ভিত্তিতেই চলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পর লাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি থেকে ঋণ আদায়ের প্রশ্ন ক্রমশঃ মনরো ডকট্রিনের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে উঠে। য়ুরোপীয় মহাজনরা ক্যারিবিয়ান সৈকতে তাদের ঋণ আদায়ের জন্য তখন সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করছিল। হয়ত বা সেখানে তারা স্থায়ী হয়ে বসে পড়ত। প্রেসিডেণ্ট তা'ই সেদিন মনরো ডকট্রিনের ভিত্তিতে এই সম্পর্কে নীতি ঘোষণা ক'রে য়ুরোপীয় ঋণ দাতাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন; এবং যতদিন না দেউলিয়া রাষ্ট্রগুলি পুনর্বার তাদের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে ততদিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক আদায়, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় বন্ধ ইত্যাদির জন্য রিসিভার হিসাবে কাজ করে।

একটির পর একটি দেশে নৌসেনার অবতরণে লাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। প্রেসিডেণ্ট হার্বাট হুভার তাঁর পূর্বাধিকারী প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুজভেল্টের এই নীতি বর্জন করেছিলেন। ১৯২৮ সালে নির্বাচিত হয়ে ১৯২৯ সালে তাঁর অভিষেক অবধি তিনি লাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে মৈত্রী সফর ক'রে তাদের সঙ্গে নতুন ভাবে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবং টু-ম্যানের সময়ও যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিবেশী-প্রীতির নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ নাকরার নীতি যুক্তরাষ্ট্র তার পক্ষে অবশ্য পালনীয় মনে করে। আমেরিকার রাষ্ট্র-সংগঠনের সদস্যরা সেই গোলার্ধ রক্ষা করা তাদের প্রত্যেকেই অবশ্য কর্তব্য মনে করে থাকে।

মনরো ডকট্রিনের এই পরিবর্তনে স্বাধীন জগতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-জাহাজ এসে তাদের অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা স্থাপন করবে, স্বাধীন জাতিগুলি তা চায় না। তারা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেদের অভ্যন্তরীন সমস্যার সমাধান করার স্বাধীনতা চায়। আবার দক্ষিণ আমেরিকা বা অন্যান্য স্থানের ডিক্টেটরী রাষ্ট্রগুলিও যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাচ্ছে দেখে

সমগ্র স্বাধীন জগতের উদারতন্ত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। কমিউনিষ্ট পার্টিও এই অবস্থাকে তার প্রচারের কাজে ব্যবহার করে।

সময় সময় সামান্য অদল-বদল হলেও শতাধিক বৎসর ধ'রে যুক্তরাষ্ট্র এই ভাবে চলে এসেছে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমেরিকানদের বক্তব্য হচ্ছে, একটি ছোট রাষ্ট্রে একজন ডিক্‌টেটর গজিয়ে ওঠা বিশ্বের পক্ষে যতটা বিপজ্জনক, কোন বৈদেশিক আক্রমণকারী সেই রাষ্ট্র জয় করে নিলে পরিস্থিতি তার চেয়েও বেশী বিপদজনক হবে। কোন রাষ্ট্রে এখনও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হলেও এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করা পছন্দ করে।

আমেরিকানদের চির-প্রচলিত অবাধ সমুদ্রের নীতি ব্রিটিশ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। রাণী এলিজাবেথের সময় থেকে ব্রিটিশরা সমগ্র বিশ্বে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌচলাচলের স্বাধীনতার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিল। সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে স্বাধীন জগতের সমবায়ী প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু এই নীতির অনুপযুক্ততা প্রমাণিত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার, বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার আধুনিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না; প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এ নিয়ে গোলযোগ সুরু হয়। প্রেসিডেণ্ট উইলসন এ নিয়ে তাদানীন্তন ব্রিটিশ ও জার্মান সরকারের সঙ্গে বেশ চটাচটি করেছেন। কিন্তু কি বৃটিশ, কি জার্মাণ, কেউই যুদ্ধে পরাজিত হবার ভয়ে আমেরিকার সওদাগরী জাহাজগুলিকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে দিতে রাজী হয় নি। পরিশেষে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান কবাতে এই সমস্যার সমাধানের আর প্রয়োজন হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কংগ্রেস নিউট্রালিটি এ্যাক্টের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-এলাকায় আমেরিকানদের গমনাগমন নিষিদ্ধ ক'রে আমেরিকার নিরপেক্ষ অধিকারগুলি বর্জন করে। ক্রমে যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষের সঙ্গে অধিকতর সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়াতে এই পরিস্থিতিরও অবসান ঘটে।

পরিশেষে ১৯৪৫ সাল থেকে ঠাণ্ডা লড়াই আরম্ভ হ'লে যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী হয়ে সোভিয়েট রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার দাবী তোলে। ঘটনাপ্রবাহ পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত ক'রেছে। কিন্তু সমুদ্রে নৌ-চলাচলের অবাধ অধিকারকে রাজনীতিক চালের মধ্য দিয়ে কণ্টকিত করে রাখা হয় নি। প্রশ্ন আদর্শ নিয়ে নয়, কতখানি নিয়ন্ত্রণ করলে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যাবে, সেটাই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়।

অবাধ সমুদ্রের নীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে চীনে অবাধ বাণিজ্যের নীতি। চীনে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিল। চীন কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পর এই সম্পর্কে প্রশ্নটি উবে যায়।

পরিশেষে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিকে একটি সাম্রাজ্যবাদী অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ১৮৯৮ সালে অনুষ্ঠিত স্পেনের যুদ্ধের পর থেকে এই পরিস্থিতি লোপ পেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে

যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমাভিমুখে প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণে রিওগ্রাণ্ডের দিকে প্রসারিত হতে থাকে। এই সম্প্রসারণের সময়ে সব চেয়ে সহিংস ঘটনা হচ্ছে ১৮৪৬—'৪৮ সালের মেক্সিকান যুদ্ধ। এর পর মাঝে মাঝে কিউবা এবং ক্যারিবিয়ান সমুদ্রস্থ অন্যান্য স্থান দখল করার আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু তাতে বিরাট কোন সাম্রাজ্যবাদী অভিযান দেখা যায় নি।

স্পেনিশ শাসনের বিরুদ্ধে কিউবানদের বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি থেকেই ১৮৯৮ সালে স্পেনিস যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। জার্মাণরা তখন স্পেনের উপর হামলা করছিল। স্পেনের পরাজয়ে পাছে জার্মাণরা কিউবানের উপর তাদের অধিকার বিস্তৃত করে বসে, সঙ্গে এই আশঙ্কাও অবশ্য ছিল। হাভানা বন্দরে মেইন নামক যুদ্ধ জাহাজখানি বিধ্বস্ত হলে আমেরিকান সংবাদপত্রসমূহে উত্তেজনাকর খবর প্রচারিত হতে থাকে। এরই ফলে স্পেনের বিরুদ্ধে আমেরিকায় যে অসন্তোষের আগুন চাপা ছিল, তা' দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু যুদ্ধান্তে কিউবা, পোর্টো-রিকো এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে আমেরিকার আয়ত্বাধীনে দেখে আমেরিকার জনসাধারণের মত আর কাউকে তত আশ্চর্য হতে দেখা যায় নি।

এই সময়েই কিপলিং তাঁর এক কবিতাতে আমেরিকাকে "শ্বেতজাতির বোঝা বহন করার" জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই সদ্য অধিকৃত অঞ্চলগুলি নিয়ে কি করা যায়—এ নিয়ে যখন সরকার একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টায় ছিলেন, তখন সারা দেশে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সম্পর্কে প্রচণ্ড আলোড়ন সুরু হয়। সাম্রাজ্য-বাদের জোয়ার তখন চলে গিয়েছে। আজ আমেরিকান জনসাধারণের ব্যাপকতর অংশের কাছে এ'কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, স্বতন্ত্র ভাষা ও রীতিনীতি সম্পন্ন দূর দেশের জনসাধারণের উপর আধিপত্য করার ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্রের নেই। ভিনদেশে তারকালাঞ্ছিত ডোরাকাটা জাতীয় পতাকা অবনমিত না করার প্রাচীন আওয়াজের আজ কোন রাজনৈতিক সার্থকতা নেই। জার্মাণী বা জাপানের মত বিদেশে কোথায়ও কোথায়ও আমেরিকাকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়েছে, কিন্তু তাদের মন সব সময়ে দেশে ফিরে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা তাই পুরোপুরি দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের মত হয় না। বিদেশী শত্রু, এমন কি বন্ধু-রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়েও স্বদেশিকতার ভিত্তিতে সাধরণভাবে দ্বি-দলীয় সহযোগিতার মনোভাব দেখা যায়। কেবলমাত্র চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন বিদ্রোহোদ্দীপক বক্তাদের মধ্যে এই মনোভাব পরি-লক্ষিত হয় না। অপর পক্ষে সরকারী ব্যয় সম্পর্কে সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মতভেদ থেকে বৈদেশিক সাহায্যের মত বিষয়েও বিতর্কের উদ্ভব হয়। এ ছাড়া কোন কোন কংগ্রেস সদস্যকে আবার আঞ্চলিক এবং আত্মসর্বস্ব ও অর্থ-নৈতিক স্বার্থকে যথা-বিহিত খাতির করতে হয়, নতুবা পরবর্তী নির্বাচনে অনুরূপ কাজে সম্মত অপর কেহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। পরিশেষে নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত নীতির ব্যাপক পরিবর্তন করতে হলে তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা

দেয়। বিশ্ব-পরিস্থিতির তাগিদে আমেরিকানরা নতুন পথ আবিষ্কারে বাধ্য হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক বাদানুবাদের মধ্য দিয়েই তাদের পক্ষে মনস্থির করা ও লক্ষ্য উপলব্ধি করা সম্ভবপর।

রাজনীতি ও গণতন্ত্র

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সেরা মানবতাবাদী রাষ্ট্রগুলির অন্যতম—সোভিয়েট য়ুনিয়ান তেমনি তার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে বিশ্বের সব চেয়ে বড় মানবতাবিরোধী রাষ্ট্র। এই বিরাটকায় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোনটিই ত্রুটিহীন নয়, কিন্তু তাদের ত্রুটির ধরণের মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে। অর্থ-নৈতিক সংগঠন, ধর্ম এবং সংখ্যালঘুদের উপর সরকারী কর্মচারীদের মনোভাবের ক্ষেত্রে এই বৈপরিত্য দেখানো যায়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার করে বোঝানোর আর একটি উপায় রাজনীতির মাধ্যমে।

সোভিয়েট সরকার যা বলে তা বিশ্বাস করলে বলতে হবে, সোভিয়েট য়ুনিয়নে-জনসাধারণ রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যাবলী নিয়ে অত্যধিক মাথা ঘামায়। সংবাদে জানা যায়, সেখানকার বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে চল্লিশ লক্ষ থেকে দু'কোটি "রাজ-নৈতিক" বন্দী রয়েছে। ন্যায়সঙ্গতভাবে হোক আর অন্যায়ভাবেই হোক, এই সমস্ত হতভাগ্যরা রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও চিন্তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। এই সমস্ত শিবিরে সাধারণ চোর-জোচ্চোর ও খুনীদের রাজনৈতিক বন্দী অপেক্ষা প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং তাদের উপরই রাজনৈতিক বন্দীদের তদারকীর ভার দেওয়া হয়। রাজনীতির জন্য যে এখানে অন্য সমস্ত অপরাধের চেয়ে বেশী শাস্তি ভোগ করতে হয়, এ' থেকেই সোভিয়েট রাশিয়ার সরকারী পদ্ধতির মানবতা বিরোধী রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত রাজনীতিকে অপরাধ গণ্য করা হয় না। বিশেষ বিশেষ ধরণের রাজনীতি অপরাধজনক হতে পারে ; কারণ রাজ-নীতি মানুষেই করে। রাষ্ট্রনায়কত্ব থেকে সুরু করে দুর্নীতিপরায়ণতা পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যেই রাজনীতি থাকতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের মধ্যে আর একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নাগরিক অধিকার সম্পর্কে তাদের মনোভাব নিয়ে। উভয় দেশই বিভিন্ন রাজনীতি অভ্যাস ও আঞ্চলিক ভাষাভাষী জনসংখ্যা নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই রকম বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্টিকে একই কেন্দ্রীয় শাসন ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার আয়ত্তাধীনে আনলে নানা ধরণের সংঘাত দেখা দেয়ই। কিন্তু এই অনিবার্য সংঘাতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পন্থা গ্রহণ করেছে।

যে সমস্ত জাতি বা গোষ্ঠি তাদের স্বতন্ত্র রীতিনীতি ও অভ্যাস বজায় রাখতে

চায়, একঘেঁয়ে সামূহিক "সোভিয়েট মানুষে" রূপান্তরিত হতে চায় না বা পারে না. সোভিয়েট রাশিয়ায় তারা রাষ্ট্রের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে অভিযুক্ত হবে এবং তাদের অবলুপ্ত করার জন্য চিহ্নিত করে রাখা হবে। এই সমস্ত হতভাগ্যদের নিয়ে যাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ট্রেণ আসবে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দাস-শিবিরে মারা পড়বে, কিছু সংখ্যক সুমেরু সাগর সৈকতে উপনিবেশ স্থাপন করবে; এবং আর কতকগুলিকে রুশ জনসমাজের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হবে যাতে তাদের স্বাতন্ত্র্য অবলুপ্ত হয়ে যায়। জাতীয় কৃষ্টি ও ধর্মের দিক থেকে তারা এইভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সোভিয়েট য়ুনিয়নে সরকারের সুনজরে-পড়া উপজাতিগুলি যেভাবে "প্রাকৃতিক বাছাই"—পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্ভাগা উপজাতিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং ভবিষ্যতের রুশ জনসমাজ গড়বার জন্য নিজেরা টিঁকে থাকে, সেই পদ্ধতি পশু-জগতের প্রাণী-সংঘাতের মধ্যে টিকে থাকার প্রতিযোগিতারই অনুরূপ। এই প্রতিযোগিতায় "সর্বাধিক উপযুক্তরা" টিকে থাকে এবং প্রতিদ্বন্দিতায় ব্যর্থ পশুশ্রেণী-গুলি নির্বংশ হয়ে যায়। পুলিশী রাষ্ট্রে যোগ্যতম হিসাবে যারা টিকে থাকে তারা সভ্যতার মাপকাটিতে অগ্রগণ্য নয়, নৃশংসতার মাপকাটিতে অগ্রণী।

যুক্তরাষ্ট্রেও বহু জাতি, সংস্কৃতি ও ধর্ম রয়েছে। এদের মধ্যে কতকগুলি পরস্পর এতই স্বতন্ত্র যে অদূর ভবিষ্যতে তাদের অখণ্ড জাতিয়তার মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এখানেও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সংঘাত হয়, জাতি, সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে বিরোধ দেখা যায়। কতকগুলি বিরোধের ভিত্তি বড় দৃঢ়মূল এবং তারা অত্যন্ত তিক্ত রূপ ধারণ করে থাকে। শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো, ইহুদি ও অ-ইহুদি, ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টরা যে কখন পরস্পরে সন্দেহ ও বিদ্বেষমুক্ত হয়ে, বৈষম্যমূলক মনোভাব পরিত্যাগ করে একসঙ্গে কাজকর্ম, খেলাধূলা ও খাওয়া-দাওয়া করবে, কেউ তা বলতে পারে না। তারা অনেকে একে অপর জাতি ও মতাবলম্বী প্রতিবেশিকে ঘৃণা ও ভয় করে। এমন কি সময় সময় তারা একে অপরের স্বার্থবিরোধী কাজও করে থাকে। ঘৃণিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা সীমাবদ্ধ করে দেবার জন্য তারা এমন কি আইন পর্যন্ত পাশ করাতে পারে। তবুও এ সমস্তই মনুষ্যোচিত।

কিন্তু বিভিন্ন জাতি ও ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সদ্‌ভাব ও সম্প্রীতি মানবীয় বৃত্তিভুক্ত এবং শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এই রকম সদ্ভাব স্থাপনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দীর্ঘদিনের কথা, আর জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠার গতিও মন্থর। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আজ আমরা সেই মৈত্রী ও শুভেচ্ছার দিকে অগ্রগতির বহু পরিচয় পাচ্ছি। এতে আমা-দের বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমেরিকার জীবনধারার রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কতকটা সত্যি রয়েছে।

কোন অপ্রিয় জনগোষ্ঠীকে নির্বংশ ক'রে দিয়ে জাতি সমস্যার সহজ সমাধান

করার ক্ষমতা আমেরিকানরা তাদের সরকারকে দেয় না। তৎপরিবর্ত্তে তারা শিক্ষা, আইন ও জনসাধারণের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্ত নাগরিকেরই অধিকার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করতে চায়।

কমিউনিষ্ট প্রচার, বিশেষতঃ বিশ্বের অশ্বেতকায় জাতিগুলির মধ্যে তারা যেভাবে প্রচার করে, তাতে তারা যুক্তরাষ্ট্রে অশ্বেতকায় জাতিগুলির উপর দুর্ব্যবহার অনেক ফলাও করে প্রচার করে। আমেরিকানরা এই প্রচার এড়াতে পারে না। আমাদের এর মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে এবং আমেরিকার জাতি সম্পর্কের উন্নতির প্রমাণ দেখিয়ে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হবে। আমেরিকানরা সোভিয়েট পদ্ধতি গ্রহণ করবে না—সংখ্যালঘুদের তারা নির্বংশ করে দেবে না এবং গোপনতার বেড়াজালে অন্যায়কে ঢেকে রাখবে না। গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে আমেরিকান পদ্ধতি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির গতি মন্থর, কিন্তু এর সিদ্ধি যথার্থ।

নানা ত্রুটি সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি সদ্‌গুণ আছে যেগুলি বিদেশাগত জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। তারা দেশের অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থাও প্রত্যক্ষ করে। তবুও এই বিদেশাগতদের অধিকাংশই আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করে। আমেরিকার জনসাধারণের স্বাধীনতা খুঁটিনাটি ব্যাপারে ত্রুটিহীন না হলেও আমেরিকান জীবনধারার বহুবিধ দিক্ তা'তে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং সে সমস্ত স্বাধীনতাও আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠার সুস্থ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমেরিকার স্বাধীনতার এই উজ্জীবনী শক্তি তার উৎপত্তির অন্যান্য অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

প্রথমতঃ আমেরিকায় যারা এসেছে তাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই এমন একটা পরিস্থিতি থেকে এসেছে,—যেখানে তারা নিজেদের সর্বদিক দিয়ে উৎপীড়িত মনে করত। নতুন দেশে এসে তারা বড় দুর্যোগ ও বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে জীবন আরম্ভ করেছিল। অনেকে অনাহারে ও বাসস্থানের অভাবে মৃত্যু বরণ করেছে, অনেকে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের কুঠারের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে। তবু তারা মনে করত, এখানে তারা স্বাধীন, এখানকার সমস্ত বাধা-বিপত্তি তারা দূর করেছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রায় তিন শতাব্দী ধ'রে আমেরিকানরা এমন ভৌগোলিক নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে তাতে স্বাধীনতা তাদের কাছে অনেকটা স্বতঃপ্রসূত হয়ে উঠেছে। তাদের পেছনে রয়েছে আটলাণ্টিক মহাসাগর। দেশোন্নয়নের যে কোন অবস্থায় তারা বৃটেন বা অন্য যে কোন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারত, কারণ আক্রমণকারীদের তিন হাজার মাইল সাগর অতিক্রম ক'রে তবে আমেরিকার উপর আক্রমণ চালাতে হত। তদানীন্তন য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বে নবীন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রাথমিক সুবিধার পক্ষে আরও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিবাদের ফলেই কোন য়ুরোপীয় শক্তিই সেদিন আমেরিকার বিরুদ্ধে সৈন্য সংহত করবার অবকাশ পায় নি।

আমেরিকার স্বাধীনতার আর একটি ভৌগোলিক উপাদান হচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলের

জনশূন্য ভূভাগ। স্বাধীনতাকে যে অপর কোথায়ও যাবার স্বাধীনতা বলা হয়, তার মধ্যে অনেকখানি সত্য রয়েছে। উৎপীড়িত ব্যক্তি বন্ধন এড়িয়ে কোথায়ও চলে যেতে পারে, এই জ্ঞান উৎপীড়নের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী রক্ষাকবচ। এই চলে যাওয়ার স্বাধীনতা আজও আমেরিকান জীবনযাত্রায় একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার সীমান্ত অঞ্চল ছিল উন্মুক্ত। সরকারী কর্তৃত্ব ও ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে সেই সময় এই মনোভাবই আমেরিকানদের মধ্যে প্রবল ছিল।

পরিশেষে ইংল্যাণ্ডের আইন-কানুন ও প্রতিষ্ঠানগুলি আমেরিকানরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। দীর্ঘদিন রাজা-প্রজার সংঘর্ষের মধ্যে এই সমস্ত আইন-কানুন ও প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন রূপ নিয়েছে। নাগরিকদের সরকারী উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করার জন্যই এদের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। আমেরিকান শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনে অনুরূপভাবে বলা হয়েছে—যথাবিহিত বিধান ছাড়া সরকার কোন নাগরিককে তার জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না, বা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ছাড়া কারও সম্পত্তি সরকারী কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আমেরিকানদের এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। য়ুরোপ থেকে দূরত্ব ও অবাধ সীমান্ত অঞ্চল আমেরিকানদের মধ্যবিত্তসুলভ চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হতে সাহায্য করেছে। নিজেদের সর্বহারা শ্রেণীভুক্ত মনে ক'রে ধনবাদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সংগ্রামের চেয়ে নিজেদের জন্য ঘরবাড়ী ও ব্যবসায়ের সম্পত্তি ক্রয় করার প্রবণতা আমেরিকার শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল। অতীতে অসংখ্য শ্রমিক তাই পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিকাজের জন্য জমি সংগ্রহ করেছে বা ব্যবসা আরম্ভ :করেছে। তা'ই শ্রেণীগুলি অপরিবর্তনীয় থেকে অনবরত সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছে এ'কথা এখানে সহজে স্বীকৃতিলাভ করতে পারে না।

আমেরিকান জনসাধারণের আইন কানুন ও প্রতিষ্ঠানগুলি এইভাবে এখানে জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের যথার্থ রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সামুদ্রিক নিরাপত্তা সঙ্কুচিত ও সীমান্ত অঞ্চল ধীরে ধীরে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলে সরকারী ব্যবস্থাগুলি সম্প্রসারিত ক'রে জনসাধারণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ধরণের নিরাপত্তা বন্দোবস্ত করছে।

আমেরিকার ইতিহাসের প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে সীমান্ত অঞ্চলের প্রভাব থেকে সেখানে গণতন্ত্রের ধারা নিরূপিত হয়েছে। কোন প্রকারে উৎপীড়িত হলেই মানুষ তখন সীমান্ত অঞ্চলে পালিয়ে যেত এবং সেখানে তারা ক্ষমতা অনুযায়ী নিজের নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারত। পূর্ব সৈকত বরাবর স্থায়ী বসতি সমন্বিত অঞ্চলগুলিতে কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। রাজনৈতিক গণতন্ত্র সেখানে সম্পত্তিবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; সেখানে কেবল তারাই তখন ভোট দিতে পারত।

কিন্তু সীমান্ত যতই পশ্চিম দিকে প্রসারিত হতে থাকে, সাধারণ লোক সংখ্যায় ততই বাবুদের চেয়ে বেশী হয়ে উঠতে থাকে। জনসাধারণ যত অধিকতর পরিমাণে ভোটের অধিকারী হতে থাকে, রাজনৈতিক গণতন্ত্র ততই প্রসারিত হতে থাকে। পরিশেষে মহিলারাও ভোটের অধিকারী হয়। জনসাধারণ প্রেসিডেন্ট ও সেনেট সভার সদস্যদের নির্বাচিত করার অধিকার লাভ করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা উচ্চশ্রেণীর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের বাইরে চলে এলে রাজনীতির মধ্যে সমগ্র জনসাধারণের দোষ গুণ অধিকতর প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। বিংশ-শতাব্দীর সঙ্কটে যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান-পতন এই দোষগুণের উরপই নির্ভর করবে।

কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, কোন্ কাজটা বিজ্ঞজনোচিত অথবা মূর্খতার পরিচায়ক, এই রকম সব সিদ্ধান্তই জনসাধারণ এখানে নিজেরাই ক'রে থাকে। কথায় আছে, জনসাধারণের অভিব্যক্তিই ভগবানের ইচ্ছা। আমেরিকান সমাজে এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, জনসাধারণের সার্বভৌম অভিব্যক্তিই আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। যখন কোন দুর্বোধ্য সমস্যার সমাধান করতে গেলে ভাল মন্দ অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, জনসাধারণ তখন তা নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে। ভুলের মধ্যে দিয়ে তারা শিক্ষালাভ করে—কোন্‌টা বিজ্ঞজনোচিত নয়। ভুল করে শেষ পর্যন্ত তারা বুঝতে পারে কোনটা ভ্রান্ত। সময় সময় জনসাধারণ যা ন্যায়-সঙ্গত, তাই করে থাকে এবং তার ফলাফলও তাদের ভাল লাগে।

প্রথম মহাযুদ্ধান্তে লীগ অব নেশানে যোগদান ক'রে বিশ্ব নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার ক'রে তৎপরিবর্তে শান্তির ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিলে মনে হয় আমেরিকান জনসাধারণ ভুলই করেছিল। কিন্তু তাদের গৃহীত সেই সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত তা তারা বুঝল কি ক'রে? তাদের শান্তি সিদ্ধান্তগুলি পার্লহার্বারে ভেসে যাওয়ার পর তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই তারা তাদের পূর্ব সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি উপলব্ধি করেছে। পরবর্তী পরিস্থিতিতে তারা অধিকতর বিজ্ঞজনোচিত কাজ করেছে।

এই অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকান জনসাধারণ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘ গড়ে তোলার কাজে যোগদান করেছে এবং তা'কে বাঁচিয়ে রাখার ও শক্তিশালী করার কাজে সাহায্য করেছে। কোরিয়ায় হামলা প্রতিরোধ করার বিষয়ে আমেরিকাই নেতৃত্ব দিয়ে পথনির্দেশ করেছে; এই বলিষ্ঠ প্রত্যুত্তরেই সেদিন রাষ্ট্র-সংঘকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। এমন কি পার্লহার্বার আক্রমণের পূর্বেও আমেরিকান জনসাধারণ লেণ্ড-লীজ্ বর্মহু'চ অনুমোদন করেছিল, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অন্তে তারা মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এই সমস্ত কার্যধারা থেকে আমেরিকার জনসাধারণ কি ক'রে তাদের পূর্বকৃত ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ও কিভাবে নতুন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নতুনতর উপায় নির্ধারণ করে, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভবিষ্যতেও যে তারা কোথায়ও ভুল করবে, আবার কোথায়ও ঠিক পথে চলবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, এবং টিঁকে থাকলে তারা নতুন নতুন বিষয়ে শিক্ষা-

লাভও করবে। বিপদের মধ্যেও তাদের মন থাকে প্রগতির দিকে, কারণ তাদের ইতিহাস তাদের প্রগতি সম্পর্কে নিঃসংশয় করে তুলেছে। তাদের এই মনোভাবও ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার এই একমাত্র ভরসা। আমেরিকানরা শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রগতি-প্রবণই নয়, অনিচ্ছা থাকলেও এই উত্তরাধিকারই তাদের নেতৃত্বের পথে ঠেলে দিয়েছে। তারা ইতিহাসের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে তাদের অজানা শক্তি ও অমুক্তরিত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যা ই হোক, বা যা কিছু তাদের যাত্রা পথে পড়ে, তাকেই তাদের আত্মস্থ করে নিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তিগুলির কেবল সামনের দিকে নয়, পেছনের দিকেও চলা স্বাভাবিক এবং সঙ্গতও। ইতিহাসের সীমানায় দাড়িয়ে কেবল বলিষ্ঠতা নয়, পরিণামদর্শিতারও প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া, কোন কাজ করতে হলে কেবল সাহস দেখালেই চলে না, আশঙ্কাগুলিকেও চেপে রাখা উচিত নয়। সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভয়ভীতিগুলি অবশ্যই প্রকাশ করতে হয়। নানা তর্ক বিতর্কের তুফানের মধ্যে দিয়ে আমেরিকার রাজনৈতিক পদ্ধতি কিন্তু বেশ সার্থকতার সঙ্গেই তা করে থাকে।

বিশ্ব-নেতৃত্বের বিপদসঙ্কুল কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে সৌভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ, বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে আমেরিকান জাতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় মানুষের আশা ও ভয় বিশ্বাসের জটিলতা, তাদের হিংসা ও সন্দেহপ্রবণতা এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ অবহিত। এগুলি আমাদের ঘরোয়া সমস্যা। সমস্যার সমাধান করে জাতিগুলি যে পরস্পর একটা শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করেছে তা নয়, তবে অন্তর্যুদ্ধ পরিহার করে যা'তে সবাই একসঙ্গে বসবাস করতে পারে সেরকম একটা ব্যবস্থা হয়েছে। অলীক কল্পনার রাজত্বের চেয়ে এ'রকম ব্যবস্থাই আজ বিশ্বের প্রয়োজন। আমেরিকান জনসাধারণ তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার দৌলতে আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একেবারে অনবহিত নয়।

আমেরিকান কল্পনায় স্বপ্নালুতা বিরল। তিন শত বৎসর পূর্বে আমরা পথ চলা আরম্ভ করেছি। আমরা অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটেছি, কিন্তু পথের শেষ দেখতে পাইনি। পথের শেষ নয়, পথ-পরিক্রমাকেই আমরা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছি। কোমল বন্ধুর পথের মধ্যে দিয়ে এখানকার মানুষ পথ-চলাই পছন্দ করে, মনে হয় এই যাত্রার ফলে ক্রমশঃ আমরা নিম্ন থেকে উচ্চে উঠে যাচ্ছি, আমাদের দৃষ্টি আগের চাইতে ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে স্বচ্ছ ও অবারিত হয়ে পড়েছে।

শতাধিক বৎসর পূর্বে ফরাসী পর্যটক দ্য তকভিল আমাদের সম্বন্ধে বলেছিলেন: "যে জাতি দীর্ঘদিন ধ'রে তার নিজস্ব বিষয় পরিচালনা করেনি, বা যে সমাজে একেবারে নিম্নশ্রেণী পর্যন্ত রাজনৈতিক বিজ্ঞান প্রসারলাভ করেনি, সেখানকার পক্ষে আমেরিকার শাসনব্যবস্থা উপযুক্ত হবে না।" দীর্ঘদিন ব্যাপী স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা

থেকে সদ্যমুক্ত জাতিগুলি আজই আমেরিকার বিশেষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সমাজ-ব্যবস্থাগুলিকে বৈশিষ্ট্য সমেত অনুকরণ করবে এ'কথা আমরা বলি না। যে সমস্ত জাতি তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদের কাছে আমেরিকানদের বক্তব্য হচ্ছে,—তারা যেন তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও প্রতিভা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক উন্নতির দিকে যাত্রা আরম্ভ করে। আমেরিকানদের বিশ্বাস, শত কষ্ট সত্ত্বেও যে কোন জাতির পক্ষেই এই ধরনের পথযাত্রা সর্বোৎকৃষ্ট হবে।

বিভিন্ন পথযাত্রার মধ্যে দিয়ে আমেরিকান জনসাধারণ তাদের পথ ঠিক করে নেয়। বিজ্ঞান থেকে তারা যা শেখে তাই তারা ব্যবহার করে। ধর্মীয় শিক্ষার নির্দেশকেও তারা গ্রহণ করে চলে। দৈনন্দিন জীবনের কাজ কারবারের মধ্যে দিয়ে তারা আমেরিকান ধারাকে কার্যকরী করে।

তাদের সরকারী সংগঠনগুলিতে তারা সাধ্যমত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলাপ আলোচনা ও সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে এবং একমত হয়ে কাজ করে। অর্থাৎ এ'ক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক কলানৈপুণ্যকে ব্যবহার করে। একনায়কত্ব (যেখানে রাজনৈতিক কলানৈপুণ্যের কোন স্থান নেই) ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির হৈ হুল্লোর ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভালর জন্যেই হোক্ আর মন্দের জন্যেই হোক্, বিংশ শতাব্দীর ভাগ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমেরিকানরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে আছে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—